"প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত সংখ্যায় মুদ্রিত "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ (গোবিন্দদাস কবিরাজ)" শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ছাপার ভুলগুলি রহিয়াছে যথা,—

পত্রসংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	২২	সহিত	হাতে
৭০	১১	বরিখান	বরিখনে
"	১৫	বহল	রহল
৭৩	১৩।১৯।২১।২৭	তদ্ভাব	তদ্ভব
৭৪	৫	জাবল	জারল
"	৬	দেথবি	দেথ রি
"	৩০	মকরন্দ	মরন্দ
৭৫	৭	কাণ্ড	কান্ত
"	১১	কুঙ্কুমাঙ্কিত	কুঙ্কুম-অঙ্কিত
"	১২	কুণ্ডল বণ্ড	কুন্তলবন্ত
৭৬	১৫	কুলে	ফুলে
৭৭	৩২	নির্দ্দিষ্ট	সুনির্দ্দিষ্ট
৭৮	১	পসার	পয়ার
"	১০	ভাবম্	ভারম্
"	১২	কবিতা	রচয়িতা
"	১৮	অক্ষরের	ষোল অক্ষরের
৭৯	১০	করাইতে	করইতে
"	"	বামী	বাণী
"	১৩	রণ ঠাট	রস ঠাট
৮০	১	কালে	ফলে
"	১০	বাবু আই-লা	বন্ধু আইলা
৮১	৪	সাধাবি	সাধবি
"	৫	দিশহি	দিনহি
"	২৪	বিষয়	বিধায়
৮২	৫	কাটে	বাটে
"	৬	চুম্বিয়ে	চুম্বয়ে
"	১৬ পংক্তির পর "সুন্দর পড়িল প্রেমতরঙ্গে॥ বিদ্যাসুন্দর।" পংক্তিটির পূর্ব্বে "মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।" অতিরিক্ত পংক্তিটি হইবে।		
৮৪	৯	কানড়া	কানড়
"	১৯	কারণ	কারক
"	২০	হিন্দী, মৈথিল	হিন্দী মৈথিল
"	২৪	উচ্চ	উঠত
"	"	ভ্রমরা	ভ্রমরী
"	২৬	আলতা	অলতা

পত্রসংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৫	৮	পহু	পহু
”	১৫	বিন্নিদা-বন	বিন্দাবন
”	৩১	লবঙ্গ	লবঙ্গল
৮৬	১	লতা	তা
৮৭	১৪	নিয়মে	নিয়ম
”	২১	পয়ারে	পয়ারের
”	২৩	আকারের	আকরের
”	২৪	মাত্রা-ছন্দ	এবং মাত্রা-ছন্দ
৮৮	২২	ছন্দ	ছন্দের
৮৯	৬	বরিখণ্ডিয়া	বরিখন্তিয়া
”	৮	হণ্ডিয়া	হন্তিয়া
”	১৪	অংশ	অংশে
”	১৯	পারকে	পাবকে
৯০	৯	একটি	ত্রুটি
৯২	১	দাসী	দানী
৯৩	৪	মলিন ; চিত্ত-বৃত্তি	মলিন চিত্তবৃত্তি
”	৫	নহে।	নহে—
৯৪	২৮	দোহা	দেখুন
৯৫	২৩	অধিকার	অধিকাংশ
৯৬	১	রবীন্দ্রনাথ	সেই রবীন্দ্রনাথ
”	২২ পংক্তির ‘প্রসঙ্গেই’ শব্দটির পরে ‘তাঁহার অনুপ্রাসপটুতার অংশটি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।		
৯৭	২১	কাণ	কান
৯৯	১১	ভরহি ভর-কাতর	ডরহি ডর-কাতর
”	১৬	ভারসি	ডারসি
”	২২	কিরত	ফিরত
১০০	১৯	অভয়ে	অতয়ে
”	২৫	(তোমার ও আমার	(তোমার ও আমার)
”	২৭	পদটিকে	পদটিতে
১০১	১৭	প্রভেদ	অভেদ
”	১৮	এক	আত্ম
১০২	২০	মনে বিরহ	মান, বিরহ
১০৫	৩	শীত-ভার	শীত-ভাব
১০৬	২	কন্দন্	কন্দল্
”	২২	গোবিন্দদাসের	গোবিন্দদাসের
”	২৫	অনুপ্রাশচ্ছটা	অনুপ্রাসচ্ছটা
”	২৬	কবিত্ব	কবিতা

প্রবন্ধ-লেখক।

সভাপতির অভিভাষণ

আর এক বৎসর চলিয়া গেল। আমার মনে হয় না যে, এবৎসরে সাহিত্যসোপানে আমরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, অথচ প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নিতান্ত কম নহে। কেবল কলিকাতা এবং পুর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-গেজেটের পুস্তকতালিকায় প্রকাশিত পুস্তকের নামাবলী গণনা করিলে, মুদ্রাযন্ত্রে বেশ কাজ হইয়াছে বলিতে হইবে; কিন্তু শিশুপাঠ্য পুস্তকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মানের পুস্তকগুলি ও ব্যাকরণের সংখ্যা দেখিয়া এবং শিক্ষা-বিভাগের নূতন নিয়মাবলম্বী গ্রন্থের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। শিক্ষাবিভাগের গ্রন্থ-নির্ব্বাচন-সমিতির আমার মত দুর্ভাগ্য সভ্যগণের কার্য্যভারের পরিমাণ বৃদ্ধিই সাহিত্যের উন্নতির নিদর্শন হইতে পারে না। শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনাতেও গ্রন্থকারগণের স্বাধীনতা নাই। শিক্ষাবিভাগের নির্দ্দেশমত কয়েক পৃষ্ঠা পদ্যসংগ্রহ, কয়েকপৃষ্ঠা ব্যাকরণের স্থূলস্থূল নিয়মসংগ্রহ, কয়েক পৃষ্ঠা স্বাস্থ্যরক্ষার কথা, কয়েক পৃষ্ঠা সামান্য কৃষির দুই চারিটি তথ্য, দুই চারিটি হিন্দুমুসলমান ও খৃষ্টানের জীবন-কথা, দুই চারিটি নীতিমূলক গল্প ভিন্ন আর কিছু লিখিবার উপায় নাই; সুতরাং সকল পুস্তকেই সেই একই কথা; সেই "থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়"—নূতন জিনিষ কিছু থাকিতে পায় না। প্রকৃত কাব্য, ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

শিক্ষার বিস্তার হইতেছে,—লিখিতে পড়িতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এই শিক্ষাবিস্তারের ফলেই আমাদের মুসলমান ভ্রাতারাও বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে শিখিতেছেন; তাঁহাদের অনেকেই পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি লিখিতেছেন। বাঙ্গালায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পরিচালনেও তাঁহাদের মধ্যে বহু উপযুক্ত লোক দেখা দিয়াছেন। বিশুদ্ধ ও ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে তৃপ্ত ও মোহিত করিতে পারেন, এরূপ অনেকগুলি মুসলমান বক্তাকেও আমি জানি। কিছুদিন পূর্ব্বে এমনটা ছিল না। তখন তাঁহারা উর্দ্দু, পারসী, আরবী ভাষাকেই মুসলমানের শিক্ষণীয় ভাষা বলিয়া জানি-তেন; কিন্তু এখন তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন; এখন তাঁহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন তাঁহাদের মধ্যে আর একদল ভক্তিনিষ্ঠ, শক্তিশালী সুলেখক পাইয়াছেন। হিজ হাইনেস্ আগাখানপ্রমুখ মুসলমান নেতৃগণ আজকাল নবোদ্যমে ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে আবার উর্দ্দু, পারসী ও আরবী ভাষার শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা হিন্দু-ব্যবহৃত হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার বিরোধী; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এ অঞ্চলে সে ভাব নাই। এখানকার মুসলমান ভদ্রসমাজ দেশীয় মাতৃভাষা শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া, আপনাদের সমাজের সকল স্তরেই মাতৃ-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আমাদের সহিত যোগ-

দিয়াছেন। পূর্ব্বকালেও আমাদের এ অঞ্চলে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা-বিদ্বেষ ছিল না; যখন এদেশে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া দেশশাসন করিতেছিলেন, সেই মুসলমান-অভ্যুদয়ের সময়েই মুসলমান কবিরা বাঙ্গালা ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান কবি-রচিত বহু বাঙ্গালা সৎকাব্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজশাহীর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় বহু মুসলমান-কবির বৈষ্ণবপদাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমার বাল্যকালে, "বকো" মুসলমানের যাত্রা বিলক্ষণ সম্মানিত ছিল। তাহার গান ভাব ও লয়ে হিন্দু কবিদিগের সমতুল্য ছিল। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মাতৃভাষার প্রতি এই নবোন্মেষিত অনুরাগ দর্শনে আমাদের আশা হয় যে, কালে তাঁহাদিগের সাহায্যে আমাদের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে পারসী ও আরবী ভাষা হইতে মুসলমানলিখিত বহুদেশের তওয়ারিখ বা ইতিহাস গ্রন্থ, তান্ত্রিক বা জ্যোতিষিক গ্রন্থ, হাকিমী বা চিকিৎসাগ্রন্থ এবং হদিস্ বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রভৃতির অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সঞ্চিত হইতে দেখিতে পাইব; আর তাহা হইলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মতভেদজনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিদ্বেষের সামঞ্জস্য হইয়া সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হইবে। যে সকল মুসলমানছাত্র আজকাল উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিই এই সকল কার্য্যসম্পাদনের ভার পরোক্ষে সংন্যস্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে।

১৩১৭ সালে সাহিত্যিক-বিয়োগের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, রজনীকান্ত সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই মহাত্মগণের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের দেহত্যাগ আমার পক্ষে বিশেষ শোচনীয়। তাঁহাদের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আয়োজন হইতেছে; কিন্তু যশস্বী, সুলেখকগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টার তেমন আবশ্যকতা নাই; তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার উপায় তাঁহারা নিজেই করিয়া গিয়াছেন। স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিয়া আমরা আমাদের নিজকর্ত্তব্য পালন করিতেছি মাত্র।

"যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না"—ইহা চলিত কথা; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। নিরবধি কালে অনেক সুকবি কাব্যরসে মানবহৃদয় উৎফুল্ল করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণও যশোমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন; মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন,—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

কবিগুরু বাল্মীকির পদাম্বুজে প্রণাম করিয়া অনেক কবিকেই কাব্যরচনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারাও নিজ নিজ কাব্যসৌরভ বিস্তার করিয়া দশদিক্ আমোদিত করিয়া গিয়াছেন।

এবং পরবর্ত্তিগণের প্রণম্য হইয়াছেন। আমাদের দেশেও যে সকল সুকবি ইহলোকে কাব্যকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভাগ্যদেবতার যশোমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই সকল গতাসু কবির স্থানও আমাদের সাহিত্যসংসারে কালে অনধিকৃত থাকিবে না। কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের হ্রাস হয় এবং বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি পায়। আমি এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্ নহি। সভ্য জগতের সাহিত্যের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অনেক সময়েই এক একটি বিপ্লবের—যুদ্ধ বিগ্রহের পর দেশ শান্তিময় হইলে, এক একশ্রেণী কবিকুলের আবির্ভাব হয়। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের অবসানেও সুদিন আসা সম্ভব। আমাদেরও স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীনভাবে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশের দিন আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য-কুঞ্জ আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনও স্বাধীন ভাবে সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করিতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। পরিষৎও তৎসম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্যপালনে এখনও অসমর্থ। বাঙ্গালা ভাষায় ভাল সমালোচনাগ্রন্থের একান্ত অভাব। প্রতিভাশালী গ্রন্থলেখকদিগের রচনার ভাব ও রসমাধুর্য্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা, তাঁহাদের প্রতি সমুচিত আদর প্রদর্শন করা এবং যাহাদের প্রতিভা নাই, অথচ যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থসকল রচনা করিয়া সাহিত্যকে অযথা ভারাক্রান্ত ও আবর্জ্জনাময় করিতেছেন, তাঁহাদের রচনার দোষ প্রদর্শন করা, সাহিত্যকে পরিমার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করা, সাহিত্যহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত। প্রকৃত সমালোচককে সব্যসাচী অর্জ্জুনের মত একহাতে সৎসাহিত্যের গঠনে সাহায্য ও অন্যহাতে সাহিত্যশত্রু নিবারণ করিতে হইবে; কিন্তু নানাকারণে প্রকৃত সমালোচকের একান্ত অভাব হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যের সকল বিভাগেই আজকাল নবীন লেখক ও নবীন গ্রন্থকার আবির্ভূত হইতেছেন। ইহাদের রচনার গুণদোষের সমালোচনা করিয়া ইহাদিগকেও প্রশংসা ও সংস্কৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রবীণ সুলেখকগণের সঙ্গে সঙ্গে নবীন সুলেখকগণকে সম্বর্দ্ধনা করিলে তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে নব নব গ্রন্থের সঞ্চয় হইতে থাকিবে। নবীন কবিকুলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণা-নিধান প্রভৃতি, গল্পলেখকগণের মধ্যে সরোজনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র, ফকীরচন্দ্র, ইন্দুপ্রকাশ প্রভৃতি, ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন, নিখিলনাথ, সত্যচরণ, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে, বিনোদবিহারী, রাখালদাস, হরিদাস প্রভৃতি, প্রবন্ধকারগণের মধ্যে রাধাকুমুদ, বিনয়কুমার প্রভৃতি, বিজ্ঞানালোচনায় পঞ্চানন, নিবারণচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নবীন সুলেখকগণের যথোচিত সমাদর আবশ্যক। সমালোচকগণের এই সকল স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে আজকাল অনেকগুলি সাময়িক পত্র বাহির হয়। নবীন সাহিত্যের সমুচিত সমালোচনা সেই সকল পত্রে বিস্তৃত ও সুসঙ্গত ভাবে হওয়াই শোভনীয়, কিন্তু তাহা কোথাও দেখিতে পাই না। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ "White Doe of Rylstone" প্রকাশ করিলেন, অমনি Edinburgh Review এ Jeffries বলিয়া উঠিলেন 'This will

not do."—আমরা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাবশতঃ প্রয়োজনীয় স্থলেও এমন করিয়া যথোচিত নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত এবং উপযুক্ত স্থলে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতেও পরাঙ্মুখ হই। ইহা স্বীকার না করিলে, বলিতে হয়, ভালমন্দ বিবেচনা ও বিচার করিতে আমরা অক্ষম। সাহিত্য-পরিষদের এখনও সেরূপ শক্তি সঞ্চিত হয় নাই; জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে, অনেক সময়ে, এখনও আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয় এবং অবস্থানুসারে দুই একটা অবান্তর নিয়ম রচনা করিতে ও তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতে হয়।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহারথ সাহিত্যিককে সমুচিত সমাদর দেখাইয়া তাঁহার এক-পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার সুপ্রস্তাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও তাহা অনভিমত; যথার্থ কর্ম্মী পুরুষকে, যথার্থ গুণশালী পুরুষকে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি আমরা শ্রদ্ধা করিতে, সমাদর করিতে সাহসী না হই, অগ্রসর না হই, সমস্তই তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শোকসভায় নিবেদন করিবার জন্য রাখিয়া দিই, তাহা হইলে, আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও কাপুরুষতা বাড়িয়া যাইবে, গুণগ্রাহিতা শক্তির হ্রাস হইবে এবং উন্নতির পথেও প্রতিকূলতা করা হইবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া এখন আমাদিগকে দিন দিন অনেক নূতন কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট ও সাহসী হইতে হইবে।

১৩১৭ সালের বাঙ্গলাসাহিত্যের সবিস্তার বিবরণ শ্রীমান্ অমূল্যচরণ এখনই আমাদিগকে শুনাইবেন। তিনি যতই কেন আমাদিগকে আশার আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করুন না, আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস প্রণয়নকার্য্য আরম্ভ হইলেও, তাহা আর বড় অধিক অগ্রসর হইতেছে না। দেশের ইতিহাস বলিতে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীত আর বেশী কিছু পাওয়া যাইতেছে না। নাটক প্রহসন নাম লইয়া অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের কঠোর জীবন বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে কয়খানা, তাহা বলিতে পারি না। বিজ্ঞান-রচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাবই সম্ভবতঃ তাহার গুরুতর অন্তরায়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, ডাক্তার প্রফুল্ল-চন্দ্র, যোগেশবাবু, রামেন্দ্র বাবু প্রভৃতি মহারথগণই এ তত্ত্ব-মীমাংসার প্রধান ভরসা। বঙ্গ-ভাষায় বিজ্ঞানের আবশ্যকতা বিষয়ে অবহিত হইয়া তাঁহারাই এ বাধা অতিক্রমের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। আমার নিজের মত আমি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রচলিত আছে এবং যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অসীম ভাণ্ডারে পাওয়া যায় তাহার সঙ্কলন আবশ্যক। অপর শব্দ সকল সমস্ত সভ্য জগতে একই হওয়ায় ক্ষতি নাই।

সম্পূর্ণ শক্তি সমন্বিত না হইলেও সাহিত্য-পরিষৎ দেশের এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। শিক্ষিত সমাজ অনেক আশা, অনেক ভরসা লইয়া পরিষদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং অধিকতর উদ্যোগের সহিত ইহার উন্নতিবিধানপথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ বার্ষিক অধিবেশনের শুভ-

অবসরে সভাপতিরূপে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত করিব।

পরিষৎ যে সঙ্কল্প লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং আজ সপ্তদশবর্ষকাল চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই; বরং আশারই অনেক আছে। যে সুযোগ্য সম্পাদক কর্ণধার হইয়া ইহার গতি পরিচালন করিতেছেন, তাঁহার প্রদত্ত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে আমরা এখনই জানিতে পারিব যে, গতবর্ষে পরিষৎ সকল দিকেই উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে। সদস্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে, পুস্তকালয়ে পুথি ও পুস্তক অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, চিত্রশালায় প্রাচীন দুর্লভ মুদ্রা ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বহুদ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। সে সকল বস্তুর মধ্যে এমন কতকগুলি বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে যে, তদ্দর্শনে কতিপয় দেশীয় এবং বিদেশীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহার গ্রন্থপ্রকাশে, বিজ্ঞানের আলোচনায়, ইতিহাসের আলোচনায়, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, অভিধানসঙ্কলনে অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে এখনই শুনাইবেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পরিষদের গতি আশানুরূপ দ্রুত না হইলেও, একান্ত মন্থর নহে। পরিষদের বাহিরেও অনেকে পরিষদের নির্দ্দেশিত গ্রন্থাদি প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরোক্ষে ইহারই সঙ্কল্পকে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। ইহাতেও পরিষদের উৎসাহ ও গৌরব উভয়ই বর্দ্ধিত হইতেছে। পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং পরিষদের পরমহিতৈষী সুযোগ্য পত্রিকাসম্পাদকের গৃহে যে দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থরাশি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পরিষদের গৌরব এবং কৃতকারিতা লক্ষগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। কেবল ছাপা খরচের অভাবই যে,ইহার একমাত্র কারণ আমার তাহা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস পরিষদের নিজের একটি ছাপাখানা থাকিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প উদ্বেগে প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সুব্যবস্থা করিতে পারা যায়। পরিষদের শৈশব হইতেই ইহার প্রথম সভাপতি ৺রমেশচন্দ্র পর্য্যন্ত এ বিষয়ে এইরূপ অভাব অনুভব করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াই তিনি সর্ব্ব প্রথমে ইহার নিজের একটি ছাপাখানা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন পরিষদের নিজের স্থান ছিল না, আয়ও অতি সামান্য ছিল; সেই নিমিত্ত তখন সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ যখন প্রাচীন গ্রন্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তখন ছাপাখানার অসুবিধাই অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন বদান্যবর, পরম-হিতৈষী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের বার্ষিক দানে দুই একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীন সাহিত্য-সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারেন, এরূপ বহু উপযুক্ত ব্যক্তি প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ছাপাখানার অভাবে পরিষৎ তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে

পারিতেছেন না। সভাপতিরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যখনই এই সকল কথার আলোচনা আমাকে করিতে হইয়াছে, তখনই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যতদিন না পরিষদের নিজের ছাপাখানা হইবে, ততদিন এ সকল গোলমাল মিটিবে না। তৎপরে আমি বহুবার এ বিষয়ে উদ্যোগ করিবার জন্য পরিষৎকে অনুরোধ করিয়াছি। পরিষদের কার্য্যোপযোগী একটি ছাপাখানা হইলে, লালগোলার রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত বার্ষিক দান হইতেই আরও বেশী সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার হিতৈষী অন্যান্য রাজন্যবর্গের নিকটেও এজন্য আরও সাহায্য আমরা আশা করিতে পারি। গ্রন্থপ্রকাশ ব্যতীত অন্যান্য মুদ্রণ-কার্য্যেও পরিষদের বার্ষিক প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয় হয়। নিজের ছাপাখানা হইলে, এই ব্যয়-ভারও অনেক হ্রাস হইতে পারে এবং তাহা হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্য হইতে পারে। আমি আপাততঃ ইহার এই অভাবটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুভব করিতেছি। আশা করি, পরিষদের প্রিয়চিকীর্ষু ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষে এ বিষয়ে ইহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন এবং নবীন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

কেবল প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ নহে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সকল বিভাগেই উন্নতি ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত এখনও প্রচুর আয়োজন ও বহু গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে। এখনও কোনও সামান্য বিষয়ে গবেষণা করিতে হইলে, আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাবই সর্ব্বপ্রথমে প্রধান অন্তরায়রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। এখনও প্রতিবিষয়েই, এমন কি, আমাদের মাতৃভূমির ইতিহাস, মাতৃভাষার তত্ত্বালোচনা করিতে হইলেও আমাদিগকে বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারে নিত্যভিখারীর ন্যায় ঘুরিতে হয়। আত্মসম্মান ইহাতে যে কতটা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা মনে উদিত হইলে, ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও অনুভব করিতে হয়। যাঁহারা পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নহেন, অথবা ইহার কার্য্যের এবং কার্য্যপ্রণালীর সম্যক্ সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা এই ক্ষোভ ও লজ্জার জন্য পরিষৎকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা বরেণ্য, গ্রন্থরচনায় যাঁহারা যশস্বী এবং ধনসম্পদে যাঁহারা সকল আশাভরসার অবলম্বন, এরূপ সকল শ্রেণীর অধিকাংশ শক্তিশালী ব্যক্তিই যে পরিষদে সমবেত হইয়াছেন, সেই পরিষদের নিকট যদি আশানুরূপ ফল পাইতে আশাতীত বিলম্ব ঘটে, তবে সামান্য দৃষ্টিতে এবংবিধ অনুযোগের নিমিত্ত কাহারও প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হয় না ; কিন্তু সেজন্য সাহিত্য-পরিষদের মনস্তাপের বা লজ্জার কোন কারণ আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। এই অভাব-জনিত ক্লেশের অনুভূতি, এই অভাবজনিত পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিঘটিত লজ্জা, পরিষদের চেষ্টাতেই যে দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সকল পীড়াদায়িনী অনুভূতি যখন অসহ্য হইয়া উঠিবে, তখন দেশের কর্ম্মশক্তি জাগরিত হইবে এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায় হইবে।

পরিষদের সদস্যসংখ্যা দিন দিন দেশের সর্ব্বত্র এবং শিক্ষিত সমাজের সকল বিভাগ হইতেই আহৃত হইতেছে এবং আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আপনা হইতে আগ্রহ প্রকাশ-

পূর্ব্বক ইহার সদস্যপদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাই পরিষদের কৃতিত্বের এবং সমাদরের উজ্জ্বলতম প্রমাণ। আজ পরিষদের সদস্যসংখ্যা দেশের সকল সভাসমিতির সদস্যসংখ্যা হইতে অধিক হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে, বলিতে হয়, এখনও ইহার উপযুক্ত বলবৃদ্ধি হয় নাই। দেশের বিদ্বৎসমাজের, শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ইহার সদস্য হইয়াছেন, তথাপি বহু প্রাচীন সাহিত্যসেবক, বহু খ্যাতিমান্ গ্রন্থকার, বহু সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, বহু সুলেখক এখনও ইহার বাহিরে রহিয়াছেন। নবীন সাহিত্যসেবী এবং প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকগণেরও অনেকে ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন। ইহা পরিষদের পক্ষে ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সামান্য সম্পর্কেও যাঁহারা আসিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যশ্রেণীতে তাঁহাদের প্রত্যেককেই যাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তৎপ্রতি পরিষদের হিতকাম ব্যক্তিবর্গের এবং পরিচালকবর্গের লক্ষ্য থাকা প্রার্থনীয়। পরিষদের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু পরিচালকবর্গের সহিত মতভেদের হেতুতে যাঁহারা সম্মিলিত হইতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার নিবেদন,—দূরে থাকাতেই মতভেদ বজায় রহিয়া যাইতেছে; একত্র হউন, সম্মিলিত হউন, দেখিবেন মতভেদ হ্রাস হইবে, উহার তীব্রতা কমিয়া গিয়া উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য সাধিত হইবে। আজ বার্ষিক অধিবেশনের এই শুভাবসরে পরিষদের সভাপতিরূপে আমি দেশের সকল সাহিত্যিককে ইহার সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আসুন, সকলে একক্রিয় হইয়া সাহিত্য-যজ্ঞে ব্রতী হই। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মাতৃভাষানুরাগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরিষদে মুসলমান সদস্যের অভাব নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা গ্রন্থকার, যাঁহারা সুলেখক, তাঁহাদেরও অনেকে এখনও পরিষদের বাহিরে রহিয়াছেন। আজ আমি তাঁহাদিগকেও ইহাতে সম্মিলিত হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আসুন আজ হিন্দুমুসলমান সকলে একত্র হইয়া মাতৃভাষার চরণে ভক্তি-উপহার উৎসর্গ করি।

অতঃপর পরিষদের কার্য্য কেন দ্রুতগতিতে আশানুরূপ সম্পন্ন হইতেছে না, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করিয়া আমি উপসংহার করিব। আমরা প্রতিবৎসর একত্র হইয়া পরিষদের বার্ষিক কার্য্যফল আলোচনা করি; কিন্তু ইহার অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াও তাহার প্রতিকারে অবহিত হই না। প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষের, উৎসাহী পুরুষের, সাহায্যের অভাবেই পরিষদের সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে অযথা বিলম্ব হইতেছে। অর্থের স্বচ্ছলতা অনেক কার্য্যকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করে। প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষের দর্শন পাইলে অর্থের অভাব থাকে না। যে সকল দেশ উন্নত হইয়াছে, উন্নতির পূর্ব্বে তাহাদেরও দরিদ্রতা ছিল; কিন্তু কর্ম্মী পুরুষের আবির্ভাবে সে দরিদ্রতা বাধা জন্মাইতে পারে নাই। অর্থসাপেক্ষ কার্য্যগুলি রাখিয়া দিয়া, কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর যে সকল কার্য্য নির্ভর করে, আমরা সে সকল কার্য্য করিয়াও পরিষৎকে সাহায্য করি না; সুতরাং পরিষদের কার্য্য সপ্তদশ বৎসরের সাধনাতেও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা কেবল আমাদের বাসগ্রামখানিতে বসিয়াই,

পরিষদের অভিধান-সঙ্কলনে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গ্রাম্য ভাষা হইতে প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ, কৃষি ও শ্রমজীবীদিগের নিকট কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়বাণিজ্যসম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, জাতীয়-ভাণ্ডারে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যসঞ্চয়ের জন্য গ্রাম হইতে পুথি-সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, গ্রাম্য ইতিহাস সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য দেবালয়ের মেলা-মহোৎসবের বিবরণ এবং গ্রামের জমীদার ও পণ্ডিতবংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, গ্রাম্য বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি এবং তদ্ভিন্ন কেবল গৃহমধ্যে বসিয়াই আমাদের মহিলাগণের আচরিত বারব্রতের বিবরণ, আমাদের স্বজাতীয় বর্ণগত আচার-ব্যবহার ও দশকর্ম্মের বিবরণ, গ্রাম্য ছড়া, গান, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া লৌকিক সাহিত্য-রচনায় পরিষদ্‌কে সাহায্য করিতে পারি, কিন্তু কয়জনে আমরা সে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই ? ছাত্র-সভ্যগণের পরিদর্শক এই সভায় যে বার্ষিক বিবরণ উপস্থাপিত করিবেন, তাহা হইতে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, ছাত্র-সভ্যগণ এদিকে মনোনিবেশ করিয়া ইতি-মধ্যেই কত কাজ করিয়াছেন। আমি আশা করি, পরিষদের এই অনুরাগী ছাত্র-সভ্যগণ সাহিত্য ও দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু এখনও এদিকে অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও অনেক তথ্য সঙ্কলিত হইতে বাকী আছে। আমাদের নিজেদের অবহেলায়, অলসতায় ও কর্ম্মে অনভ্যাসপ্রযুক্ত পরিষৎ উন্নত হইতে পারিতেছে না, আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত ও সঙ্কল্পিত কার্য্য অগ্রসর করিয়া দিতে পারিতেছে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া পরিষদের উদ্দেশ্যসাধনে ও বলবর্দ্ধনে আমাদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া হাতে কলমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইচ্ছা থাকিলে, কার্য্য কতটা সহজসাধ্য হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। এবৎসর পরিষদে আমাদের ১৫৪২ জন সদস্য আছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে যদি একটি মাত্র সদস্য সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে, একদিনে পরিষদের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া যায় এবং একবারে বার্ষিক আয় কেবল চাঁদায় নয় হাজার টাকা ও প্রবেশিকায় দেড় হাজার টাকা বাড়িয়া যায়। একটি সদস্য সংগ্রহ করা কাহারও পক্ষে কঠিন বা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নহে। পরিষদের সদস্যগণ এই সামান্য কার্য্যদ্বারা পরিষদের উপকার সাধন করিতে, আশা করি, কেহই পরাঙ্মুখ হইবেন না। ইহাতে কাহাকেও কোনরূপ ব্যয় বহন করিতে হইবে না, অথচ কেবল মাত্র মৌখিক চেষ্টায় পরিষদের বিপুল সাহায্য সম্পাদিত হইবে।—ইহাই আমার শেষ নিবেদন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। ভরসা করি, এই প্রার্থনাটিতে সকলেই কর্ণপাত করিবেন এবং আগামী বার্ষিক অধিবেশনে আমরা ইহার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিব।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

ব্যাকরণের সন্ধি

একজন লোক নিজের রচনায়, কেমন করিয়া শব্দগুলিকে সন্ধির বন্ধনে বাঁধিয়া লইবে, ইহার শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ নয়। যে সকল রচনায় সন্ধি-বন্ধন আছে, সেখানে কি উপায়ে পদবিচ্ছেদ করিয়া মূল শব্দগুলিকে চিনিয়া লইয়া অর্থ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষার জন্যই ব্যাকরণের সূত্র। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হইতেই তাহা সূচিত হয়। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির জ্ঞান হয়,—বিশ্লেষণপ্রণালীর শিক্ষা হয়। পদে পদে সন্ধি যোগ না করিয়া যদি কেহ সংস্কৃত গদ্য রচনা করেন, তবে তাঁহার রচনাকে কেহ দোষযুক্ত বলিতে পারেন না। ব্যাকরণে এমন সূত্র নাই যে, সন্ধিযোগ না রাখিলে রচনা অশুদ্ধ হইবে। শব্দের রূপ বা ধাতুর রূপ, স্বতন্ত্র কথা। যে রূপ ধারণ করিলে শব্দের যে অর্থ হয়, কিম্বা ক্রিয়াপদে যে কাল বুঝায়, তাহা হইল ভাষার মূল কথা; তাহা না মানিলে কোন পদের বা কোন শব্দের অর্থই হয় না। সন্ধি যোগ করা বা না করা, লেখকের সুবিধার কথা। যেখানে সন্ধি যোগ হয়, সেখানে যে তাহা করিতেই হইবে, এটা হইল অর্বাচীন যুগের সংস্কৃত রচনার একটা অস্বাভাবিক পদ্ধতি।

মানুষের প্রতিদিনের কথা কহিবার ভাষায় সন্ধিবন্ধনের কড়া নিয়ম থাকিতে পারে না; স্বাভাবিক উচ্চারণের সুবিধায় যতটুকু সন্ধির বাঁধন পড়িয়া যায়, ততটুকুই থাকে। বাঙ্গালায় আমরা "ফলাফল" "হিতাহিত" প্রভৃতি যেমন বলি, বৈদিক ভাষা বা ছান্দসেও তাহাই দেখিতে পাই। যখন সন্ধিবাঁধনের কড়া নিয়মের যুগে বৈদিক ঋক্‌গুলির পদে পদে সন্ধিযোগ করিয়া পুঁথি লেখা চলিতেছিল, তখন 'পদপাঠের' সৃষ্টি। সন্ধি করিলে বৈদিক ছন্দ এবং সুর নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, 'পদপাঠে' যেখানে সন্ধি নাই, মূলতঃ সেখানে সন্ধি ছিল না বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনেক স্থলে যে সন্ধি করিতে গেলে অক্ষর কমিয়া গিয়া ছন্দঃপতন হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৈদিক ঋক্‌গুলির কেবলমাত্র পদপাঠ দেখিলেই সকলে উহা বুঝিতে পারিবেন। সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ইহা স্বীকার করেন; পরলোকগত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ একথার সমর্থন করিয়াছিলেন।

ছান্দস হইতেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি; কিন্তু এই ভাষা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে 'সংস্কৃত' নাম পায় নাই। মহাভারতসংহিতায় "সংস্কৃত" শব্দ ভাষা অর্থে পাওয়া যায় না; ১৪০ খৃঃ পূর্ব্বের মহাভাষ্যেও সংস্কৃত ভাষাটি লৌকিক ভাষা নামে আখ্যাত। যখন হইতে ভাষার নাম "সংস্কৃত" দেখিতে পাওয়া যায়, তখন হইতেই উহাতে জটিল রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধির ঘটা, সমাসের বাহুল্য প্রভৃতি ত আছেই; তা ছাড়া অনেক স্থলেই এমন ভয়ঙ্কর দুরন্বয় যে, অনেক টানিয়া হেঁচড়াইয়া পদে পদে যোগ করিয়া অর্থ করিতে হয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত কেবল একটা সাহিত্যের ভাষা

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহা কথাবার্ত্তার ভাষা ছিল না। যে সময়ে ঐ ভাষাটির নাম হইয়াছিল 'সংস্কৃত', তখন এদেশে অনেকগুলি 'প্রাকৃত' বা লোকব্যবহারের স্বাভাবিক ভাষা ছিল। সেই সকল স্বাভাবিক ভাষা বা প্রাকৃত ভাষাও ছান্দস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। লোকব্যবহারের ভাষা যখন পণ্ডিতি-ধরণে ঘষিয়া মাজিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ছান্দস বা বৈদিকে অব্যবহৃত অনেক নূতন জিনিষ আমদানি করা হইয়াছিল, তখনই ঐ ভাষার নাম হইয়াছিল সংস্কৃত বা সংস্কার-পূত। যে ভাষা সাধারণতঃ লোক-ব্যবহারে অপ্রচলিত ছিল, তাহা যে ব্যাকরণের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কড়া নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই সংস্কৃতে রচিত হইত; কিন্তু লোকে কথাবার্ত্তা কহিত আপনাদের দেশপ্রচলিত প্রাকৃত ভাষায়।

সংস্কৃতের সন্ধির সূত্রগুলি হইতে ঐ ভাষার অর্ব্বাচীনতা এবং প্রাচীনতর ভাষাগুলির প্রকৃতি, কিছু কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ বলিয়া যে শ্রেণীবিভাগ, ওটা হইল ভাষার একটা বিজ্ঞান হইবার সময়কার সৃষ্টি। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অ, আ প্রভৃতির উচ্চারণ ত ছিলই, তাহার পর আবার বর্ণগুলির শেষ স্থায়ী উচ্চারণ, আওয়াজ বা স্বরের সহিত ঐ অক্ষরগুলির আওয়াজের সমতা ধরিয়া লইয়া বর্ণগুলির নাম হইল স্বরবর্ণ। 'আ' অকারের দীর্ঘ উচ্চারণ হইলেও, অন্ত দীর্ঘ উচ্চারণের সহিত উহার একটু পার্থক্য আছে। কিন্তু দ্রাবিড়ী উচ্চারণ ধরিলে ই, ঈ-র মতই অ এবং আ বর্ণের উচ্চারণে দীর্ঘতার ভেদই পাওয়া যায়। দক্ষিণপ্রদেশের উচ্চারণের হিসাবে 'আ'কারকে যথার্থই 'অ'কারের একটু দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র পাই। প্রাচীনকালে সেইরূপই ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

ঋ এবং ঌ কিরূপে উচ্চারিত হইত যে উহারা স্বরসংজ্ঞা পাইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লওয়া শক্ত। এখনও উত্তর অঞ্চলে উহাদের উচ্চারণ রি, লি; কিন্তু দক্ষিণের উচ্চারণ, রু, লু। ভাষার পক্ষে যে কোন উচ্চারণ ধরিয়া লইলেই চলে। ঋকারান্ত শব্দের বিকৃতিতে, প্রাচীন কালের প্রাকৃত ভাষায় উ এবং ই উভয়বিধ আওয়াজই ধরিতে পারা যায়; যথা—সংবৃত্ত স্থলে সংবুত্ত পাই; আবার ঘৃতের স্থলে ঘিঅ পাই।

স্বরবর্ণের উচ্চারণভেদে প্লুতসংজ্ঞা নির্দ্দেশ দেখিয়া, মান্দ্রাজপ্রদেশের "এ" "ও" প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণের একটা প্রাচীন মূল ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। পাণিনির ৮।২।১০৬ এবং ৮।২।১০৭ সূত্র হইতেও ইহাই অনুমিত হয়। বৈদিক ছন্দঃপাঠে এই প্লুত উচ্চারণ যথেষ্ট আছে, ঐ সকল উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিলে "এ" এবং "ও"কে যুক্তস্বর বলিতে হয়। বৈদিক ব্যাকরণে ঐ, ঔ, চারিমাত্রাবিশিষ্ট (সিদ্ধান্তকৌঃ বৈঃ প্রঃ ৩৬২৫ সূ)।

"এ" যেন অ+ই অথবা আ+ই মিলিত হইয়া উচ্চারিত; উচ্চারণ একটু তাড়াতাড়ি করিতে হয়, নহিলে "ঐ"কারের মত ধ্বনি হয়। ঐরূপ আবার "ও"কারটি যেন "অ" বা "আ" পরস্থিত "উ"র মিলিত ধ্বনি। অকার কিম্বা আকারের সহিত "এ" যুক্ত হইলে যে

উচ্চারণ হয়, তাহা হইল "ঐ"; এবং "ও" যুক্ত হইলে হইল "ঔ"। এই উচ্চারণ যে সন্ধির নিয়মের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তাহা পাঠকেরা বেশ দেখিতে পাইতেছেন।

এই উচ্চারণ বা স্বরবর্ণের স্বাভাবিক আওয়াজ হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, পদগুলি উচ্চারণ করিতে গেলে স্বভাবতঃ যাহা ঘটিত, অনেকগুলি স্বরসন্ধির সূত্রে তাহাই বিধিবদ্ধ। যথা—"অকারের পর আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; অকারের পর ইকার থাকিলে একার হয়, উকার থাকিলে ওকার হয়; অ কিম্বা আকারের পর এ কিম্বা ও থাকিলে যথাক্রমে ঐ এবং ঔ হয়; ইত্যাদি।" উচ্চারণ যদি প্রাচীনকালের মত থাকিত, তবে এই সন্ধির সূত্রগুলি কাহাকেও মুখস্থ করিতে হইত না। বলিয়া দিলেই হইত যে, ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ মিলিত হইলে যুক্ত উচ্চারণকেই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য দিতে হইবে।

দুইটি আওয়াজ এক সঙ্গে মিশিলে একটা মিশ্র আওয়াজ হইবেই; সাধারণতঃ শেষের আওয়াজটি প্রথমটিকে ঢাকিয়া ফেলে, অথবা একটু হ্রস্ব বা মন্দীভূত করিয়া দেয়। সন্ধির নিয়মে সর্ব্বত্র তাহাই। এই নিয়মটি সম্বন্ধে দু'একটি কথা পরে বলিতেছি। এখন ঋ-কারের সন্ধির বিচার করি। প্রথমেই বলিয়াছি, যে "ঋ" ও "ঌ" প্রথমে কিরূপে উচ্চারিত হইত, তাহা এখন কোন প্রদেশের উচ্চারণ হইতেই ধরা যায় না। আকারের পর ঋ থাকিলে, আকারটি একটু খর্ব্ব হইয়া "অ" হইয়া গেল, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু মিলিত উচ্চারণটি অর্ হইল কেন? ঋ-কারের উচ্চারণ কি "অর্" ছিল? যদি সহজ "রি" কিম্বা "রু" উচ্চারণ থাকিত, তাহা হইলে শেষের স্থায়ী আওয়াজটি "ই" বা "উ" হইত। স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ হইত না। ঋ-কারের স্থানে অনেক স্থলে যেমন "অর্" হয়, তেমনি আবার 'ইর্'ও হইয়া থাকে; কিন্তু বৃদ্ধির নিয়মের সূত্রটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সন্ধির নিয়মে স্বরগুলির যেরূপ বিকৃতি ঘটে, স্বরের বৃদ্ধিতেও ঠিক তাহাই ঘটে; তখন "ঋ" স্থানে "আর্" দেখিয়া সন্ধির উচ্চারণের "অর্"ই ঋ-কারের আদিম উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। একে "অর্" ঠিক 'র' নয়, তাহার পরে আবার অন্তঃস্থ বর্ণগুলি যে ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রভাবে সৃষ্ট নূতন বর্ণমাত্র, তাহাও দেখাইতেছি। "ঋ" "ঌ"র প্রাচীন উচ্চারণসম্বন্ধে আমার অনুমানটি, সুধীগণের বিচারের জন্য উপস্থিত করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি, ঋ-কারের অর্ উচ্চারণ ছিল মনে করিয়া লইলে বৈদিক ব্যাকরণের দুইএকটি স্থলের ঋ-কারের বিকৃতি স্বাভাবিক নিয়মে ধরিতে পারা যায়; তাহার জন্য সূত্র গড়িতে হয় না। পাণিনির "বিভাষর্জোশ্ছন্দসি" সূত্রের ব্যাখ্যায় পাই যে, বৈদিক ভাষায় যদি ইষ্ঠ, ইমন্, ঈয়স্ প্রত্যয় পরে থাকে, তাহা হইলে "ঋজু"র ঋকার র হইয়া যায় (সিঃ কৌঃ বৈদিকপ্রকরণ ৩৫৫৫ সূ)।

অন্তঃস্থ বর্ণগুলি (অর্থাৎ য, র, ল, ব) যে মৌলিক বর্ণ নয়, স্বরমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা দেখাইতেছি। "য"এর উচ্চারণ হইল "ইঅ"; বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া ছাড়া এখনো সর্ব্বত্রই ঐ প্রকার উচ্চারণ হইয়া থাকে। আমরা "য"এর "জ" উচ্চারণ করি বলিয়া, "ইঅ"

উচ্চারণের "য"এর নীচে ফোঁটা দিয়া থাকি। "উহ্য" শব্দটিকে আমরা উচ্চারণ করি, "উজ্ঝ", আর অন্য প্রদেশে উহার উচ্চারণ "উ-ই-হ"। ই+অ উচ্চারণ সংযোগে যেমন "য", উ+অ উচ্চারণ সংযোগে ঠিক তেমনি অন্তঃস্থ ব। সন্ধির সূত্রগুলিতেও, য এবং ব কেবলমাত্র উক্ত স্বরসংযোগ, আর কিছু নহে।

যে নিয়ম য এবং ব সম্বন্ধে খাটিতেছে, ঐ নিয়ম দ্বারাই র, ল শাসিত। "ঋ"র পরে স্বরবর্ণ থাকিলে যখন "র" হয়, তখন "র"কারের উৎপত্তি "য" এবং "ব"এর মত বলিয়া মনে করা সঙ্গত। এরূপ অবস্থায় ঋ এবং ৯-কারের প্রাচীন কালের যেরূপ উচ্চারণ ছিল বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা সঙ্গত হইবার সম্ভাবনাই খুব অধিক।

যখন দুইটি স্বর বা আওয়াজ মিলিলে একটা স্বাভাবিক মিশ্র আওয়াজ হয়, তখন শেষের আওয়াজটি বেশী তীব্র হইলে প্রথম আওয়াজটিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিবে, এবং বেশী তীব্র না হইলে প্রথম স্বরটিকে একটুখানি হ্রস্ব বা মন্দীভূত করিয়া দিবে। কারণ দুটি স্বর সমান প্রাধান্য রাখিয়া উচ্চারিত হইতে পারে না। এইজন্যই সন্ধির সূত্রে পাই যে, শে+অনম্ হইলে শয়নম্, কিন্তু প্রথমের অতি দীর্ঘ ঐকারের বেলায়,—বিনৈ+অকঃ হইলে বিনায়কঃ। অর্থাৎ ঐকারের একটু দীর্ঘতা থাকিয়া যাওয়ায় একেবারে "অ" হইয়া গেল না। এ স্থলে "অ"কারের পরিবর্ত্তে যে "য়" পড়িয়া থাকে, তাহা পরবর্ত্তী যুগের "সুবিধার" উচ্চারণ; নহিলে "অ"ই থাকিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সখ আগচ্ছ' "সখায়গচ্ছ" এই বিকল্পের রূপ দুইটি লক্ষ্য করিলেই চলিবে। প্রাকৃত ভাষায় কিন্তু এসকল স্থলে "য়" হয় না, "অ"ই থাকে। কিন্তু প্রথমের আওয়াজে যদি বেশী জোর দেওয়া যায় (অর্থাৎ যদি তাহাতে Accent থাকে) অর্থাৎ উদাত্ত হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী স্বরকে তেমনি আবার প্রায় লুপ্ত হইয়া যাওয়া চাই, শেষের স্বর বেশী দুর্ব্বল হইলে প্রথমের Accent-যুক্ত স্বরকে লোপ করিতে পারে না, বরং নিজে অর্দ্ধলুপ্ত হইয়া থাকে। যখন সম্বোধনের পদে, কবে, সখে, গুরো প্রভৃতি উচ্চারণ করা যায়, তখন ঐ শব্দ গুলির স্বরে যে Accent থাকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। কাজেই সখে-অর্পয়, প্রভু-অনুগৃহাণ, প্রভৃতিতে যথার্থ সন্ধি না হইয়া কেবল "অ"কারের অল্প উচ্চারণ রাখা হয় মাত্র। কিন্তু "আ" "ই" প্রভৃতি সুস্পষ্ট অথচ তীব্রস্বর পরে থাকিলে প্রথম নির্দ্দিষ্ট নিয়মই ঘটে। শে+অনম্ এবং সখে+ইহ প্রভৃতিতে সূত্র পার্থক্য করিবার প্রয়োজন নাই; এই নিয়মের মধ্যে ধরিয়া লইলেই চলে। উ+উত্তিষ্ঠ, প্র+ঋজতে, অপ+ঋচ্ছতি, প্র+এজতে প্রভৃতি স্থলে বৈদিক ব্যাকরণে সন্ধি হয় না। পদপাঠে সর্ব্বত্রই ওগুলি স্বতন্ত্র থাকে; নহিলে ছন্দঃপতন পর্য্যন্ত হয়। কেবল মাত্র একটা সাধারণ সন্ধির সৃষ্টি করিয়া সকল শব্দকে এক নিয়মে বাঁধিবার অভিপ্রায়েই পরবর্ত্তী যুগে সন্ধির নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক স্বর অব্যয়ে সন্ধি করিলে শব্দ বড় জটিল হইয়া পড়ে বলিয়া বৈদিক বিধিই রক্ষা করিয়া বিশেষ সূত্রে উ+উত্তিষ্ঠ প্রভৃতিকে অযুক্তই রাখা হইয়াছে। এখানে বিশেষ সূত্রই মৌলিক সাধারণ সূত্র।

সন্ধি করিলে যেখানে এক বচন দ্বিবচন বুঝিবার গোল হয়, কিম্বা একটা Accent নষ্ট হইয়া

যায়, সেখানেও বৈদিক নিয়ম রক্ষা করিয়া, সন্ধি যোগের সূত্র রচনা হয় নাই। তাই এখনো কবি+ইমৌ, অমী+অশ্বাঃ প্রভৃতি পূর্ব্বকালের মতই আছে।

ইহার পর বিসর্গের সন্ধির কথা বলিব। অন্ত ব্যঞ্জন-সন্ধি অপেক্ষা ভাষাতত্ত্বে ঐটির বেশী প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিসর্গের সন্ধির কথা বলিবার পূর্ব্বে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের কথা বলিব। যে ভাষা "সংস্কৃত' নামে আখ্যা পাইয়াছে, উহাতেই বিসর্গের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন উচ্চারণ পাওয়া যায় এবং সে উচ্চারণটি এ কালে অধিক পরিমাণে "হ" বর্ণটির উচ্চারণের কাছাকাছি। এই স্বতন্ত্রতা থেকে উহা একটা বর্ণ বলিয়া গণিত হইয়াছে; নহিলে য, র, ল, ব প্রভৃতির মত উহারা বর্ণসংযোগে জাত 'আওয়াজ' মাত্র। পাণিনি ব্যাকরণে ং ও ঃ বর্ণমালার মধ্যে স্থান পায় নাই, পরে পাইয়াছে। ং এবং চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিকের উচ্চারণভেদ মাত্র। যেখানে মিশ্র আওয়াজে অনুনাসিকের খর্ব্ব উচ্চারণ, সেইখানেই সন্ধির সূত্রে ং এবং ঁ। সাধারণতঃ বলিতে গেলে স অক্ষরের স্থানবিশেষের উচ্চারণই বিসর্গ। "র"জাত বিসর্গের কথা পরে বলিব। প্রাচীনকালের প্রাকৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতির ঐতিহ্যে সাধারণ শ্রেণীর লোক কোথাও কোথাও "দুঃখ'' কথাটিকে "দুস্‌খ'' উচ্চারণ করিয়া থাকে। বিসর্গের সাধারণ মূর্ত্ত উচ্চারণ 'স'; শ, ষ, স তিনটির মধ্যে একটা সাধারণ আওয়াজ আছে, যাহার জন্ত তিনটিই একনামে পরিচিত হইয়াছে; সেই সাধারণ আওয়াজটুকু ভাবিয়া লইতে হয়, লিখিয়া বুঝান যায় না। তালু হইতে উচ্চারণ করিলে 'শ' যেরূপ উচ্চারিত হয়, তাহাতে যে ধ্বনিটি তেলেগু তামিলের 'চ' উচ্চারণের কাছাকাছি যায়, তবে 'শ' উচ্চারণটি আর একটু কঠোর রকমের ফিস্-ফিস্ আওয়াজের সহিত যুক্ত। তামিলে 'শ' একটু কোমল করিয়া উচ্চারণ করে বলিয়া 'চ' এবং 'শ' এ কোন প্রভেদ নাই; একই অক্ষর উভয়ের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের চ ও ছ বর্ণের উচ্চারণ প্রায় দ্রবিড়-উচ্চারণের কাছাকাছি। মহারাষ্ট্রের চ, ছ ও প্রায় তেলেগু তামিলের মত উচ্চারিত সন্ধির নিয়ম দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বকালে চ ছ প্রায় দ্রবিড়িধরণে উচ্চারিত হইত। সে কথা দেখাইতেছি। ষ টি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে খ হইয়া গিয়াছে, আমরাও ক+ষ 'ক্খ' উচ্চারণ করি, আমাদের ভাষার জননী পালিতেও ঐ উচ্চারণ। প্রাচীনতর উচ্চারণে একটা গম্ভীর ধ্বনি সূচিত হইত। তাহার প্রমাণ দিতেছি। অতি প্রাচীন কালে, "বৃ", "কং", "ষ" প্রভৃতি দ্বারা; যাহাকে "অনমেটোপইটিক্" শব্দ বলে, তাহা গড়া হইত। যথা:—বৃহ, বৃংহ, বৃংহতি; ঘোষ (ঘঃ ঘণ্টা অর্থে+ষ; ঘণ্টাতে আরও শব্দ যোগ আছে), মেষ ('মে'+ষ বা ধ্বনি) বৃষ, হ্রেষা, হর্ষ, ভাষ, মহিষ, রোষ (রু+ষ); কং (বা কণ্)+ষ হইতে কাংস্ত, জল শুকাইবার সময়কার শুষ্ ধ্বনি হইতে শুষ্ক ইত্যাদি। সিদ্ধান্তকৌমুদীর সঙ্গে মিলিতেছে না দেখিয়া হয় ত কেহ কেহ এ নূতন ব্যাখ্যায় বিরক্ত হইতেছেন। অভিনিবেশ করিলে বিরক্তির কারণ থাকিবে না। তবে আমার এ ব্যাখ্যা লইয়া যদি ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটুখানি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে আমি

ণ রাজি আছি। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে এবং একালের ভাষায় ভীম শব্দ বুঝাইবার অক্ষর ড। ললিত বাবু বলিতে পারেন যে, সেই জন্যই ভীমের স্ত্রী হিড়িম্বা। বৈদিক গেও 'ড' দ্বারাও ষণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান যে, সে লি ও অতি প্রাচীন বৈদিক শব্দ নয়। আমরা যেমন কথা ডবল্ করিয়া কড়্ কড়্, হুড়্, ব্যবহার করি, সেরূপে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে বৈদিক সময়ে কেবল য খন উচ্চারিত হইত। বলিয়া রাখি যে, ডবল্ না করিয়াও আমরা ড় দ্বারা তীব্রতাব্যঞ্জক বুঝাই; যথা—ঝড়, তোড়্ (বেগ অর্থে), দৌড় ('ধা'+ড়), ষেঁড়, ভেড় (শেষ দুটি চীন সংস্কৃতেও ব্যবহার আছে) ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিক রূপে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি নাই। ' বুঝাইতে হইলে, আমরা মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারাই বেশী বুঝাইয়া থাকি। ক্ষরটির উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে করিলে অনেক পরিমাণে প্রাচীন আওয়াজ পাওয়া যাইবে। টি, মহারাষ্ট্রে সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত হয়; ওড়িয়া উচ্চারণও প্রায় ঠিক। ষ্ট" প্রভৃতি শব্দে আমরাও তালুর উচ্চারণ কথঞ্চিৎ ঠিক রাখিয়াছি।

এখন বিসর্গের সন্ধির নিয়মগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলিয়া দেখাইতেছি চ্চারণের রীতি ধরিয়া লইলে বিনা সূত্রেই বিসর্গ-সন্ধির সূত্র অধীত হইতে পারে। সুবিধার জন্য প্রথমতঃ বর্ণমালা হইতে ক, খ এবং প, ফ; দূরে রাখিয়া দিব। র্গের সাধারণ মূর্ত্ত উচ্চারণ "স্"। প্রথমতঃ ঐ বিসর্গের পর চ, ছ; ট, ঠ; ও ত, থ তে পারে। তিনটি "স"এর generalised একটা কিছু উচ্চারণ নাই বলিয়া কথাটা া বুঝাইতে কষ্ট হইতেছে। সেই তিন 'স'এর এক অভেদ মৌলিক আত্মাটি, চ, ছ-যুক্ত ই 'শ' হইয়া ফুটিয়া উঠিবে; ট, ঠ যোগে ষ এবং ত থ, যোগে স হইবে। উপরের উচ্চারণ থেকেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে। সূত্রের প্রয়োজন নাই। (২) বিসর্গের পর, স থাকিতে পারে। এস্থলে সমান শ্রেণীর আওয়াজে মিলিয়া অন্য সন্ধির মত, আওয়াজ হইবে মাত্র, উহার বিকৃতি হইবে না। বিকল্পে বিসর্গ বজায় থাকার নিয়ম, আওয়াজের র অর্থশূন্য। এখন বাকি রহিল ব্যঞ্জনের মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণগুলি এবং ব হ। উহাদিগকে অন্তবিধ শ্রেণীবিভাগে ফেলিতেছি। বিসর্গ "অ"কারের পর, কারের পর অথবা অন্যান্য স্বরের পর থাকিতে পারে; এবং বিসর্গের পর অ, অথবা আ, অন্তস্বর, অথবা ব্যঞ্জনের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ ও য র ল ব হ থাকিতে পারে।

৩) অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃতে (অর্থাৎ পালিভাষায়) দেখিতে পাই যে, সকল ান্ত শব্দই কর্ত্তৃকারকে বা প্রথমার একবচনে ওকারান্ত হইয়া উচ্চারিত হয়; যেখানে ত্রয় হিসাবে বিসর্গ থাকিবার কথা এবং না থাকিবার কথা, এ উভয় স্থলেই ঐ রূপ ণ হয়। নয়ো, নিব্বুতো, ধম্মো, কম্মো ইত্যাদি। একালের প্রাকৃতগুলির মধ্যে বাঙ্গালায় প্রাচীন প্রাকৃতের ও-ঘেঁষা উচ্চারণ রক্ষিত আছে। পালি উচ্চারণ বৈদিক উচ্চারণের অনুরূপ ছিল বলিয়া মনে করিবার অনেক কারণ আছে। সংস্কৃতের

ব্যাকরণের নিয়ম অপেক্ষা, পালির ব্যাকরণের অনেক নিয়ম বা রীতি, বৈদিক ভাষার বেশী নিকটবর্ত্তী। বৈদিক ভাষার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগের ভাষার সহিত পালির ব্যাকরণের মিল অতিশয় অধিক। সন্ধির নিয়ম হইতে প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছি। অথ ঋতু ; বৈ ঋচঃ (বৃহদ্দেবতা ২।১৩ ও ১।১৮) প্রভৃতি স্থলে যেমন সন্ধি নাই, পালিতেও তেমনি। দৃশ্যন্তে+অন্যাঃ=দৃশ্যন্তেঽন্যাঃ (বৃঃ ১।৮), যে+অনুমতেঃ=যেঽনুমতেঃ (বৃ, ৪।৮৮) প্রভৃতিতে পালির মত নিয়ম রহিয়াছে। তার পর শব্দরূপে সুদাঃ শব্দ, পালির মত সুদাস্" রূপেই লেখা পাই (বৃ-৮।৩৪)। আবার ওই পালির মত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে চতুস্ভিঃ স্থলে চতুর্ভিঃ, প্রথম পুরুষের তৃতীয়ার একবচনে অনুশাসতি, অসমাপিকাক্রিয়া বুঝাইতে "য" স্থানে "ত্বা" এবং ত্বা স্থলে "য" ইত্যাদি ইত্যাদি পাইয়া থাকি।

এখন যদি উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে এই মাত্র বলা চলে যে, পালির মত যদি অকারান্ত শব্দের ও-ঘেঁষা উচ্চারণ হইবেই (বিসর্গ পরে থাকাতেই হয় ত সেই প্রকার উচ্চারণের সৃষ্টি) তাহা হইলে সর্ব্বত্রই বিসর্গের উচ্চারণের লোপ, এবং ও-কারের উচ্চারণের প্রাধান্য থাকিবে। "অ" পরে থাকিলে লুপ্তচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোন অক্ষরই লোপ পায় না ; কেবল প্রথম পদে যুক্ত উচ্চারণ টুকুরই তীব্রতার প্রাধান্য থাকে। বিসর্গের পর অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে প্রথম শব্দটিতে "ও" আওয়াজ রাখা অসম্ভব ; পূর্ব্বে তাহা অন্ত সূত্রের বিচারে বলিয়াছি। তাই সূত্রে কেবল বিসর্গ লোপের ব্যবস্থা আছে। গ-হ ব্যঞ্জন পরে থাকিলেও কেবল ওকার রহিয়া যায়। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই হইল না। যেমন ছিল, তেমনি রহিল। ঠিক ঐ রূপ আবার আকারের পরে বিসর্গ থাকিলে এবং বিসর্গের পর স্বরবর্ণ এবং গ-হ ব্যঞ্জন থাকিলে কোন সন্ধিই হয় না। বিসর্গের উচ্চারণ ঐ স্থলে বিশেষত্ব পাইয়া ফুটিয়া উঠিতে পথ পায় না ; এই পর্য্যন্ত। তাহা হইলে বিসর্গের একটা সন্ধিই রহিল না, অথচ ঐ সন্ধি মুখস্থ করিতেই যত গোল ঘটে।

ক, খ, প, ফ প্রভৃতি পরে থাকিলেও বৈদিকে কোন সন্ধি হইত না ; তবে যে সময়ে বিসর্গের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, তখন বিসর্গের মূর্ত্ত উচ্চারণ "স" রাখিতে হইয়াছে মাত্র। সাধারণ সন্ধির নিয়মে উহাই পাই। কাজেই এখানেও কোন সূত্রের প্রয়োজন হইল না। কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়া সর্ব্বত্রই ঐ ষ মূর্দ্ধণ্য। ক খ, প, ফ পরে থাকিলে কঠোর উচ্চারণই স্বাভাবিক ; কিন্তু নমস্কার প্রভৃতি অল্প কয়েকটি শব্দে মৌলিক স উচ্চারিত হয় এই মাত্র। হয় ত ওগুলি নিত্যব্যবহৃত শব্দের নরম আওয়াজের ফল।

কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কোন একটা বিশেষ রীতিসিদ্ধি (idiomatic use) অনুসারে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরের বিসর্গের স্থানে প্রাচীন কালে "র" হইত, দেখিতে পাই। এই নিয়মটি বেদের পদপাঠের প্রতি লক্ষ্য করিলে বৈদিক যুগে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণসাহিত্যের সংস্কৃতে এ সন্ধি আছে। পালিতে আবার

এমন অনেক স্থলে সন্ধিতে "র" আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে না আছে বিসর্গ, না আছে "র"এর সঙ্গে দূরসম্পর্কযুক্ত অন্ত কিছু। তবুও কেন হয়? র পরে থাকিলে বিসর্গ বিকৃতির যে সূত্র আছে, সেইরূপ কার্য্য হইবে বলিয়া আশা করা যাইত; অর্থাৎ বিসর্গের পর একটা কেবল দীর্ঘ উচ্চারণ হইতে পারিত। কেন না ঐ স্থলে স্ ও র এর একটা সংযুক্ত কঠোর উচ্চারণ পরিহার করিবার কথা মাত্র। যেমন নীরস, পিতারক্ষ প্রভৃতি হয়, তেমনি যদি নীভয়, নীধন প্রভৃতি হইত, তবে আমাকে মাথা ঘামাইতে হইত না। এখানে রামমাণিক্যের সি, সিজ্, সিম্ মনে পড়িতেছে। যেমনটি চাই, ঠিক তাই ঘটে কৈ? বিসর্গের সন্ধি আদপে নাই বলিয়া খালাসের চেষ্টায় ছিলাম এবং "ভো যজুপতে" এবং "স হসতি" বলিয়া আরো দুটি সূত্র ধ্বংস করিতে পারিতাম; কিন্তু দায়ে ঠেকিয়াছি। একটা অনুমানের কথা বলিব। অনুমান অনুমানমাত্র—সিদ্ধান্ত নহে। নিঃ+ভয় প্রভৃতিতে পালি ভাষায়, আমার আশার অনুরূপ ডবল উচ্চারণ (দীর্ঘের প্রকারভেদ মাত্র) হইত। যথা—নির্ভয়, নিদ্ধন ইত্যাদি। পালিতে, অর্থাৎ সেকালের সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় রেফ্ লোপ করিলেও দীর্ঘ উচ্চারণ হইত; এখনো বাঙ্গালায় উহা প্রচলিত আছে। যথা—ধর্ম্ম স্থলে ধম্ম, কর্ম্ম স্থলে কম্ম ইত্যাদি। হইতে পারে, যে যখন প্রাকৃতকে ঘষিয়া মাজিয়া সাধু বা সংস্কৃত করা হইয়াছিল, তখন সাধারণ একটা নিয়ম বা সূত্রের মধ্যে একচেহারায় সকলকে ফেলিবার উদ্যোগে; "ধর্ম্ম" প্রভৃতির Analogyতে নির্ভয় প্রভৃতিকে নির্ভয় করিয়া নূতন সূত্র গড়া হইয়াছিল। আমার অনুমানটি পণ্ডিতসমাজে যদি দৈবাৎ গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলেও একটা খট্‌কা রহিয়া যাইতেছে।

যদি এমন হইত যে, যেগুলি র-জাত বিসর্গ সেইগুলির স্থলেই র হয়, তাহা হইলে সহজ সিদ্ধান্ত হইত। কেন না বৈদিকযুগে র-জাত একটা বিসর্গ নয়; সহজ রকমে র-অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ মাত্র। বৈদিকযুগের বহু পরবর্ত্তী সময়েও পুনর্, প্রাতর্, অন্তর্ প্রভৃতি খাঁজা খাঁজা ব্যবহার হইত; কাজেই সন্ধিতে র জুড়িয়া দিবার সময় বিসর্গের সূত্র ভাবিবার দরকার ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যেই যখন প্রাতর্ প্রভৃতি ছাড়া স-জাত বিসর্গের স্থলে "র" আগমনের কথা পাই; স্বয়ং পাণিনিকেই যখন বিশেষ সূত্র রচনা করিয়া—অম্নস্ উধস্ অবস্ স্থলে রেফ শুদ্ধ হয়, বলিয়া একটা বিশেষ সূত্র লিখিতে হইয়াছে, তখন আর প্রাকৃত নিয়মের তুড়িতে একটা সূত্রকে উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। বিদ্যালয়ের ছাত্রের মুখস্থের জন্ত ঐটি জীবিত থাকুক। অন্তগুলির মত একটা উচ্চারণের নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া উহাকে প্রাকৃত আওয়াজ বা শব্দব্রহ্মে বিলীন করিতে পারিলাম না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় শব্দের পরিভাষা

নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে যে সকল পরিভাষা মনোনীত হওয়ায় সংগ্রহ করিলাম তাহাদের পশ্চাতে সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইল।

(১) মাধবনিদান—কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দিগের দ্বারা প্রকাশিত।

(২) কবিরাজি শিক্ষা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রণীত।

(৩) বৈদ্যকশব্দসিন্ধু—শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অংসশোষ—Arthritis of the shoulder joint
অক্লিন্নবর্ত্ম—Acute palpebral conjunctivitis.
অগ্নিমান্দ্য—Anorexia (২) (১)
অগ্নিরোহিণী—Anillary carbuncle
অগ্নিবিসর্প—Cutaneous erysipelas
অজকাজাত—Staphyloma
অজগল্লিকা—Strophulus
অজীর্ণ—Dyspepsia (২)
অঞ্জনি—Hordeolum (২)
অতিসার—Diarrhœa (১) (২)
অধিজিহ্ব—A tumour on the tongue (৩)
অধিমন্থ—Uveitis (?) ; catarrhal ophthalmia (২)
অধিমাংসক—Inflammation of the gum round the wisdom tooth.
অধিমাংসার্ম্ম—Episcleritis
অধ্রুষ—Inflammation of the hard palate.
অনন্তবাত—Trigeminal neuralgia (?)
অনার্ত্তবা—Amenorrhœa
অনিলজ্বর—Ague
অনুশয়ী—Abscess of the foot
অন্তরায়াম—Emprosthotonus
অন্তর্বিদ্রধি—Internal abscess
অন্ত্রবৃদ্ধি—Rupture, hernia (২)
অন্যতোবাত—Supra-orbital neuralgia
অন্যেদ্যুষ্কজ্বর—Quotidian fever (২)
অপচী—Tubercular lymphadenitis
অপতন্ত্রক—Apoplectic fit (২)
অপতানক—Hysterical fit (২)
অপবাহুক—Stiffness of the shoulder joint (১)
অপস্মার—Epilepsy (২)
অপীনস—Chronic rhinitis
অভিঘাতজ শোথ—Cutaneous emphysema
অভিঘাতজ্বর—Traumatic fever
অভিন্যাসজ্বর—Ardent fever (২) (১)
অভিষ্যন্দ—Conjunctivitis, ophthalmia
অধ্রুষ—Inflammation of the palate
অম্লপিত্ত—Acidity (২) (১), acid dyspepsia
অম্লাধ্যুষিত—Iritis (২) (১)
অরিষ্ট—Death signs
অরুংষিকা—Porrigo
অরোচক—Anorexia
অর্জ্জুন—Chemosis
অর্দ্দিত—Facial paralysis (২)
অর্দ্ধাবভেদক—Migraine (২)
অর্ম্মন্—Pterygium
অর্ব্বুদ—Tumour (১)
অর্শ—Pile (১)
অলস—Chilblai

পর্ব্বণী—Spring catarrh
পক্ষকোপ—Trichiasis
পক্ষপাত—Opthalmia tarsi (২)
পরিস্রাব্যুদর—Peritonitis
পাণ্ডু—Mild jaundice
পাদদারী—Cracked sole (২) (১)
পাদহর্ষ—Peripheral neuritis
পানাজীর্ণ—Alcoholic gastritis
পানাত্যয়—Alcoholism (২) (১)
পামা—Eczema (২) (১)
পাষাণগর্দ্দভ—Acute parotitis (২) (১)
পিচ্চিতভগ্ন—Depressed fracture
পিচ্চিতব্রণ—Contused wound
পিত্তকাশ—Stomach cough
পিত্তজ্বর—Bilious fever (২) (১)
পিত্তলাযোনিরোগ—Vaginitis
পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি—Nyctaolpia
পিত্তাভিষ্যন্দ—Acute mucopurulent conjunctivitis
পিষ্টক—Anterior staphyloma of sclera
পিষ্টমেহ—Oxaluria
পীনস—Atrophic rhinitis
পুত্রঘ্নী—Habitual abortion (২)
পূতিনস্য—Ozoena (২)
পূতিকর্ণ—Purulent otorrhoea
পূর্ব্বরূপ—Premonitory symptom
পূয়ালস—Acute dacryocystitis
পোথকী—Trachoma
প্রক্লিন্নবর্ত্ম—Subacute palpabral conjunctivitis
প্রতমকশ্বাস—Stertorous breathing
প্রতিশ্যায়—Nasal catarrh
প্রতীনাহ—Nasal obstruction
প্রত্যাধ্মান—Intestinal tympanitis
প্রবাহিণী—Third Houston's valve
প্রলাপ—Delirium
প্রলেপক—Hectic fever
প্রবাহণ—Tenesmus
প্রবাহিকা—Dysentery (২)
প্রস্রংসিনী—Prolapsus vagini
প্রস্তার্য্যার্ম্ম—Croupous conjunctivitis
প্লীহোদর—Enlarged spleen, leukaemia
বন্ধ্যা—Sterility (২)
বলাস—Pinguicula
বহুলবর্ত্ম—Follicular conjunctivitis
বহিরায়াম—Opisthotonas
বালরোগ—Diseases of children
ভগন্দর—Fistula in ano
ভস্মকাগ্নি—Bulaemia
ভিন্নব্রণ—Punctured wound of a viscus
ভ্রমরোগ—Vertigo
মক্কল—Afterpain
মজ্জাগত ভগ্ন—Impacted fracture
মহাপদ্ম বিসর্প—Infantile erysipelas
মহাশৌষির—Necrosis of jaw
মহাশ্বাস—Sighing respiration
মাংসতান—Oedematous laryngitis
মাংসসঙ্ঘাত—Sarcoma of palate
মাষক—Wart (১)
মুখদূষিকা—Acne (১)
মূঢ়গর্ভ—Obstructed labour
মূত্রকৃচ্ছ্র—Strangury (২) (১)
মূত্রসাদ—Ardor urinae
মূত্রাঘাত—Retention of urine
মূত্রোৎসঙ্গ—Stricture of urethra
মূর্চ্ছা—Fainting
মেদোরোগ—Obesity (২)
মোহ—Fainting
যকৃদ্দাল্যুদর—Enlarged liver
যক্ষ্মা—Phthisis (১)
রক্তপিত্ত—Haemorrhage (২)
রক্তবমন—Haematemesis
রক্তগতমসূরিকা—Haemorrhagic small-pox
রক্তজবৃদ্ধি—Haematocele (২)
রক্তাদি ধাত্বাশ্রয়কামলা—Toxic jaundice
রক্তমেহ—Haematuria
রক্তার্ব্বুদ—Adenoma of palate

রক্তাতিসার—Blood diarrhoea
রক্তার্শ—Pterygium vasculosum
রসগতমসূরিকা—Chicken-pox
রাজযক্ষা—Galloping phthisis
রূপ—Symptom
রোমান্তী—Measles (২)
লক্ষণ—Symptom
বক্রভগ্ন—Greenstick fracture
বর্ত্মবন্ধক—Oedema of eyelid
বর্ত্মশর্করা—Blepharo-lithiasis
বর্ত্মার্ব্বুদ—Blepharoncus
বস্তিকুণ্ড—Atony of the bladder
বসামেহ—Chyluria
বল্মীক—Rupia eruption
বাতকণ্টক—Sprain of the ankle (২) (?)
বাতকাশ—Dry cough
বাতপর্য্যায়—Ophthalmalgia
বাতব্যাধি—Nervous disease (২)
বাতগুল্ম—Phantom tumour
বাতাষ্ঠীলা—Ovarian tumour
বাতাহত বর্ত্ম—Blepharoplegia
বাতাভিষ্যন্দ—Mild catarrhal conjunctivitis
বিচর্চ্চিকা—Psoriasis (২)
বিচূর্ণিত ভগ্ন—Comminuted fracture
বিদগ্ধাজীর্ণ—Acid dyspepsia
বিদারী—Phlegmonous pharyngitis
বিদ্ধব্রণ—Punctured wound (১)
বিদ্রধি—Diffuse abscess
বিবর্ত্তিত সন্ধিভগ্ন—Complete dislocation
বিশ্লিষ্টসন্ধি—Subluxation of joint
বিষমজ্বর—Intermittent fever (২) (১)
বিসর্প—Erysipelas (২) (১)
বিসর্জ্জনী—Second Houston's valve
বিসূচিকা—Cholera (২)
বিস্ফোট—Boil
বৃষণকচ্ছু—Pruritus scroti (২)
বেপথু—Paralysis agitans (২)
বৈদর্ভ—Septic gingivitis
ব্যঞ্জন—Symptom
ব্রণগ্রন্থি—Sore
ব্রণশোথ—Abscess (২)
বিশ্বচী—Monoplegia (of arm)
শঙ্খক—Temporal neuralgia
শতপোনক—Fistula en arrosoir
শনৈর্মেহ—Frequent micturition
শর্করার্ব্বুদ—Carcinoma
শিরাজপিড়কা—Phlyctenular conjunctivitis
শারীরব্রণ—Ulcer (২)
শিরাজাল—Pannus
শিরাজগ্রন্থি—Suppurating gland
শিরোহৃষ্টন—Cephalalgia
শিরাপ্রহর্ষ—Acute seropurulent conjunctivitis
শিরাগ্রহ—Rigidity of neck
শিরোৎপাত—Acute haemorrhagic conjunctivitis
শিরোরোগ—Headache (১)
শিলায়ু—Post-pharyngial fibroma
শীতপিত্ত—Urticaria (২) (১)
শীতপূর্ব্বজ্বর—Ague
শীতাদ—Scurvy (২) (১)
শুক্তিকা—Spring catarrh
শুক্রাশ্মরী—Seminal calculus, Prostatic calculus
শুক্লার্শ—Pterygium
শুক্রমেহ—Spermatorrhcea (১)
শুষ্কাক্ষিপাক—Xerophthalmos
শুদ্ধব্রণ—Healthy ulcer
শূলরোগ—Colic (২)
শোণিতার্শ—Blepharocarcinoma
শোথ—Dropsy, oedema (২) (১)
শৌষির—Gingivitis
শ্যাবদন্ত—Black teeth (২) (১)
শ্লীপদ—Elephantiasis (২)
শ্বাসরোগ—Asthma (১)
শ্বিত্র—Leucoderma

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি—Hemeral opia
শৈষ্মিককাস—Mucous cough
সংরোহণ ব্রণ—Healing ulcer
সংস্থান—Symptom
সংক্রামকরোগ—Contagious disease
সততকজ্বর—Biquotidian fever (২) (১)
সন্ততজ্বর—Remittent fever (২) (১)
সদ্যোব্রণ—Wound (২) (১)
সন্নিপাতজ্বর—Adynamic fever
সন্ন্যাস—Apoplexy (২) (১)
সন্ধিভগ্ন—Dislocation
সম্প্রাপ্তি—Infection
সর্ব্বাঙ্গরোগ—Landry's paralysis
সম্বরণী—Third Houston's valve
সব্রণশুক্র—Corneal ulcer
সশোথনেত্রপাক—Gonorrhoeal ophthalmia
সিকতামেহ—Phosphaturia
সুরামেহ—Pyuria
সান্নিপাতিক মূর্চ্ছা—Coma
সূতিকারোগ—Pernicious anaemia after delivery
স্পর্শহানি—Anaesthesia
স্নাবর্ম্ম—Chronic pterygium
স্বরঘ্ন—Acute laryngitis
স্বরভেদ—Hoarseness
স্ফুটিতভগ্ন—Fissured fracture
হতাধিমন্থ—Panophthalmitis
হনুগ্রহ—Trismus
হলীমক—Malignant jaundice (২) (১)
হিক্কা—Hiccough (১)

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।

কৃত্তিবাসের জন্মশক

বাঙ্গালা রামায়ণকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্মশক সম্বন্ধে দুই মত দেখিতে পাই। সন ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের বংশাবলী বিচার করিয়া তাঁহার জন্মশক ১২৫৭ অনুমান করিয়া ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া "বিশ্বকোষকার" শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাস ১৩৩৫ শকের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাস খৃঃ ১৪৪০ অব্দে কি তৎসন্নিহিত অব্দে জন্মিয়াছিলেন। ইহাতে জন্মশক ১৩৬২ পাই।

একদিকে ১২৫৭ শক, অন্যদিকে ১৩৬২ শক। উভয়ের অন্তর প্রায় এক শত বৎসর।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (২য় সংস্করণ) দীনেশবাবু কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ নামে একটি পয়ার উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে আছে,

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

ইহাতে জানা যাইতেছে, কৃত্তিবাস মাঘ মাসের শেষদিনে (২৯ কি ৩০ মাঘ), রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন ১৩১০ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় খনা নামক প্রবন্ধের পাদটীকায় আমি লিখিয়াছিলাম, ঐরূপ ঘটনা ১৩৫৯ কি ১৩৭৮ শকে ঘটিতে পারিত। পরে জ্যোতিষগণনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই শকই ভুল। শক ১২৫০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে কোনও বৎসরে ফাল্গুন (কুম্ভ) সংক্রান্তি রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পড়ে নাই। এই হেতু আত্মবিবরণ এবং শ্লোকের অর্থে সন্দেহ হইতেছে।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, তিনি বদনগঞ্জের ৺হারাধন দত্ত ভক্তিবিনোদের নিকট আত্ম-বিবরণটি পাইয়াছিলেন। এই সংবাদে বদনগঞ্জে ভক্তিবিনোদের বাড়ীতে পুথীখানা দেখিতে এক বন্ধুকে অনুরোধ করি। তিনি নিজে বদনগঞ্জে যাইতে পারেন নাই। অপর এক ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন, ৺হারাধন দত্তের বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এক জন খুব বৃদ্ধ কথক ও গায়ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় তাঁহার নিকট হইতে ৺হারাধন দত্ত তাঁহার সমস্ত হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৺হারাধন দত্ত ঐ সকল পুস্তকের প্রত্যেক শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসীকে বিক্রয় করেন। * * কিন্তু এক প্রস্ত করিয়া নকল তাঁহার বাটীতে আছে। আপনি যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন, উক্ত হস্তলিখিত নকলেও উহা ঠিক ঐরূপ আছে, কোন ভুল নাই। সন ১৪২৩ শকে সে পুথিটি প্রথমে হাতে লেখা হইয়াছিল।"

অতএব শ্লোকটি অন্ততঃ একখান পুথিতে আছে। সে পুথিও পুরাতন, ১৪২৩ শকে লেখা।

আমার জিজ্ঞাস্য এই

১। পরিষদের রামায়ণ-প্রকাশ-সমিতি যে ৩৫০ বৎসরের পুরাতন পুথী আদর্শ করিয়াছেন তাহাতে কিংবা অন্য কোন পুথীতে শ্লোকটি আছে কি না?

২। যদি কেহ শ্লোকটি ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা করিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ফল জানাইলে আমার গণনা মিলাইতে পারি।

আমি গণনার নিমিত্ত স্বীকার করিয়াছি—

১, পূর্ণমাঘমাস ২৯ কি ৩০ মাঘ অর্থাৎ কুম্ভ-সংক্রান্তি।

২, সংক্রান্তিদিন পূর্ব্বমাসে যায়, পরমাসে গণ্য হয় না। (ওড়িশায় পরমাসের প্রথম দিন হয়।)

৩, শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা হয় না, ষষ্ঠীযুক্তা হইতে পারে (রঘুনন্দন)।

শক ১২৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত, দুইশত বৎসরের মধ্যে শক ১২৫৯, ১২৭০, ১৩৫৪, এবং ১৩৮১ এই চারিবৎসরে শ্লোকের লিখিত যোগ ঘটিতে পারিত। কিন্তু কুম্ভসংক্রান্তি দিন।

১২৫৯ শকে ৩০ মাঘ রবিবার তিথি চতুর্থী (৫৫ দং)

১২৭০ „ ২৯ „ শনিবার। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রির পরে হওয়াতে ৩০ মাঘ রবিবার মাস শেষ হয়। সে দিন কিন্তু তিথি ষষ্ঠী (৩৫দং)।

১৩৫৪ „ ২৯ „ রবিবার তিথি চতুর্থী (২৮ দং)।

১৩৬৫ „ ২৯ „ রবিবার তিথি ষষ্ঠী (৩৯ দং)।

অতএব একদিনও শ্লোকলিখিত যোগ ঘটে নাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কি তিথি গণনায় ভুল করিয়াছিলেন? পূর্ণ মাঘ মাস অর্থে যেন ৩০ দিনে মাস শেষ মনে হয়। তাহা হইলে ১২৭০ শক পাই। কিন্তু সেদিন রবিবার হইলেও পঞ্চমী নহে। ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীপঞ্চমী হইতে পারে না। গণনায় নিমিত্ত আমি ভাস্বতী অবলম্বন করিয়াছি।

যাঁহারা পুরাতন তাম্রশাসনাদির তিথি তারিখ মিলাইয়া থাকেন, তাঁহারা বলিতে পারেন পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মাসসংক্রান্তি পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী মাসে গণ্য হইত। ওড়িশায় পরবর্ত্তী মাসে গণ্য হয় বলিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, হয়ত পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশেও এই রীতি ছিল।

আত্মবিবরণটি পড়িলে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিতে সন্দেহ হয় না। যখন ১৪২৩ শকের পুথীতে ছিল, তখন আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন্ শকে কৃত্তিবাস জন্মিয়াছিলেন? *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

* প্রবন্ধটি কলিকাতায় হারাইয়া গিয়াছিল। পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে একটা নকল পাইলাম। এই হেতু পরিষদে উপস্থিত করিতে বিলম্ব হইল। —প্রবন্ধ-লেখক।

ত্রিনাথের উপাখ্যান

প্রবাসীতে ত্রিমুখমূর্ত্তি (২৯৭ পৃষ্ঠা, ১৩১৭ সাল) ও বোম্বাই অঞ্চলে এই শব্দ-সাদৃশ্যের নাম দেখিয়া আমি "ত্রিনাথ" শব্দটি অর্থশূন্য অনার্য্য ভাষার অঙ্গ বা পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের নামের সংজ্ঞা-বিশেষ না বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নাম যেমন বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, তদ্রূপ ত্রিনাথও হইতে পারে। সাধারণের বিবেচনায় এই শব্দ দ্বারা সাকার দেবতা বা নিরাকার ঈশ্বর যাহাই কিছু অনুমিত হউক না কেন, এ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ত্রি=ত্রি বা তিন (অর্থাৎ ত্রিসংসার=স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের যিনি নাথ, অর্থাৎ স্বামী বা প্রভু, তিনিই ত্রিনাথ—সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কর্ত্তা)। এই ত্রিনাথ শব্দে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি ত্রিবোধক যাবতীয় শব্দের সমষ্টিসম্ভূত অর্থ এক ঈশ্বরই এই ত্রিনাথ শব্দদ্বারা জ্ঞাপিত হইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ত্রি-শব্দ থাকায় চরাচর বিশ্বের অধিপতি এক ঈশ্বর সমর্থিত হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত সাধু ব্যক্তি স্থির ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন, ত্রি-শব্দ পূরণবাচক শব্দ নয়, ইহা সংখ্যাবাচক শব্দ। ত্রিসংসার বলিতে যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্ব জ্ঞাপিত হয়। এসিয়া, ইয়ুরোপ বা আমেরিকাদি দেশের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। এক্ষণে এই ত্রিনাথ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান-পাঠে পাঠক কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

কোনও জনপল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা আপন পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতেন। একে ভিক্ষোপজীবী তাহাতে একাকী, ব্রাহ্মণ সংসার-ভারাক্রান্ত হইয়া কঠোর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত ও প্রপীড়িত হইয়া একদা বিষণ্ণ বদনে ও ছিন্নবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোন এক ধনী বণিকের দ্বারস্থ হইলেন। সায়ংকালে বণিকের পুরী লোকে লোকারণ্য। তিনি কৌতূহলাবিষ্ট ও ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দ্বারে উপবেশন করিলেন। লোকজন ক্রমশঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে ভূষিত হইয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইয়া তথায় কোন এক আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বণিকের বাটীতে এত স্ত্রীপুরুষের আনন্দোৎসব কিসের?" আগন্তুক ব্যক্তি দরিদ্র অথচ সরল ও পবিত্রচেতা ব্রাহ্মণের নিরতিসন্ধিপূর্ণ প্রশ্নাবলীর উত্তরে বলিলেন "আজ বণিক্ বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ ও মণিরত্নাদি এবং পণ্যদ্রব্যপূর্ণ জাহাজ নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে সংলগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে তিনি বাটীতে পৌঁছিয়া আপন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি লইয়া শ্রীশ্রী৺ত্রিনাথের পূজার মানস ও তাঁহার মেলায় আয়োজন করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ও অতিথি ইত্যাদি পৌঁছিলে, তিনি স্ত্রীপুরুষে সংযত

মনে পুত্রকন্যাদির সহিত ত্রিনাথের মানসিক পূজা সমাধা করিয়া বিদেশে বাণিজ্যলব্ধ ধনরত্নাদি গৃহে আনয়ন করিবেন এবং পণ্যদ্রব্যাদির বিকিকিনি (ক্রয়-বিক্রয়) করিবেন।"

ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের মহোৎসবের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া জানিলেন, 'ভক্তিভাবে ইঁহার পূজা করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়; সংসারের যাবতীয় দুঃখ ও দরিদ্রতা দূরীভূত হইয়া দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইঁহার পূজা মানসিক করিলে, যে কোন প্রকার অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পীড়াদি এবং দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়। পঙ্গু পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, বোবা ও বাক্‌শক্তি পাইতে পারে, অন্ধও ত্রিনাথের মহিমায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে; প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ত্রিনাথের পূজা করিলে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল লাভ হইতে পারে।' ত্রিনাথের এবম্বিধ মহিমা অবগত হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ আনন্দে গদ্গদ হইয়া ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত প্রভু ত্রিনাথের আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ও মানসপূজার সঙ্কল্প করিয়া সে রাত্রি বণিকের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। প্রভু ত্রিনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বণিক্ প্রভু ত্রিনাথের মহিমায় নিজে কি প্রকার দুঃখদুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার হইয়া সামান্য দীনদরিদ্র বণিকের অবস্থা হইতে আজ ক্রোড়পতি হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিলেন। বণিক্‌ও ব্রাহ্মণের নিকট এই সমস্ত পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণের বিপদ্ আপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য ত্রিনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে ও নিয়মিত উপচারে তাঁহার পূজা করিতে পরামর্শ দিল। ব্রাহ্মণ স্বতঃই আপনার দারিদ্র্য-ভারে প্রপীড়িত ছিলেন ও বণিকের নিকট প্রভু ত্রিনাথের এবম্বিধ মহিমা শ্রবণ করিয়া প্রভাতে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ত্রিনাথের পূজার খরচ অতি সামান্য। নিতান্ত দীন দরিদ্র ব্যক্তির উপরও ত্রিনাথ ঠাকুরের দয়ার এই অক্ষুণ্ণ প্রমাণ। ধান্য, দূর্ব্বাদল ও পত্রপুষ্পের সহিত তিন কপর্দ্দক প্রয়োজন। বাহ্য উপচারের জন্য কিছু মিষ্টান্ন ও ঘৃত দীপাদির জন্য কিছু ব্যয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ এমনই দরিদ্র যে, এই তিন কপর্দ্দকেরও সংস্থান তাঁহার নাই। তিনি বণিকের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিনাথ ঠাকুরের সমস্ত উপাখ্যান ব্রাহ্মণীর নিকট বলিলেন, কিন্তু উভয়েই এই তিন কপর্দ্দকের সংস্থানের উপযুক্ত কোন কিছু আপন ঘরে পাইলেন না। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। ত্রিনাথের পূজার মানস করিয়াছেন, ভিক্ষাদিদ্বারা যে কোনও প্রকারে হউক প্রভুর উৎসব সম্পাদন করাই চাই। ব্রাহ্মণের হৃদয় ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে পরিপূর্ণ। ভক্তবৎসল ত্রিনাথ কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, তিনি যে দীনবন্ধু, ভক্তের প্রাণধন, অন্তর্য্যামী, বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর, যাঁহার কৃপাদৃষ্টি দীন ধনী সবারই উপর সমান। ভক্তের আকুল ক্রন্দনে হৃদয়ের দৃঢ় প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাবল্যে কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? দীন ব্রাহ্মণের ভক্তি ও আগ্রহের বেগে তাঁহার অটল সিংহাসন কম্পিত হইল। অন্তর্য্যামী প্রভু ব্রাহ্মণের প্রতি সদয় হইলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট স্থানে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পার্শ্বেই বেনাঝাড়ের মধ্যে তিন কপর্দ্দক দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ বুঝিলেন—ইহা দেবতার দয়া, যাঁহার শরণ লইয়াছেন, ইহা তাঁহারই দয়া। এইরূপে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিনাথের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে ত্রিনাথের পূজা দিবার জন্য ব্রাহ্মণ কপর্দ্দক লইয়া বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য "পঞ্চা" নামক জনৈক কলুর দোকানে আসিয়া এক কপর্দ্দকের তৈল প্রার্থনা করিলেন। এই পঞ্চাকলু বহুদিন পরে ব্রাহ্মণকে এক কপর্দ্দকের তৈল খরিদ করিতে দেখিয়া মনে ভাবিল, ইহাকে ঠকাইতে হইবে। সংকল্প করিয়া পঞ্চাকলু ব্রাহ্মণকে তৈলের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি প্রভু ত্রিনাথের পূজা দিবার জন্য আজ সমস্ত রাত্রি এই তৈল জ্বালাইব।" পঞ্চা কলু ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ব্রতভঙ্গের জন্য (অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি যাহাতে বাতি বা প্রদীপ জ্বালাইতে না পারে) এরূপ কম চোঙ্গায় তৈল মাপিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যদিও জানিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু ত্রিনাথ সমস্তই জানিতে পরিলেন। পঞ্চা কলুর ঠকামি বুঝিয়া তাহাকে শাস্তির সহিত শিক্ষা দিবার মানসে ত্রিনাথ ঠাকুর স্বয়ং উহার তৈল অপহরণ করিলেন। পঞ্চাকলু কম মাপের চোঙ্গায় তৈল মাপিতে মাপিতে সমস্তই নিঃশেষ করিল, কিন্তু চোঙ্গা পূর্ণ করিতে পারিল না। তৈলভাণ্ড শূন্য হইল, অথচ চোঙ্গা ভরে না দেখিয়া পঞ্চাকলু আপনার শঠতার শাস্তি বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কলুকে পা ধরিয়া কাঁদিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" পঞ্চাকলু আপন শঠতার কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তিনি কলুর কথা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইয়া ইহা ত্রিনাথ ঠাকুরেরই লীলা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে গদগদ হইয়া পড়িলেন ও পঞ্চাকলুকে ত্রিনাথের মহিমা বুঝাইয়া বলিলেন এবং তৈল ফিরিয়া পাইবার জন্য পূজা দিতে পরামর্শ দিলেন। এক কপর্দ্দকেরও কম তৈল লইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপচারে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত সায়ংকালে প্রভু ত্রিনাথের পূজা সম্পন্ন করিলেন। ত্রিনাথঠাকুরের কৃপায় কম তৈলেই ব্রাহ্মণের প্রদীপ সমস্ত রাত্রি জ্বলিল। ত্রিনাথের উৎসব সমাধা হইবার পর হইতে তাঁহার দিন দিন সর্ব্ববিধ উন্নতি হইতে লাগিল। প্রভু ত্রিনাথের প্রসন্ন দৃষ্টিতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংসার—ধনজন দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দরিদ্রতা পাশ হইতে উদ্ধার হইয়া ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মোটামুটি ত্রিনাথঠাকুরের পরিচয় দিলাম। পাঁচালিখানির এখনও অনুসন্ধান হয় নাই।*

চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি

* ত্রিনাথের পাঁচালী লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে। পত্রিকা-সম্পাদক।

প্রাচীন পুথির বিবরণ

৫০০। ইমাম-সাগর

আমি যে "ইমাম-সাগর" খানি পাইয়াছি, উহা নকল। আসলখানা কতদিনের রচিত, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। ২য় পৃষ্ঠার একস্থানে লিখিত আছে :—

আল্লা রসুলের যদি কৃপা দৃষ্টি পানু।
বাঙ্গালা হইতে ইমাম সাগর (পুস্তক) শুনানু॥
শেখ মুবাকু আলী (?) সে বিদিত সংসার।
তাহার তনয় শেখ ফরিদ খোন্দকার॥
রচিল চুড়ান আলী (?) তাহার তনয়ে।
শেখ পহোরি (?) আমার "কুরাছি" কুল হএ॥
ইমাম সাগর পুথি পরে যে 'মমিন'।
অবশ্য দেলের ভেদ পাইবে সে জন॥

ইঁহাদের সম্বন্ধে (এখানে) কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ১৯৮ পৃষ্ঠায় আছে :-

আমার আরজ এক সভার হজুরে।
পুস্তকে তাকিব হইয়া নিবে সবে সিরে॥
তহকিক করিয়া সবে সিরে নিবে তাই।
কমি বেসি কর যদি আল্লার দোহাই॥
হাদিছে ত লেখা আছে শুনহো মমিন।
... ...
... ...
করিনু সাইরি পুতি (পুথি) বড়ই মুস্কিলে।
ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিনা সংসারে॥
বাঙ্গালা জবানে নীএী পুতি (পুথি) এমামের।
তাহাতে করিনু সেকি (?) কর বরাবর॥
বারসোএ পচাৰ্ত্তর মঞ্জিলের পরে দিন।
তামাম হইল পুতি জানিবে মমিন॥

ইমাম হুছনের পুথি হোইল তামাম।
গোমানিন (?) হৈল রচিলো কবি জানিবে এহলাম॥
গোলামি করেন ভাবি নবির পদসার।
আল্লা মহাম্মদ বিনে গতি নাহি আর॥
ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাপ্তন।
আল্লা আল্লা বোল ভাই 'দিনের' মোসলমান॥
তোমার কদমে ছালাম জতো কিছু তার।
বনিজ মামুদ নাম জানিবে আমার॥
রাকর (আখর) বেশি কমি হৈলে না ধরিবা আর।
গুণা খাতা মাফ করি লইবা আমার॥
পুতি সমাপ্তন হৈল (রোজ) মঙ্গলবার।
সন ১২৭৫ সাল তাং ৩৯ (?) বৈশাখ মাস জানিবা॥

"জিঃদার বনীজ মহাম্মদ সাং গোপাল রায়। জথা দিশ্‌টং তথা লিখিতং। লিখিকো দোসক নাস্তি। ইস্তক সন ১২৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ সন ১২০৫ সালের বৈশাখ। তারিখ ৩৯ (?) বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার। মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হইল। বেলা আছর সমে। আমলদারি কাকিনা শ্রীজুত সেড়ুকুল্যা বাটী তালুক গোপাল রাএ চ্যকোলে কাকিনা হস্ত রক্কর শ্রীজুত রাজে মহম্মদ। বসত মোকাম বাণীনগর বাটী জানিবা। আর অধিক কি লিখিব আমি গুণাগার। আমার পুতির সঙ্গে দুইশত সাত পাত জানিবা।"

পুস্তকখানি বড় এবং দুই পৃষ্ঠায় লেখা। হস্তাক্ষর ও পুস্তকের তুলট কাগজের অবস্থা দেখিয়া অনেকদিনের পুথি মনে হয়। লেখকের ভাষাজ্ঞান আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। নকলের দোষেও এমন বিকৃত হইতে পারে। পুস্তকে যে রাজে মহম্মদের নাম আছে, তাহার বিষয় অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই বাণীনগর,—কাকিনা হইতে দুই মাইল উত্তরে—ষ্টেসনের সন্নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে সেখানে একটি ঐ নামের অশীতিপর বৃদ্ধ আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু বলিতে পারিল না। গ্রন্থোল্লিখিত রাজে মহম্মদ সে নিজে নহে, তাহাও বলিল। তবে তাহার কাছে দুইজন ঐ নামের ঐ স্থানের লোকের কথা শুনিলাম। ইহাদের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানিত না। অপর রাজে মহম্মদই ইহার নকলনবিস কিনা তাহা সে বলিতে পারিল না। তবে সে লেখাপড়া জানিত, এ কথা সে বলিল। সুতরাং এ রহস্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কবি বনিজ মামুদ সম্বন্ধেও জানিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে বলিল, আমি গোপালরায় ঐ নামের কোন লোক ছিল বলিয়া জানি না। (এই) গোপাল রায় বাণীনগরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত।' *

* পরে মুন্সী সাহেব আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—"তাহার স্ত্রী ও দুইপুত্র এখন কাকিনার অধিবাসী; কিন্তু তাহারা পিতৃগুণের অধিকারী হইতে পারে নাই। দীনভাবে আমাদের খানিকটা জমি জমা লইয়া

৫০১। গোসানী-মঙ্গল

"গোসানী-মঙ্গল + অর্থাৎ রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত ;—কোচবিহার বা এতৎ প্রদেশের আদি কাব্য। ৺রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত। ইহা ঠিক্ কোন্ সময়ে রচিত, তাহা বলা যায় না।

আমাদের কাছে ১৩০৬ সালের মুদ্রিত, কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ৺কৃষ্ণ বিহারী সেন্ এম্ এ মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে গোসানী-মারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তক আছে। এখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ। সম্প্রতি আর একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছি। উহা কোচবিহারের অন্তর্গত বড় মরিচা নিবাসী মৌলবী আমানত উল্লা চৌধুরী জমিদার সাহেবের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা এখনও দুইখানি পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। ... ... তবে উক্ত আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি, মুদ্রিত পুস্তক খানির সহিত স্থানে স্থানে পাঠের অমিল আছে। ... ... যাহা হউক, সে পুস্তকখানি সম্বন্ধে শীঘ্রই আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিব। শেষোক্ত পুস্তকখানি একটি হিন্দু বৈরাগীর কাছে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শুনা যায় সে লোকটি প্রত্যহ পুথিখানির পূজা করিত।

কবিবর ৺রাধাকৃষ্ণ দাসের পিতা ৺করুণাকর দাস কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেন। কবি "মঙ্গলাচরণে' গাহিয়াছেন :—

হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর,
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্ত ভেক,
চিন্তে হরি-চরণ-কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল॥

গোসানী-মারিতে কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। কবি যে গোসানী দেবীর একজন পরম ভক্ত, তাহা তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বসিত সুললিত কাব্য হইতেই বেশ অনুমিত হয়।

আছে। লেখকের স্ত্রীর মুখে শুনিলাম,—প্রৌঢ় বয়সে বনিজ মামুদের মৃত্যু হয়। লোকটা মুন্সীগোছের ছিল। বলা বাহুল্য, প্রত্যোল্লিখিত গোপাল রায়েই তাহার বাড়ী ছিল।"

+ 'গোসানী' কি 'গোস্বামিনী' শব্দ-জাত ?

গ্রন্থখানি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সরল, স্বাভাবিক, পরিস্ফুট। গ্রন্থারম্ভে কবি বলিতেছেন :—

বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী।
সেই গ্রামে জামবৃক্ষ আছে সারি সারি॥
সুবর্ণ বরণ জাম ফলে বারমাস।
শ্রীফল-বেলাদি তথা চির পরবাস॥
পার্ব্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে।
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে॥
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন॥
সুবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিব দুর্গা পূজে কুতূহলে॥
চণ্ডী কহে বর দাও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হ'ক্ নাম কান্তেশ্বর॥

কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর ; মাতার নাম অঞ্জনা। অঞ্জনা—

তন্ত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ।
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন॥
স্বামী-মুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ॥

তারপর চণ্ডী আসিয়া দম্পতীকে স্বপ্ন দেখাইলেন :—

শুন শুন ভক্তীশ্বর, শুনহ অঞ্জনা।
তোমাদের হতে প্রিয় নাহি কোন জনা॥
করহ আমার পূজা লহ ইষ্ট বর।
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
সত্য করি কহি ব্যর্থ না হবে বচন।
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন॥
রাখিবা পুত্রের তুমি কান্তনাথ নাম।
একথা কহিয়া চণ্ডী হ'ল অন্তর্দ্ধান॥

এ চণ্ডী-পূজার ফলে অঞ্জনার গর্ভে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর কান্তেশ্বর—

অল্পকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥

ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত ॥

সুতরাং এমন রাজা ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মানুরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ইনিই গোসানী সংস্থাপন করেন। কবি বলেন :—

সসৈন্যে সাজিয়া রাজা করিল গমন।
চণ্ডীমণ্ডপেতে আসি দিল দরশন ॥
পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান।
সিংহ-পৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আসন ॥

গোসানীর 'আসন' দেওয়া শেষ হইলে, ভক্ত রাজা লক্ষ বলির আদেশ দিলেন। মহাসমারোহে সমুদায় কার্য্য শেষ হইল।

এই দেবীর সেবাইতদিগকে 'দেউরী' বলে। পুস্তকের শেষে কবি বলিতেছেন :—

গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায়।
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায় ॥
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ।
হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ ॥
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস।
অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ ॥
নির্ব্বংশ হইবে সে গোসানীর কোপে।
দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে ॥
পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস।
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস ॥
গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা।
নৌকার বিহনে যাও সাগরে বান্ধি ভেলা ॥
গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অনুপম।
স্মরণ লইলে তার সিদ্ধি হয় কাম ॥
গোসানী আদেশে ভাই ভজ হরি পায়।
গোসানী-মঙ্গল গীত রাধাকৃষ্ণ গায় ॥

মুদ্রিত পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজি ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।"

৫০২। আমছেপারার অনুবাদ

"সম্প্রতি আমি একখানি অতি প্রাচীন পাথরে ছাপা আরবী ও হস্তাক্ষরের মত বাঙ্গালা

ছাপা "আমছেপারার" * কবিতার অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজি সাইজের ৬৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু অগ্রপশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ নাই। গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান্। আমি জানি না, এ গ্রন্থ কোন্ অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত! একই প্রেসে,—বাঙ্গালা ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া, প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র। প্রত্যেক "আয়েতের" পৃথক্ অনুবাদ আছে। গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন, তাহা সুনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎ প্রদেশ-প্রচলিত অনেক শব্দ আছে। আমি শীঘ্রই এ গ্রন্থখানি "ইস্লাম-প্রচারকে" অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

গ্রন্থারম্ভে—

ছরু (সুরু ?) এই কেতাবের নামেতে আল্লার।
দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার ॥
সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার।
পালোনেওয়ালা সেই সারা সংসার ॥

শেষ :—

আর যতো কাফের কহে তাহারা সবে।
হায় হায় মাটি হৈতাম হৈতো ভালো তবে ॥
কঃ (?) মাটী রৈলে হেছাব কেতাব নাহি দিতে হোতো।
আজ এতো দুস্কু তবে নাহি মিলিতো ॥

গ্রন্থের ছাপা বেশ পড়া যায়। আমার বিশ্বাস, এদেশে বাঙ্গালা টাইপ প্রচলনের পূর্ব্বে এ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল।"

৫০৩। হংস-বিলাস পাঁচালী

"১৭৮৭ শকাব্দে মুদ্রিত। একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৬।

আরম্ভ :—

শ্রীদুর্গে জয় দুর্গে মম ভাগ্যে সদয় দুর্গে হয় (হও) শিবকর্ত্রী।
তুমি জগৎতারা কালসংহরা পরাৎপরা ত্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজ(গ)ৎ কর্ত্রি ॥

(ছড়া)

দীর্ঘ দীঘি সরোবর, যেন নিধি রত্নাকর
মনোহর পদ্ম সুশোভয়।
কি কব দীঘির শোভা, মুনিজন মনোলোভা
হইলে ভানুর প্রভা প্রভাত সময় ॥

কবির পরিচয় :—

* কোরাণ সরিফের অংশবিশেষের নাম 'আমছেপারা'।

ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি,　　বিরচিল কাব্য কবি,
রবিসুতে হইল নিস্তার।
চংখুরাণী গ্রাম ধাম,　　অনুজ ভজহরি নাম,
গিরিধারী মাতুল পরিবার ॥

শেষ :—

ঈশ্বর চন্দ্র বলে কলি তুমি বাহাদুর।
ঠাকুর গেলেন কচু বনে সিংহাসনে বসিল কুকুর ॥

এ চংখুরাণী গ্রাম কোথায়, জানেন কি ? … … … এ গ্রন্থকার অবশ্য রংপুরের লোক নহেন।"

পূর্ব্বালোচিত 'ইমাম-সাগর' 'গোসানী-মঙ্গল' 'আমছেপারার অনুবাদ' ও 'হংস-বিলাস পাঁচালী' এই চারিখানি পুথির বিবরণ রঙ্গপুর—কাকিনানিবাসী বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেবের লিখিত পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। তিনিও পরিষদের একজন সদস্য ও পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পুথিগুলি তাঁহারই হাতে আছে।

৫০৪। নামহীন পুথি

কেবল ১ম পাত আছে। তদ্দ্বারা এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কাগজ একবারে পচিয়া গিয়াছে।

আরম্ভ :—　　৵৭ নমো গনেসায়।

বেদে রামায়ণে—ইত্যাদি শ্লোক।
কলির মোচন জদি কৈলা নারাঅন।
করজোরে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডুর নন্দন ॥
সুন সুন নারাঅন প্রভু গুণনিধি।
কলিজুগ অবতারে কৈলা কোন বিধি ॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
কহ কহ নারাঅন কৃষ্ণ মোহাশএ ॥
কিরূপে হইব ছিষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন কার্য্য কেমত আচার ॥
নৃপতি সকলে কোন ধর্ম্ম আচরিব।
প্রীথিবিতে প্রজাগণ কেমতে থাকিব ॥

৫০৫। যদুনাথ-বারমাস

অথ জদুনাথ বারমাস।
জদুনাথ সুন নিবেদন।

তেজিৰ্ম বসতি আশা তোমার কা(র)ণ ॥
বৈসাখে বহে বাও মলআ সহিত।
জগনাথ বিনে মোর স্থির নই চিত ॥
নানা রিত নাট করে বৈসি বৃন্দাবনে।
বিতোল (বিভোল ?) হইম মুই রতিপতি বিনে ॥

শেষ :— চৌত্র চাতকি পক্ষি ডাকি পীআ পীআ।
সর্ব্বক্ষন স্থির নহে আমার জে জিউ ॥

ভণিতা :— বারমাসের তের খোসা লওরে গণিআ।
এই গিত জোরাই আছে শ্রীধর বাণীআ ॥

তারিখাদি নাই। সম্ভবতঃ ১২৩২।৩৩ মঘীর লেখা। অতি কদর্য্য হস্তাক্ষর। পদ-সংখ্যা—প্রায় ২৪।

৫০৬। জয়নবের চৌতিশা

বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাসনের স্ত্রী। তাঁহাকে লইয়া পাপমতি এজিদের নিষ্ঠুর অন্তঃকরণে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে আগুনে হজরত ইমাম হাসন ভস্মীভূত হয়েন,—সমস্ত নবী-বংশ ছারখার হইয়া যায়! সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না! সুতরাং আমরা পুথিখানি লইয়াই দুটি কথা বলি।

ইহা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র;—পদ-সংখ্যা ৬৮। কাগজ একবারে তাম্রকূটপত্র আর কি! তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই। ভণিতারও অভাব। পত্রসংখ্যা ৬; দুই পিঠে লিখিত।

আরম্ভ :— ।৭ কান্দে বিবি জএনবে জে হাছনের শোকে।
কালিনী সমুদ্র মাজে ডুবাইলা মোকে ॥
কুকিলা কুহরে জেন বসন্ত সমএ।
কুলিস আক্ষির জলে ধারারূপে বহে ॥
খীন হৈল তনু মোর বিচ্ছেদে তোমার।
খেমাই রাখিতে চিত্ত ন পারিএ আর ॥
খোদাএ করিল মোরে এথ বিরম্বন।
খাইলা দারুণ বিস আমার কারণ ॥

শেষ :— ক্ষেলিলুম নানান খেইল হাছনের সনে।
ক্ষেণে ক্ষেণে সেই কথা উঠে মোর মনে ॥
ক্ষিণ হৈল তনু মোর বসন মলিন।
ক্ষেতিত পাপিষ্ঠ জীউ রহে কথ দিন ॥

ইতি জএনবের চৌতিসা সমাপ্তঃ ॥

৫০৭। যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ

এই নামের আর একখানি পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৪শ পুথি দ্রষ্টব্য।) তাহার সঙ্গে অদ্যকার পুথিখানির কিছুমাত্র ঐক্য দেখা যাইতেছে না। ইহার কেবল ১ম ও ১১শ পাতাটি পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

৴৭ শ্রীদুর্গা। নারায়ণ নমস্কৃতং ইত্যাদি।

শ্রীজুধিষ্ঠির স্বর্গআরহন লেক্ষন।
জর্ম্মজএ জিজ্ঞাসিলা ব্যাসের গোচর।
পুর্ব্ব পুরুস কথা কহ মুনিবর॥
আহ্মার প্রপিতামোহ ধর্ম্ম নরপতি।
রাজ্য ত্যাগিআ কেনে গেলে স্বর্গপতি॥
এহি রাজ্য হোতে হৈল গোত্রের বিনাস।
এই রাজ্য পাইতে করিল হাবিলাস॥
তাহান সারথি আছিল নারায়ণ।
তবে কেন রাজ্যত্যাগি গেল মোহোজন॥
প্রসন্ন বদনে মোয়ে কহ মুনিবর।
এহি কথা কহো মুনি আহ্মার গোচর॥ ইত্যাদি।

৫০৮। নামহীন পুথি

ইহার কেবল নাম নাই এমন নহে, ১ম ও দ্বিতীয় পাত ভিন্ন অপর পত্রগুলিও নাই। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তারিখাদিও জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ ও প্রাচীন। কি একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ হইবে। পুথিখানি আকারে নিতান্ত ছোট ছিল, বোধ হয় না। প্রাপ্তাংশ হইতে কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় পুথির অস্তিত্ব-চিহ্ন রাখিলাম; যথা :—

৴৭শ্রীদুগা। নমো গনেসাঅ।

প্রমম (প্রথম ?) বন্দম গুরু বৈষ্ণবচরণ।
জাহার প্রসাদে হৈল বাঞ্চিত পুরন॥
... ... করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে ভুমি ? করিব প্রচার॥
সিরে বৈস সরস্বতি কণ্ঠে দেও পাও।
জির্ব্বা ... ... কর সরস্বতি মাও॥

এহোলোকে জেই চাহি সেই মোরে দিবা।
অন্তকালে প্রাণি জাইতে রামনাম (বোলাইবা ?) ॥
শ্রীগুরুচরণ বন্দম্ মনে করি সার।
তাহান চরণে মোর কটি (কোটী) নমস্কার ॥
সভা করি বসি আছে রাজা কংস (রায় ?)।
অক্রোর মুনিরে রাজা সাক্ষাতে আনাএ।
রাজা বোলে জাও মুনি গকুল নগরে।
জর্ম্মিআছে কৃষ্ণ বলাই নন্দ ঘোসের ঘরে ॥
কৃষ্ণ বলাই দুই শিশু আনি দেও মোরে।
আজ্ঞা ... ... সে জাও গকুল নগরে ॥ ইত্যাদি।

৫০৯। পত্র লিখিবার ধারা

আরম্ভ :—অথ পত্র লীখীবার ধারা।

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিআ মস্তকে।
পাতির নিঅম কিছু কহিব সংক্ষেপে ॥
পিতার চরনে করি অসংখ্য প্রনতি।
একান্ত সেবক বলি লিখীবেক পাতি ॥

শেষ :— সমানে ২ লীখে স্বন্দিআ বলিআ।
সমভাবে লিখে তাহাকে নমস্কার করিআ ॥
কিঞ্চিত কহিল এই সংক্ষেপে অক্ষরে।
সর্ব্বত্র লিখীবে পত্র এই অনুসারে ॥

"ইতি সন ১২৫৫ বাঙ্গলা তারিখ ১৫ আশীন।" পদ-সংখ্যা—৪২ মাত্র। ভণিতা নাই।

৫১০। নীলার বারমাস

এই নামের আর একখানি বারমাসের প'রিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৮৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) মিলাইয়া দেখিলাম, দুইখানি এক নহে।

আরম্ভ :—অথ নিলার বারমাস। নম গনেসায়।

কাত্তিক মাসেত নিলা নিসিস্বর রাত্রি।
আজি নিসি পরবাশী দেখিবম জুবতি ॥
লওয়ে কর্প্র্র তাম্বুল দোসের পীরিতি।
ছারে কপট মায়া মুই মাগম জুরতি (সুরতি ?) ॥
ওরে সাধু ওরে কুমার মুই বলম্ তোমারে।
ধর্ম্ম চাহিতে গুনা খেমা করহ জে মোরে ॥

আর জদি কিছু বলম্ জনামু আউলানী।
লর্জা পাইবা সাউধের কুমার হারাইবা জে প্রাণি ॥

শেষ :— আশ্বীন মাসেত নিলা দুর্গা থাএ-খানা।
বুজিলং নিলা তোর সন্তিবানা (সতীপনা) ॥

…　　…　　…　　…

হাতে লৈল চুআ চন্দন মাথে দিল তৈল।
হেলিতে ঢলিতে কন্যা বাপের বারিত্ গেল্ ॥
কি করহ বিদ্দ (বৃদ্ধ) মা বাপ কি কর বসিআ।
কার খাইলা পানগুআ কারে দিলা বিহা ॥

…　　…　　…　　…

হাতে লৈল গুআ লাটী কান্দে লৈল ছাতি।
খিরেং জাএ বুরা জামাই চাইত বলি ॥
কোথাএ ছিল মাও বাপ কোথা ছিল ঘর।
কি নাম জে মাও বাপ কি নাম তোর ॥
ডাকাপুরে বারি মোর কৈলাশপুরে ঘর।
মাও মোর কলাবতি বাপ বিদ্যাধর ॥
বুজিলামং নিলা তোর নিজপতি।
আউলাই মাথার কেশ করহ বশতি ॥

ভণিতা :— বার মাসের তের ঘোশা (ল)ওরে গণিআ।
এই গীত জোরাই আছে শ্রীধর বানীআ ॥

"সমাপ্ত। ইতি ১২৩২ মং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার। লিখক শ্রীঅভআ চরণ শেন।"
পদ-সংখ্যা--৪৫।

৫১১। ফাতেমার ছুরৎনামা

পূর্ব্বে ৮৭ সংখ্যক পুথিতে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। ইহাও ঠিক সেই পুথি হইলেও ভণিতায় পার্থক্য দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বের পুথিতে সাহা বদিয়ুদ্দিনের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; আর আজ পাওয়া যাইতেছে শের-তনু নামা কবির। এ রহস্ত গাঢ় তমিস্রাবৃত ;— উদঘাটন সুকঠিন। এক পুথি হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পাঠ পার্থক্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্নে একটু একটু দেখুন :—

আরম্ভ :— বিচ্‌মিল্লাহের রহমানিররহিম।
প্রথমে আল্লার নাম করিএ স্মরণ।
রছুল চরণে মুই মাগি নিবেদন ॥

শুন নর সব আহ্মি এক কথা বুলি।
জেন ফাতেমার রূপ দেখিলেন্ত আলি॥
এক দিন আলি গেল বক্করের ঘর।
দরজাতে জাই আলি ডাকে উশ্চস্বর॥ ইত্যাদি

ভণিতা :—

কিতাবে সুনিআ গাথা রচিল তমুল্লা কথা
কথ পথ করিলুম রচন।

শেষ :—

ছুরৎ দেখিআ আলি সন্তোষ হইলা।
আল্লার নামে দুই রকাত নমাজ পড়িলা॥
হীন শের তমু এ কহে ভাবে করতার।
সুনিআ এ সব কথা কিতাব মাজার॥
কিতাবে এই কথা কর্ণে সুনিআ।
আল্লাকে স্বরিয়া কিছু রাখিছে লেখিয়া॥
গুণিগণ পদে আহ্মি করি নিবেদন।
জদি দোস হই থাকে খেমব সর্ব জন॥
অশুদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা।
গরিব দেখিতে দোস সমুখে খেমিবা॥

"এই ত বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত। ইতিন সন—১২০৩ মঘি তারিখ ১৯ বৈশাখ রোজ যুক্রবার। লেখীতং শ্রীমাহাং আলি সাকিমে খড়না। এই পুস্তক মালিক শ্রীমহিজল্লা পীছরে দেবান আলি সাং মাহাদাবাদ।" পত্রসংখ্যা ১৪; দুই পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ,—ক্ষুদ্র আকার।

৫১২। মান-গান

ইহার আদ্যন্ত কিছুই ঠিক করা যায় না। দূতী-সংবাদের ও মানভঞ্জনের গান বলিয়া বোধ হয়। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও ফলে তাহাই হইয়া গিয়াছে। একরূপ নষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে। ২।১ পাত উদ্ধার করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। ইহাতে ছড়া, কথা ও গান আছে। প্রাপ্ত ১ম পত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ও মধ্যস্থল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ২য় পত্র হইতে :—

ঠাকুরের কথা।
চন্দ্রাবলি আর থাকিতে পারি নাহে।
ঠাকুর এখন জাও কি থাক : তোমার দিয়ে
কোন প্রিয় (প্রয়ো) জন নাই হে। সে কেমন মুন
বলি :। গান তাল আর খেমটা।

জাও হে জেথায় আছে প্রিয়জন : আর তো
নাই প্রিয়জন : জে জন তোমার প্রিয়জন : হও
গো জাইএ তার প্রিয়জন : জখন চিন প্রিয়
জন : তখনে ছিল প্রিয়জন : আর এখন কি
প্রিয়জন : নতনে নতন প্রিয়জন ॥ ১৯ ।

মধ্যস্থলে :—গান, তাল ঠেকা।

রাধে ২ বল বিনে প্রবল বিনে :
রাধে আমার ধ্যান জ্ঞান রাধে বিনে জানিনে :
জে ছিল মোর প্রেমে বান্ধা সে প্রেমে পৈরাছে বাধা :
জার তরে বৈই নন্দার বাধা আমি মরি সেই রাধা বিনে ॥

শেষ :—গান, মিলন।

স্তাম রঙ্গে হিলন দিয়ে ধ্বনি দাড়াইল রে :
লইয়ে প্যারি বাকা হৈয়ে দাড়াইল রে :
আপনার বন্দুয়া রৈলে ধনি দাড়াইল :
সাম চান্দে রাই চান্দে চান্দেয়া গণিল : *
দুই চান্দে একই হৈএ চান্দেরে ঘিরিল ॥ ৪৬ ।
সামের বামে রাই দাড়াইল : একবার বদন তৈড়ে হরি বল ॥ ৪৭ ।

"ইতি মানগান সংপুর্ন হৈল। ইতি সন ১২৭০ সাল রোজ সুক্কর বার বেইল ৩ তিন প্রহর সময়ে হস্তয়ক্কর শ্রীগোবিন্দ দাস বৈরাগি ॥"

পত্রসংখ্যা—৮ ; দুই পিঠে লেখা। এই আটপাতের পর "দুতীর সহিত ঠাকুরের কথা" লিখিত আছে। উহার ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। সেই অংশ পশ্চাৎ সমালোচিতব্য।

এই পুথিখানি রঙ্গপুর কাকিনা হইতে বন্ধুবর মুন্সী সেখ ফজলল করিম সাহেব সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৩। ভানুমতীর বিবাহ

তত ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রন্থ নহে। রয়েল ফরমের কাগজ। দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৭।

আরম্ভ :—　　　　শ্রীজয় দুর্গাপদ শ্রীদুর্গা ভরসা।

অথ ভানুমতীর বিবাহ লীখতে।

/৭ নম গণেসায়ঃ সরিস্বতী নমঃ ত্রিপদী :

প্রনমামি গণদেব :　　　　বাসুদেব মহাদেব :

সুর্জ্যদেব দেব রবন্দীনি :

---

* অথবা 'চান্দে রাগাগিল' হয় কি ?

সষ্টীদেব অগ্রভব : রমাধব উমাধব :
ছায়া সঙ্গাধব বিধবণী : ইত্যাদি।

ভণিতা :— আনন্দিত ভানুমতী শুনি দৈববাণী।
বিরচিত গৌরীকান্ত ভরসা ভোবানী ॥

শেষ :— রাজা বোলে ভানুমতি কর উপহাস।
আমার নাহিক দোস সুন কালিদাস ॥
বেজ করি কথ কথা কহিল আমাএ।
ঘিন্না (ঘৃণা) করিলাম আমি তাহার কথাএ ॥
ঘুণ্য ভেসে আসি দেখা দিল দুই জনে।
কুজা মাআ আমি বুজিব কেমনে ॥
এইরূপ কথোপকথন দুই জনে।
বিরচিএ গৌরীকান্তে ভনে ॥

"ইতি ১৮৫২ ইং তাং ১৯ সেপ্তাম্বর মতাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ রবিবার অযুদ্ধ হইলে পদ যুদ্ধ করি দিবা। মুই অধমেরে এবং মুর্খরে মন্দ নহি বলিবা। সুজনের পুত্র তোমারা পণ্ডিত সুজন। এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরাম কুমার সেন॥ সাং কুত্রপারা॥ সমাপ্ত হইল॥"

এই পুথিখানি চট্টগ্রাম খরন্দীপ মধ্য ইংরেজী স্কুলের হেডপণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৪। হরিশ মঙ্গল-চণ্ডী-পাঁচালী

ইহা একখানি চণ্ডীকাব্য। মলাটে উক্ত নাম লেখা আছে। ক্ষুদ্র পুথি। অতি প্রাচীন ও জীর্ণ তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা ২৩; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ :—নম গণেসায়ঃ নম। নম শ্রীগুরুবে নম নম চণ্ডিকায়ৈ নম। নারায়ণ নমস্কৃত্যং ইত্যাদি শ্লোক।

বন্দোম শ্রীগুরুনাথ : জোড় করি দুই হাত :
অষ্টাঙ্গিতে হৈয়া ভুমিগত।
প্রণমহো লক্ষীপতি : গড়ুর পৃষ্টেতে স্থিতি :
স্বরনে পাতক হএ হত ॥
... ...
মঙ্গলচণ্ডিকা পাএ : দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে কএ :
দয়া কর জগত জননি।
স্লোক ত্যজি পদবন্দ : রচিলেক খর্পছন্দ :
রচে পিত ভাবিয়া ভবানি ॥

(প্রস্তাবারম্ভ।)—পঠ মঙ্গলি.রাগ।

শুন সর্ব্বজন :		কহি বিবরণ :
পৃথিবিতে স্থান খানি।
উজানি নগর :		জানে সর্ব্ব নর :
ইন্দ্রের অমরা জিনি॥ ইত্যাদি।

শেষ ও ভণিতা :—	ধনপতি সাধু গিয়া খুলনারে কএ।
তোমার ব্রতের ঘঠ দেখাও আমাএ॥
সাধুর বচনে ঘঠ দেখাইল যুবতি।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল সাধু ধনপতি॥
নানা বিধি প্রকারেতে পুজিল চণ্ডিকে।
ধন বসে ধনপতি রহিল কৌতুকে॥
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে ভনে চণ্ডির চরণ।
মঙ্গলচণ্ডির গীত কৈল শমার্পন॥

"ইতি শন ১২৩৩ সন তারীখ ২৯ জৈষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা ছএ দণ্ড থাকিতে ছপারিয়া ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল॥ : : ॥ : :"

এই পুঁথিখানি কলিকাতা—কড়েয়া নিবাসী ও 'নবনূর' পত্রের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুন্সী আসাদ আলিসাহেব তদীয় জনৈক বন্ধু হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫১৫। নামহীন পুথি

(ক্রিয়া-যোগসার ?)

ইহা ঠিক 'ক্রিয়া-যোগসার' কিনা, বলিতে পারি না, আরম্ভে উক্ত গ্রন্থের সহিত বিশেষ মিল দেখিতেছি না। ৩৫শ পত্র পর্য্যন্ত মাধব ও সুলোচনার কাহিনী শুনিতেছি। মাধবের বিবাহ-বাসর হইতে প্রচেষ্টা নামক কোন সেবক সুলোচনাকে হরিয়া নিয়াছিল; মাধব নানা কৌশলে সুলোচনাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; উক্ত পত্রগুলিতে এইরূপ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। তার পরে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই 'ক্রিয়া-যোগসার' গ্রন্থের অন্ততঃ অংশবিশেষ। আমরা আজও 'ক্রিয়া-যোগ সার' পাঠ করিতে অবসর পাই নাই; তাই জিজ্ঞাসা করি, সুলোচনার হরণ বৃত্তান্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পুথির হস্তাক্ষর প্রভৃতির অভিন্নতা-হেতু দুই পুথিকে এক মনে করিয়া আমরা নিশ্চই প্রতারিত হইয়াছি।

অনন্তরাম দত্ত ইহার প্রণেতা। 'বিশারদ' অভিধেয় কোন মহাজনের আদেশে অনন্তরাম তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে কথা এখন সকলেই জানেন। কবির যে বিস্তারিত 'আত্ম-পরিচয়' পূর্ব্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, এই খণ্ডিত পুথিতে তাহা পাইলাম না।

পুথিখানা অসম্পূর্ণ। যাহা আছে, তাহার সবটাও উদ্ধারের আশা নাই। কালী উঠিয়া যাওয়ায় অনেক স্থানেই এই চর্ম্ম-চক্ষুঃ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হস্তাক্ষরও নিতান্ত কদর্য্য। কেবল ১, ৩, ২৩—৩৫, ৪৯—৫৯ এবং ৭৪, ৭৬ সংখ্যক পত্রগুলি আছে। তারিখাদি নাই। শ্রীরামপ্রসাদ দাস দাস, শ্রীরামচন্দ্র আউচ দাস, শ্রীরাজারাম সেন দাস, শ্রীবল্লভরাম দেবশর্ম্মা ও শ্রীরামবল্লভ চক্রবর্ত্তী এই পুথির নকলনবিস। খুব প্রাচীন, বোধ হয়।

আরম্ভ :— নমো গনেসায়ঃ। নম সরস্বতি নম।
নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি।
প্রনমোহ নারায়ন অনাদি নিধন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাহার স্বজন॥
তদন্তরে প্রনমোহ … … ।
আদ্যাশক্তি মোহামায়া জগত জননি॥
ত্রিনয়ন প্রনমোহ ত্রিজগত কর্ত্তা।
… … ভক্তি মুক্তি দাতা॥

ভণিতা :—

(১) কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ সুতে,
হরি পদে গতি তার মন। (২৩শ পত্র।)

(২) কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ সুতে,
হরি পদে ভজি রৌক মন। (৩০শ পত্র।)

(৩) সত্যবতি সুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার।
স্লোক বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার॥
সেই স্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
কহিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে॥
বিসারদ পদে সেহ রেণু অবিপাএ।
পদবন্দে রচিলেক সপ্তম অধ্যাএ॥ (৫১ পত্র।)

(৪) ঐ ঐ ঐ
পদবন্দে … … অষ্টম অধ্যাএ॥ (৫৯ পত্র।)

(৫) ঐ ঐ ঐ
পদবন্দে … … একাদস অধ্যাএ॥ (৭৬ পত্র।)

আমার নিকট 'ক্রিয়াযোগ-সার' যে পুথি আছে, তাহা তত বৃহৎ নহে। উহা কিন্তু অতি বৃহৎ বলিয়াই আমি শুনিয়াছি। সেরূপ একখানা পুথির সমাচারও আমি জানি; কিন্তু সুযোগাভাবে তাহা আজও দেখিয়া আসিতে পারি নাই।

এই প্রবন্ধোক্ত ৫০৪—৫১৫ সংখ্যক পর্য্যন্ত পুথিগুলি আমার নিকট আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীআবদুল করিম

বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব

ও

বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে দুইটি চির-স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা উত্তর কালে সমগ্র সভ্যজগতের ঐতিহাসিক স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়টি ভাস্কো ডি গামা কর্ত্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপের পথ দিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আগমন। সে সময়ে ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম পর্ত্তুগাল রাজ্য নৌ-বিদ্যায় ও নৌবীর্য্যে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, কলম্বস্ ভারত-যাত্রার নূতন পথ আবিষ্করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বপ্রথমে পর্ত্তুগালরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোনও কারণবশতঃ তথায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পরিশেষে স্পেন রাজ্যের সহায়তায় ভারত-গমনের উপক্রম করিয়া ভাগ্যক্রমে নূতন পৃথিবীর আবিষ্কার করেন। এই ঘটনায় পর্ত্তুগাল-রাজ ইমানিউয়েল্ যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া পাঁচ বৎসর পরে বীরপ্রবর ভাস্কো-ডি-গামাকে ভারতযাত্রার নূতন পথ নির্দ্ধারণে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর পরে যখন ভাস্কো সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন লিসবন নগরীতে আনন্দ ও উৎসবের সীমা রহিল না। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির সহিত এতকাল ধরিয়া নানাবিঘ্নসঙ্কুল স্থলপথে বাণিজ্য চালাইয়া বিনিস নগরী যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই বাণিজ্যলক্ষ্মী এখন অপেক্ষাকৃত সুগম সমুদ্রপথে লিসবন নগরীতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। ফলতঃ কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্ত্তুগীজভারতের সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি আল্‌ফন্‌সো আলবুকার্কের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়-গুণে পর্ত্তুগীজ আধিপত্য একদিকে পারস্যোপসাগরবর্ত্তী অর্মজ দ্বীপে ও অপর দিকে মালাক্কা উপদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়েই গোয়া নগরীর অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয় এবং উহা অচিরাৎ এসিয়াখণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ পর্য্যটক র‍্যালফ্ ফিচ্ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ার উপবনভূয়িষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন বাণিজ্যের জন্য লিসবন হইতে পাঁচ ছয় খানি বড় বড় জাহাজ প্রতি-বৎসর গোয়ায় আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক—জন ফ্রায়ার গোয়ার প্রস্তরনির্ম্মিত সুবিশাল দেবমন্দির ও উপবনশোভিত সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি দেখিয়া উহাকে রোমনগরীর সমকক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আলবুকার্ক শৌর্য্যে "পর্ত্তুগীজ মার্স" (Portugese Mars) "অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ রণদেব" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়ানুগত শাসনগুণে তদীয় ভারতবাসী প্রজাগণও তাঁহার প্রতি এত

অনুরক্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুতে তাহারা তাঁহার স্বদেশবাসিগণের সহিত সমভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিল এবং যখন তাহারা পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের নৃশংস অত্যাচারে ব্যথিত হইত, তখন তাহারা আক্ষেপ সহকারে আলবুকার্কের মহানুভবতা ও ন্যায়পরতা কীর্ত্তন করিত। বস্তুতঃ আলবুকার্কের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পর্ত্তুগীজ সৌভাগ্য-রবি জন্মের মত অস্তমিত হইল। যে সকল কারণে পর্ত্তুগীজদিগের অধঃপতন ক্রমশঃ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ডাক্তার ফ্রায়ারের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ের পূর্ব্বেই ঐ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তিনি গোয়া-নগরীর বিস্তীর্ণ রাজপথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্মগুলি যেরূপ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিল, গোয়াবাসী সম্ভ্রান্ত পর্ত্তুগীজদিগের প্রাসাদের ছাদগুলি সেরূপ পরিষ্কৃত ছিল না, কারণ তথায় তাঁহারা মলমূত্রত্যাগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু তখনও তাঁহাদের গর্ব্বের ও বাহ্য জাঁকজমকের অভাব ছিল না। সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই বহুসংখ্যক কাফ্রী ক্রীতদাস রাখিয়া নিজের প্রাধান্য প্রচার করিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। পাছে মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, এই ভয়ে সকলেই অনাবৃত মস্তকে রাজপথে বিচরণ করিতেন; দাসবর্গ নিজ নিজ প্রভুর মস্তকোপরি ছাতা ধরিয়া চলিত। অধিকাংশ ভদ্রলোক পাল্কী চড়িয়া—কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে—নগর ভ্রমণ করিতেন। কেহ কোন ভদ্রলোককে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অবহেলা করিলে তদ্দণ্ডেই দণ্ডিত হইত। অত্যুচ্চ বাতায়ন ও প্রশস্ত বারান্দা সৌধসমূহের শোভা সম্পাদন করিত। যদি কেহ কোন বারান্দাধিষ্ঠিতা সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি দৈবাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সাহসী হইত, তাহা হইলে গৃহস্বামী আপনাকে এরূপ অপমানিত বোধ করিতেন যে, ঐ ব্যক্তির রক্তদর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। রমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন এবং বাটীর বাহিরে যাইতে হইলে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন। বাটীর অভ্যন্তরে ধনীদিগের গৃহিণীগণ স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ জপমালায় ও নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিরাজ করিতেন। তাঁহারা বাহুযুগ্মে স্বর্ণনির্ম্মিত কেয়ূর, গলদেশে মুক্তার মালা, কবরীতে হীরকখচিত মাথার কাঁটা এবং কর্ণযুগলে দুল পরিতেন। দেহের অধোভাগ ঘাগরায় আচ্ছাদিত থাকিত; কিন্তু কটিদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান উত্তরীয় পরিচ্ছদ এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্রে নির্ম্মিত হইত যে, উহার ভিতর দিয়া সমস্ত গাত্রের চর্ম্ম দেখা যাইত। বাটীর বাহিরে যাইতে হইলে, উহার উপর একটা জ্যাকেট আঁটা হইত। মোজা পায়ে দেওয়ার প্রথা ছিল না, কেবল এক প্রকার বহুমূল্য চটিজুতা ব্যবহৃত হইত। গোয়ার সীমন্তিনীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে ও বীণা-বাদনে পটু ছিলেন, তদপেক্ষা রন্ধনে ও নানা প্রকার ফলের মোরব্বা ও আচার প্রস্তুতকরণে অধিক দক্ষ ছিলেন। ডাক্তার ফ্রায়ার তাঁহাদের তৈয়ারি আমের আচারের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজ শিশুগণ নগ্নাবস্থায় বাড়ীর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের লজ্জার উদ্রেক না হইত, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বিবস্ত্র থাকিত।

যদিও বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রাদুর্ভাবের যৎকিঞ্চিৎ বিবৃতিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি আমি প্রসঙ্গক্রমে ফ্রায়ার-বর্ণিত গোয়াবাসী পর্ত্তুগীজদিগের বিবরণ এই জন্য উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, বঙ্গীয় পর্ত্তুগীজদিগের সম্বন্ধে সেরূপ চিত্রের অভাবে উক্ত বিবরণ হইতে তদ্বিষয়ের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তবে এই দুইটি কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোয়া রাজধানীতে পর্ত্তুগীজেরা যেরূপ জাঁকজমকে থাকিত, বঙ্গে অবশ্য তাহার অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল এবং গোয়ায় যে অল্পসংখ্যক পর্ত্তুগীজ রমণী বাস করিত, বঙ্গে সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও ন্যূন-সংখ্যক পর্ত্তুগীজ-সীমন্তিনী দৃষ্ট হইত। পর্ত্তুগীজেরা এইজন্য প্রথম হইতেই বহুল পরিমাণে এতদ্দেশীয় কামিনীর সহিত দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এইরূপে স্বল্পকালের মধ্যেই একটি মিশ্র-জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বা পরে পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্ব-প্রথমে বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার করে। তখন ভাগীরথী বা হুগলী নদীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ চালাইবার সুবিধা হইত না বলিয়া ঐ সকল জাহাজ মুচিখোলার নিকট নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থিতি করিত এবং মাল-পত্র ছোট ছোট নৌকায় বোঝাই হইয়া সপ্তগ্রামে প্রেরিত হইত। সপ্তগ্রাম তখন একটি রাজকীয় বন্দর ও প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য-নিবন্ধন ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী শিবপুরের সন্নিহিত বেতড় গ্রামে একটি হাট বসিল। ঐ হাটে যে সকল দেশীয় বণিক্‌দিগের সমাগম হইত, তন্মধ্যে কলিকাতার আদিনিবাসী সুবিখ্যাত শেঠ বসাখেরা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহারা সপ্তগ্রামের ভগ্নদশার উপক্রম দেখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে, যেখানে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা প্রতিষ্ঠিত, তথায় আসিয়া বাস করেন এবং কলিকাতার উত্তরে সুতানুটীর হাট প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় পর্ত্তুগীজদিগের সহিত কিছুকালের জন্য কারবার চালান। কয়েক বৎসর পরে পর্ত্তুগীজেরা যখন বেতড় পরিত্যাগ করিয়া নদী বাহিয়া আরো উত্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল; তখন বেতড়ের সমস্ত বাণিজ্য সুতানুটীতে স্থানান্তরিত হইল এবং ইহাকেই কলিকাতা মহানগরীর ভাবী সৌভাগ্যের পূর্ব্বসূচনা বা সূত্রপাত বলিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গে পর্ত্তুগীজেরা কিয়ৎকাল সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিয়া তাহাদিগের প্রধান উপনিবেশ হুগলীতে স্থাপন করে। সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রোমকেরা ইহাকে "গ্যাঞ্জেস্ রিজিয়া" (Ganges Regia) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গে মুসলমানাধিকারের প্রথম যুগে সপ্তগ্রাম নিম্নবঙ্গের রাজধানী ছিল এবং তথায় রাজকীয় মুদ্রা নির্ম্মিত হইত। পুণ্যতোয়া গঙ্গার ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা নামে যে তিনটি বেণী বা শাখা হইতে ত্রিবেণীর নামকরণ হয়, তন্মধ্যে সরস্বতী সপ্তগ্রামের সান্নিধ্যে প্রবাহিত হইয়া উহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। পরিশেষে যখন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সরস্বতীর খরস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মৃতকল্প হইল, তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রসিদ্ধ বন্দরেরও অবশ্যম্ভাবী অবনতি ঘটিল।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ডি ব্যারস্ বঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে সরস্বতী ও যমুনা ভাগীরথীর দুইটি বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমানা। ভ্যাণ্ডেন্ ব্রুক বিরচিত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, তখন যমুনা একটি ক্ষুদ্র খালে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু সরস্বতী তখনও একটি বেশ বড় শাখানদী। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার সপ্তগ্রামে গিয়া তথায় সরস্বতীর জলের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই; সমস্ত নদীটি মজিয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়; উহাতে কবি সপ্তগ্রামকে "মহাস্থান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সপ্তগ্রাম তখনও একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সময়ে র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ্ সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ও সকল প্রকার পণ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। পর্ত্তুগীজেরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য-সংস্থাপন করিবার কয়েকবৎসর পরেই সম্ভবতঃ ১৫৩৭ কি ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের অনতি-দূরবর্ত্তী বর্ত্তমান বাণ্ডেল ও হুগলীনগরে "গোলিন" (Golin) নামে একটি উপনিবেশ, দুর্গ ও বন্দর প্রতিষ্ঠিত করে। সে সময়ে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন বিদ্রোহী শেরশাহের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় দুর্গ-নির্ম্মাণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই নূতন উপনিবেশের একদিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং সপ্তগ্রামের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমশঃ হুগলীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত আইন আকবরী গ্রন্থপাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, সে সময়ে সপ্তগ্রাম একেবারে হৃতশ্রী হইয়া গিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সরকার সপ্তগ্রামে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্দ্ধ-ব্যবহিত দুইটি বন্দরই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল, তন্মধ্যে কেবল শেষোক্ত বন্দর হইতে রাজস্ব আদায় হইত। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপিত হইবার পর, কিছুকাল শান্তভাবে বাণিজ্য করিয়া পর্ত্তুগীজেরা ক্রমেই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের সহিত সজ্ঘর্ষে কারবারে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অবশেষে অযথা উপায়ে অর্থাগমের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। হুগলী ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রজাবর্গের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া অথবা বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া ভারতের নানাস্থানে দাসবৃত্তির জন্য চালান দিতে প্রবৃত্ত হইল। যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ বা নৌকা হুগলীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, পর্ত্তুগীজেরা নবাবের বিনা অনুমতিতে তাহাদিগের নিকট শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজেরা কিঞ্চিন্ন্যূন শতবর্ষ কাল হুগলীতে এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য করিয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে দিল্লির ভাবী সম্রাট্ শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া হুগলীর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিগেজের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সুচতুর রড্রিগেজ্ পরিণামে জাহাঙ্গীরেরই জয় হইবে বুঝিতে পারিয়া, শাহ জাহানকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্যে স্বীয় অস্বীকার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে,

তাহাতে শাহ জাহান আপনাকে বিলক্ষণ অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুবিখ্যাত বেগম মমতাজ মহলও পৌত্তলিক পর্ত্তুগীজদিগের ঘোরবিদ্বেষী ছিলেন। বাদশাহী তক্তে অধিষ্ঠিত হইবার কতিপয় বৎসর পরেই শাহ জাহান বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কাসিমখাঁ জোবানীকে হুগলী হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে একেবারে দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ পাইয়া কাসিম খাঁ বিশেষ চতুরতা ও সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি হুগলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করিতে প্রায় সাড়ে তিন মাস লাগিয়াছিল। পর্ত্তুগীজেরা দুর্গরক্ষার জন্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে এবং অবরোধকারীদিগের উপর অজস্র গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটি করে নাই। পরিশেষে মোগলেরা বাণ্ডেল-গির্জ্জার সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পতোয় পরিখার একস্থানে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী একটি উচ্চ বুরুজ আক্রমণের ছল প্রদর্শনপূর্ব্বক তদুপরি বহুসংখ্যক যুযুৎসু পর্ত্তুগীজ-সেনা সমবেত করিয়া সর্ব্বসমেত বুরুজটি উড়াইয়া দিল। এইরূপে বিস্তর পর্ত্তুগীজবীর নিহত হইল এবং মোগলেরা হল্লা করিয়া দুর্গ দখল করিল। বিজিত পর্ত্তুগীজেরা অনেকে মোগলের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, অনেকে পলায়ন করিয়া জাহাজে আশ্রয় লইতে গিয়া নদীর জলে ডুবিয়া মরিল। যাহারা কোনও মতে জাহাজে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহারাও জলযুদ্ধে মোগলের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মোগলেরা পূর্ব্বাহ্ণেই তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া পলায়নের পথ রোধ করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজে দুই হাজার স্ত্রী পুরুষ ও তদীয় সন্তানসন্ততি নিজ নিজ ধনদৌলত সঙ্গে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানের হস্তে আত্মসমর্পণাপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর ভাবিয়া ঐ জাহাজের কাপ্তেন বারুদখানায় আগুন লাগাইয়া জাহাজ উড়াইয়া দিলেন; অন্যান্য অনেক জাহাজও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। চৌষট্টি খানা বড় জাহাজ, দুই বা তিন মাস্তুল বিশিষ্ট সাতান্নখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুইশতখানি একমাস্তুলী ছোট জাহাজের মধ্যে কেবল একখানি মাঝারি ও দুই খানি ছোট জাহাজ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রায় সার্দ্ধ চারি সহস্র পর্ত্তুগীজ স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা বন্দী হইয়াছিল; তন্মধ্যে জন কতক পাদরি এবং পাঁচশত সুদৃশ্য বালকবালিকা আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুরূপা কুমারীগণ বাদশাহ ও তাঁহার ওমরাহগণের অন্তঃপুরে স্থান পাইল এবং বালকগণ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। পাদরিদিগকেও মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি ও ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কয়েক মাস কারাবাসের পর গোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মোগলেরা হুগলী দখল করিবার পর তথায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইল, হুগলী একটি রাজকীয় বন্দরে পরিণত হইল এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হইল। বর্ত্তমান কালে হুগলীতে পর্ত্তুগীজদিগের অতীত প্রভাবের একমাত্র নিদর্শন তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাণ্ডেলের গির্জ্জা। ঐ গির্জ্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়; তৎপূর্ব্বে বান্ধ

কোনও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান গির্জ্জা সম্পূর্ণরূপে নূতন নির্ম্মিত, পুরাতন গির্জ্জার কোনও চিহ্নই নাই। এখনও এখানে প্রতিবৎসর "নভেনা" (Novena) বা "নব-দিবস-ব্যাপী" ধর্ম্মোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয় এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ক্যাথলিক যাত্রীর সমাগম হয়। ব্যাণ্ডেলের সর-পনীর (Cream-cheese) এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। সাত বৎসর হইল আমি একবার ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা দেখিতে গিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভাগীরথীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এই রমণীয় ধর্ম্মমন্দিরটিকে রমণীয়তর করিয়া তুলিয়াছে।

এক সময়ে পর্ত্তুগীজেরা কলিকাতার অতি সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইংরাজদিগের কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপনের প্রথম যুগে উক্ত রাজধানীর দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত বরাহনগর ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং সে সময়ে অনেক বিলাসপ্রিয় ইংরাজ বরাহনগরের ওলন্দাজ বিবিদিগের সহিত নৃত্য-গীত ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন। ওলন্দাজদিগের বরাহনগরবাসের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা মাতলা নদীর মোহানায় প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান পোর্ট ক্যানিং অতিক্রম করিয়া বিদ্যাধরী নদীর তীরবর্ত্তী এবং বাদার নিকটবর্ত্তী তাড়া নামক স্থানে—জোব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা পত্তনের বহুপূর্ব্বে—শতাধিক বর্ষ বাস করিয়া বিশেষ লাভজনক বাণিজ্য চালাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া সুন্দরবনে অতি জঘন্য দাস-ব্যবসায় বাহুল্যরূপে চালাইতে লাগিল। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে রমণীয় নদীতীরে তাহাদিগের চরেরা অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া হয় গোয়ার দাসহট্টে চালান দিত, নতুবা নিজ দলভুক্ত করিয়া লইত। এই মনুষ্য-মৃগয়ায় এবং জলদস্যু-বৃত্তিতে আরাকানবাসী মগেরা অনেক সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের সহচর হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর একস্থানে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

"ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে॥"

"হরমা" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু আমার বোধ হয় উহা দস্যুবাচক আরবী "হরামী" শব্দের অপভ্রংশ।*

দাস-ব্যবসায় ও নৌদস্যুবৃত্তি এই দুইটি পর্ত্তুগীজদিগের দুরপনেয় কলঙ্ক। পশ্চিম বঙ্গে পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে বণিক্‌বেশে আসিয়াছিল এবং অনেক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, যদিও তাহারা পরিণামে উপরোক্ত দুইটি ঘোর কলঙ্কেই কলঙ্কিত হইয়াছিল;

* কবিকঙ্কণের প্রাচীন পুথিতে 'হারামদ' পাঠ আছে। উহা স্পেনীয় armada শব্দেরই রূপান্তর, অর্থ নৌসেনাবাহিত জাহাজ। (সা-প-প-সম্পাদক)

কিন্তু বঙ্গের পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে তাহারা প্রায় প্রথম হইতেই যোদ্ধ্‌বেশে দেখা দিয়াছিল। তখন পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ঐ সকল রাজ্যের অধিপতিরা মোগল-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন না এবং আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত নিজ নিজ সৈন্যবল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। উপকূলবর্ত্তী রাজ্যের নৌবলের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং তাঁহারা বাণিজ্যব্যপদেশে আগত নৌ-সমরকুশল পর্ত্তুগীজদিগের সহিত প্রথম হইতেই সদ্ভাব সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। র‍্যাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ যখন (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্ব বঙ্গ ভ্রমণ করেন, তখন সুবিখ্যাত ইছা খাঁ—যাঁহার রাজধানী সুবর্ণগ্রামের ন্যূনাধিক দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল—ঐ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলপ্রতাপ রাজা ও খৃষ্টীয়দিগের বন্ধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ফিচ্‌ পর্ত্তুগীজদিগকে ঐ অঞ্চলে বাস করিতে ও প্রভূত প্রভুত্ব খাটাইতে দেখিয়াছিলেন। বঙ্গোপ-সাগরের উত্তর-পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ত্রিপুরা ও আরাকানের স্বাধীন রাজারাও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন। আরাকান তখন "মগের মুলুক" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রাম পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূ‌ত ছিল; ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আরাকান-রাজের অনুগ্রহে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ চট্টগ্রামে এবং আরাকানের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে দেশীয় রাজাদিগের অধীনে সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নৌযুদ্ধ-নিপুণতা ও অকুতোভয়শৌর্য্যগুণে উচ্চ পদ, প্রভূত ক্ষমতা এবং বিপুল ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গে হুগলী যেমন পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান উপনিবেশস্থান ছিল, উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রামও সেইরূপ ছিল; পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিদূরিত হইবার বহু বৎসর পরেও তাহারা এখানে বাস করিয়াছিল। চট্টগ্রামে বড় বড় জাহাজ আসিবার যেরূপ সুবিধা ছিল, হুগলীতে সেরূপ সুবিধা ছিল না বলিয়া পর্ত্তুগীজেরা চট্টগ্রামের নাম "পোর্টো গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) বা "বড় বন্দর" এবং হুগলীর নাম "পোর্টো পেকুইনো" (Porto Pequeno) বা "ছোট বন্দর" রাখিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত আইন-আকবরী গ্রন্থে চট্টগ্রাম একটি তরুচ্ছায়াসমন্বিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃহৎ নগর এবং খৃষ্টান ও দেশীয় বণিক্‌দিগের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত। পশ্চিম বঙ্গে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্যে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া যেরূপ ঘৃণিত দাস ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গে সমপ্রকৃতি মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বৃত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার পর্ত্তুগীজদস্যুদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহারা কেবল সমুদ্রোপকূলে দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্ষান্ত হইত না, নদীমুখে প্রবিষ্ট হইয়া বাট সত্তর ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে পর্য্যন্ত যাইয়া লুঠ তরাজ করিত। গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিত এবং তাহার অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত, বৃদ্ধদিগকে অর্থবিনিময়ে ছাড়িয়া দিত এবং তরুণদিগকে দাঁড় টানিবার জন্য নিজদলভুক্ত করিয়া লইত। তাহারা এইরূপে পাদরিদিগের অপেক্ষা বেশি লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল বলিয়া বড়াই করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাহাঙ্গীর বাদশাহের

আসলে সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালিস্ নামক একজন পরাক্রান্ত পর্ত্তুগীজ দস্যুদলপতি সনদ্বীপের মোগল রাজপুরুষকে নিহত করিয়া ঐ দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল এবং তথায় একজন স্বাধীন রাজার ন্যায় সাত আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। গঞ্জালিস্ অল্পকালের মধ্যেই এক হাজার পর্ত্তুগীজ ও দুই হাজার দেশীয় সৈন্য, দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত অশীতিসংখ্যক ছোট বড় জাহাজ সংগ্রহ করিয়াছিল। দুরাত্মার ভয়ে ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী রাজ্যের অধীশ্বরেরা তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বশাখার মোহানায় শাহবাজপুর প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিল এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আরাকান রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল; কিন্তু তথায় পরাস্ত হইয়া পরিশেষে আরাকানরাজ কর্ত্তৃক স্বরাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। গঞ্জালিসের পতনের পর পর্ত্তুগীজেরা কিছুকাল শান্তভাবে চট্টগ্রামে বাস করিয়া ক্রমে আবার মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। মগদিগের দৌরাত্ম্য পূর্ব্ববঙ্গে উত্তরোত্তর এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের নাম শুনিলে লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। দুরাত্মারা যে কোনও স্থান আক্রমণ করিত, তত্রত্য পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া স্ত্রী ও শিশুগণকে দাসবৃত্তির জন্য সঙ্গে লইয়া যাইত। সুবিখ্যাত নবাব শায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবাদারী পদে নিযুক্ত হইয়াই এই অত্যাচার নিবারণের সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি সনদ্বীপের মগদিগের বিরুদ্ধে কেবল বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্য পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; বস্তুতঃ তিনি কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সকল পর্ত্তুগীজ চট্টগ্রামে বাস করিত এবং যাহারা আরাকানরাজের বেতনভোগী ছিল, তাহাদিগের উভয়কেই বিস্তর প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া মোগলসৈন্যভুক্ত হইতে সম্মত করা হইয়াছিল। একথা আরাকানরাজের কর্ণগোচর হওয়াতে, তিনি অবিলম্বে পর্ত্তুগীজদিগকে সমূলে বিনাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুতরাং তাহারা প্রাণভয়ে ধনদৌলত পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি রাত্রিযোগে জাহাজে উঠিয়া সনদ্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পলাতকেরা সনদ্বীপে নিরাপদে পৌছিলে মোগল-সেনাপতি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষম ছিল, তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া অপর সকলকে ঢাকায় নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাহাদিগের বাসার্থ ঢাকা হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে যে স্থান নিরূপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ফিরিঙ্গিবাজার বলিয়া খ্যাত।

পর্ত্তুগীজদিগের সহায়তা ব্যতিরেকে মোগলেরা মগদিগের সহিত জলযুদ্ধে কদাপি জয়ী হইতে পারিতনা। মগেরা পরাস্ত হইলে, মোগলেরা অবিলম্বে চট্টগ্রামে গিয়া মগদিগের দুর্গ অবরোধ করিল। যদিও ঐ দুর্গ সুদৃঢ় প্রাকার ও বহুসংখ্যক কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, দুর্গবাসীরা স্বকীয় নৌবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া এরূপ ভীত হইল যে, তাহারা দুর্গরক্ষার চেষ্টা না করিয়া রজনীযোগে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগল সওয়ারেরা পলাতকদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া দুই সহস্র পলাতককে ধৃত ও পরিণামে

দাস বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, যে সকল পর্ত্তুগীজ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল কেবল তাহারাই নহে—ওলন্দাজেরাও চট্টগ্রাম বিজয়ে মোগলদিগের সহায়তা করিয়াছিল। মোগলেরা এইরূপে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম দখল করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখিল। সেই অবধি পর্ত্তুগীজেরা তাহাদিগের এতকালের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইল।

পর্ত্তুগীজেরা বঙ্গের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াও অনেক দিন এদেশে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সুন্দরবন পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যু-নাট্যের প্রধান রঙ্গভূমি ছিল। পুরাবিৎদিগের অবিদিত নাই যে, এক সময়ে ঐ সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর দ্বারা সুশোভিত ছিল। প্রচণ্ড বাত্যা, ভূমিতলের অধোগতি প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ গণনা করিলেও উক্ত প্রদেশের অবস্থাবিপর্য্যয়ের মুখ্যতম কারণ যে, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের বহুকালব্যাপী ভীষণ অত্যাচার, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ডায়মণ্ড-হার্ব্বারের নিকটবর্ত্তী একটি নদীতে পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের গতি-বিধি ছিল বলিয়া, ইংরাজেরা উহাকে "রোগস্ রিভার" (Rogue's River) বা "দস্যুনদী" বলিতেন। সে সময়ে কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ইংরাজেরা মগদস্যুদিগকে এবং অনেক সময়ে তৎসহচর পর্ত্তুগীজদস্যুদিগকে—এত ভয় করিতেন যে, পাছে দস্যুরা নদীমুখ দিয়া আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ করে এই ভয়ে তাঁহারা মুচিখোলার নিকটবর্ত্তী নদীকে একটি প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে পর্ত্তুগীজদিগের মিশ্র বংশধরেরা ইংরাজদিগের অধীনে গোলন্দাজ সৈনিকের বা গার্হস্থ্য ভৃত্যের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পাচকের কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল, কেহ কেহ কেরাণীর কর্ম্মেও নিযুক্ত হইত, কেহ বা সুনিপুণ বেহালাবাদক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখন যেমন সাহেবেরা দেশীয় ভৃত্যদিগের সহিত হিন্দুস্থানী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে অপভ্রষ্ট পর্ত্তুগীজভাষা সেইরূপ একটি "লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা" (Lingua franca) বা সাধারণের বোধগম্য ভাষা বলিয়া ব্যবহৃত হইত। পর্ত্তুগীজভাষার যে সকল শব্দ প্রচলিত বঙ্গভাষায় স্থান পাইয়াছে, আমি যথাসাধ্য তাহার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট আমরা আরও কি কি পাইয়াছি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। পর্ত্তুগীজেরা বড় উদ্যান-প্রিয় ছিল এবং ভারতের ফলের বাগান তাহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী। আনারস, পেয়ারা, আতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুণ, কাজু বাদাম, চীনের বাদাম প্রভৃতি অনেক গুলি দক্ষিণ আমেরিকার ফল, সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম এদেশে আনয়ন করে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'সন্তরা' নামে যে এক প্রকার নারাঙ্গী বা কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মে, খুব সম্ভব যে পর্ত্তুগালের অন্তঃপাতী সিন্ত্রা (Cintra) নগর হইতেই উহার নামকরণ হয়। বৃন্দাবন-দাস রচিত চৈতন্য-ভাগবতে "সমতারা" ফলের উল্লেখ আছে। আনারস সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর

বাদশাহের আত্মজীবনীর এক স্থানে লিখিত আছে যে, তাঁহার পিতামহ বাবর শাহ আগ্রার সম্মুখবাহিনী যমুনার ওপারে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তথায় নানাবিধ বিদেশী ফলের বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ফিরিঙ্গি-দ্বীপ হইতে আনীত "আনানস্" নামক সুস্বাদু ফল বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পর্ত্তুগীজদিগের যত্নে ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলও চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের "আল্‌ফন্‌সো" বা "আফুস" জাতীয় আম্র এখনও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। আইন-আকবরীতে লিখিত আছে যে, সপ্তগ্রাম দাড়িম্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ; বোধ হয় পর্ত্তুগীজেরাই ঐ প্রসিদ্ধির মূলকারণ। পর্ত্তুগীজেরা ফলের মোরব্বা ও আচার প্রস্তুতকরণ প্রণালীরও বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। আমি এ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রায়ারের সাক্ষ্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। বার্ণিয়ার তাঁহার বঙ্গভ্রমণ-বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজেরা ফলের মোরব্বা প্রস্তুতকরণে সিদ্ধহস্ত ছিল এবং তাহারা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় বিস্তীর্ণরূপে চালাইত। বার্ণিয়ার কলম্বু বা কাটুয়ালেবু, পাতীলেবু, আম্র, আনারস, হরিতকী প্রভৃতি বিবিধ ফলের এবং আর্দ্রক ও শতমূলীর মোরব্বার কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। পর্ত্তুগীজেরা সূর্য্যমুখী, রজনীগন্ধা, মুকুট ফুল, বিলাতী তুলসী, পীতকরবী, গাঁদা প্রভৃতি অনেকগুলি মেক্সিকো দেশের ফুল এদেশে আনিয়া আমাদের ফুলের বাগানের শোভাবর্দ্ধন এবং কপি, ওলন্দা কড়াইসুটি প্রভৃতি ইউরোপীয় তরিতরকারির চাষ করিয়া আমাদের সবজিবাগানেরও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল। সালসা, আয়াপান, জোলাপ প্রভৃতি ঔষধের গাছগাছড়াও সম্ভবতঃ তাহারাই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে এদেশে আনয়ন করে। পর্ত্তুগীজদিগের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কদর্য্য রোগেরও আমদানি হইয়াছিল। ভাবপ্রকাশ নামক প্রামাণিক কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদ্যকগ্রন্থে ঐ রোগটী 'ফিরঙ্গ" নামে অভিহিত—

"গন্ধরোগঃ ফিরোঙ্গঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥
ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধি র্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥"

এই রোগ ফিরঙ্গ দেশীয় পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে উৎপন্ন হয় এবং ইহা উক্ত দেশে বহুল প্রচার বলিয়া ব্যাধি-বিশারদেরা ইহার নাম 'ফিরঙ্গ' রাখিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের যে সকল লক্ষণ ও উপদ্রব বর্ণিত আছে, আমি বাহুল্যভয়ে তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে, হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন যে পাশ্চাত্য ব্যাধি-বিশারদ পণ্ডিতেরা "সেকেণ্ডারি সিফিলিস্" (Secondary Syphilis) রোগের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, ঠিক সেইগুলি ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—যথা বিস্ফোটক, অস্থির (বিশেষত নাসা ও তালুর অস্থির) বিকৃতি ইত্যাদি। ভারতের প্রাচীন বৈদ্যকশাস্ত্রে উক্ত রোগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ফলতঃ কলম্বসের স্পেনদেশীয় সহযাত্রিগণ আমেরিকার অন্তঃপাতী হিস্পানিয়োলা

দেশের রমণীদিগের সহিত সংসর্গদোষে দুষ্ট হইয়া ঐ রোগ সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করে এবং তৎপরে পর্ত্তুগীজেরা উহা ভারতে বিস্তার করে।

রোগীর পথ্য পাঁউরুটি ও বিস্কুট প্রস্তুত করিতে আমরা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা করি। পাকরাজেশ্বর নামক আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে "ফিরঙ্গরোটী' বা পাঁউরুটি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিশেষ বিবৃত আছে। ঐ গ্রন্থে পাক করিবার চুল্লী অর্থে "তুন্দুর" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা সংস্কৃত শব্দ নহে—একটি পর্ত্তুগীজ শব্দের অপভ্রংশ, তাহার প্রকৃত অর্থ চুল্লী নহে—যে কাষ্ঠফলকে ঠাসা ময়দা রুটির আকারে গঠিত হয়, তাহাই বুঝায়।

যে তামাকুর ধূমপান করিয়া ভারতের কোটি কোটি শ্রমজীবীরা শ্রান্তি দূর করে এবং কি ধনী কি নির্ধন সকলেই আনন্দলাভ করে, ইউরোপে তাহার প্রথম বীজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মেক্সিকো রাজ্যের অন্তর্গত য়ুকাটান প্রদেশ হইতে আনীত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে ভারতে তামাকুর প্রথম আমদানি হয়; সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজেরাই ঐ আমদানি করিয়াছিল। বঙ্গীয় যাত্রাদলের প্রাণস্বরূপ বেহালাও পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আনে। এক সময়ে এদেশের পুরুষদিগের মধ্যে লবেদার এবং সুন্দরী-দিগের মধ্যে ফিরিঙ্গি খোঁপার খুব চলন ছিল, দুইটিই পর্ত্তুগীজদিগের অনুকরণের ফল। আলমারি, কেদারা প্রভৃতি পাশ্চাত্য গৃহসজ্জার প্রথম পরিচয় আমরা পর্ত্তুগীজদিগের কাছে প্রাপ্ত হই। পর্ত্তুগীজেরাই আমাদিগকে প্রেমারা, বিন্তি ও কুপন খেলিতে শিখায় এবং সুর্ত্তি ও নিলাম দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা তাহারাই এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত করে। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা অদ্যাপি পর্ত্তুগীজদিগের অনুকরণে যীশুমাতা মেরির নাম গ্রহণ করিয়া শপথ করে; "মাইরি" শব্দের অর্থ মেরির দিব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে "ম্যারি" (Marry) শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইত।

পর্ত্তুগীজেরা কাকাতুয়া পক্ষী, কিরিচ, সাগুদানা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য মলয় উপদ্বীপ হইতে ভারতে আনয়ন করে এবং এইরূপে পর্ত্তুগীজভাষার ভিতর দিয়া মলয়দেশের কয়েকটি কথা বঙ্গভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতার সাহেবেরা টানাপাখা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে স্পেনরাজ্যে টানাপাখা ব্যবহৃত হইত এবং উহা পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম এদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

আমি এখন আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পর্ত্তুগীজ শব্দের একটি তালিকা প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

পর্ত্তুগীজমূলক বাঙ্গালাশব্দ।	মূল পর্ত্তুগীজশব্দ।
আনারস	Ananaz (Brazilian *Nana*)
আয়া	Aia
আলকাৎরা	Alcatrao

আলমারি	Almario, armario
আলপিন	Alfinite
ওলন্দা (কড়াইশুটি)	Hollanda (হলণ্ড দেশ)
কপি	Couve.
কাকাতুয়া	Catatua (Malay *kakatua*)
কাজুবাদাম	Cajú.
কাতুর (প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত)	Quadra.
কানেস্তারা	Canastra.
কাপি, কাপিখানা	Café
কাফ্রি	Cafre.
কামরা	Camara.
কামরাঙ্গা, কর্ম্মরঙ্গ (আধুনিক সংস্কৃত শব্দ, বিদেশী শব্দের অনুকরণ-জাত)	Carambóla (বৈজ্ঞানিক নাম *Averrhea Carambola*)
কিরিচ	Cris. (Malay *kris*)
কুপন (খেলা)	Coupon.
কেদারা	Cathedra.
কোরেস্তা (প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত)	Quarenta
গরাদে	Grade
গামলা	Gamella (বৃহৎ দারুময় খোরা)
গির্জ্জা	Egreja, Igreja
চাবি	Chave
জানালা	Janella
জালা	Jarra
জোলাপ	Jalapa
টোকা	Touca (বিবির টুপি)
তামাক, তামাকু, তাম্রকুট্টক (আধুনিক সংস্কৃত শব্দ, বিদেশী শব্দের অনুকরণজাত)	Tabaco (আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ভাষা হইতে গৃহীত)
* তলুয়া (তোলো হাঁড়ী)	Talha (জল, তৈল প্রভৃতি রাখিবার বৃহৎ মৃণ্ময় পাত্র)

* সংস্কৃত ভাষায় হণ্ডা, হণ্ডী, হণ্ডিকা, হণ্ডিকাস্থত, প্রভৃতি হাঁড়ীর আয়তন ভেদে যতগুলি নাম পাওয়া যায়, তাহার কোনটীর সহিত তোলো ও তিজেলের সাদৃশ্য নাই।

* তিজেল	Tigela (পায়স প্রভৃতি খাইবার মৃন্ময়পাত্র)
তুন্দুর, তঁদুল	Tendedeira (যে কাষ্ঠফলকে ঠাসা ময়দা রুটির আকারে গঠিত হয়)
তেরেস্তা (প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত)	Trinta
তোয়ালিয়া	Toalha.
নিলাম	Leilao
নোনা (আধুনিক সংস্কৃত নাম গণ্ডগাত্র)	Annona (বৈজ্ঞানিক নাম *Annona Reticulata*)

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আতা ও নোনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আতার আধুনিক সংস্কৃত নাম সীতাফল।

পরাত (বড় থালা)	Prato (প্লেট)
পাদরি	Padre.
পাঁউরুটি	Pão
পিপা	Pipa.
পিস্তল	Pistola.
পেরু (গৃহপালিত পক্ষীবিশেষ)	Peru.
পোস্তা	Posta.
প্রমারা	Primeiro
প্রেক	Prégo
ফর্ম্মা	Forma
ফিগু (প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত)	Figura
ফিতা	Fita
ফেস্তা (উৎসব অর্থে হুগলী অঞ্চলে ব্যবহৃত)	Festa
বয়া	Boia
বরগা	Verga, Virga (দণ্ড, যষ্টি) অথবা Barrote (বরগা, কড়ি)
বাও (বাগি)	Bubão
বালতি	Balde
বিস্তি	Vinte
বিস্কুট	Biscoito
বের্দ্দি (সবুজ রঙ)	Verde
বেসালি (দুগ্ধদোহনের পাত্র)	Vasilha (পাত্র)

বেহালা	Viola
বোতল	Botelha.
বোতাম	Botao
বোমা	Bomba
বোম্বেটিয়া	Bombardeiro (গোলন্দাজ সৈনিক)
মাইরি	Maria (যীশুজননী)
মার্কা	Marca.
মাস্তল	Mastro, Masto.
মেরিণো	Merino
যীশু	Jesu.
রেস্ত	Resto (অবশিষ্ট, দ্যূতক্রীড়ার পণ)
লবেদা	Loba (ঢিলা পরিচ্ছদবিশেষ) ও abada (পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ গুটান)
সপেটা	Sapotilla (Mexican *zapotl*)
সাগু	Sagu (Malay *sagu*)
সাবান	Sabao
সায়া	Saia
সালবোট (রেকাব)	Salva
সালসা	Salsaparrilha.
সাঁকালি (থলিয়া)	Sacola (দুইটি থলিয়াবিশিষ্ট ব্যাগ)

একটি প্রচলিত দেহতত্ত্বের গানে আছে—

"ওরে দুইমুখো সাঁকালি ! (অর্থাৎ উদর)
সারাদিন ওব্‌রাভরা আর কোর্ব্বো কত ?"

সুর্ত্তি	Sorte
সেঁকো [বিষ]	Arsenico

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

রাণক কুলস্তম্ভের তাম্রশাসন

(মূলের প্রতিকৃতি সহ)

উড়িষ্যার যে ১৮টী গড়জাতরাজ্য আছে, তন্মধ্যে তালচের একটী। এই স্থান বহু পূর্ব্বকাল হইতে একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; আলোচ্য তাম্রশাসনেও তাহার কিছু নিদর্শন বিদ্যমান। কএকবর্ষপূর্ব্বে এক কৃষক ভূমিতে হলচালনকালে এই তাম্রশাসনখানি পাইয়া তালচের-রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজকে অর্পণ করিয়াছিল। তালচেরের মহারাজ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ময়ূরভঞ্জাধিপতির নিকট পাঠোদ্ধারের জন্ম পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারই যত্নে তাম্রশাসনখানি আমার হস্তগত হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের গত ১৩১৫ সালে ৭ই ভাদ্রের মাসিক অধিবেশনে এই তাম্রশাসনখানি প্রথম প্রদর্শিত হয়। তৎপরে অল্পদিন হইল, মৎসঙ্কলিত ও মহারাজ-ময়ূরভঞ্জাধিপতির আনুকূল্যে প্রকাশিত Mayurabhanja Archæological Survey, Vol. I. p. 157*ff.* পুস্তকে ও তৎপরে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বৈশ্যকাণ্ড' ৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠায় ইহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রফলকের অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

এই তাম্রশাসনখানি দৈর্ঘ্যে ১০ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ৭ অঙ্গুলি। ইহাতে সংলগ্ন যে গোলাকার মুদ্রা আছে, তাহা ৪ অঙ্গুলি। ইহার দুই পৃষ্ঠা উৎকীর্ণ। ইহার অক্ষরগুলি আয়তনে ¼ ইঞ্চ। ইহার অক্ষরবিন্যাস আলোচনা করিলে, ইহা খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী বা কিছু পরবর্ত্তী কালের লিপি বলিয়াই মনে হইবে। ইহা সংস্কৃতভাষায় রচিত ও বহু লিপিকরপ্রমাদপরিপূর্ণ। তাম্রশাসনের সম্মুখদিগের মুদ্রার শিরোভাগে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বতন চালুক্যবংশের লাঞ্ছন আদিবরাহ ও অঙ্কুশ চিহ্ন এবং তাহার নিম্নে বড় বড় অক্ষরে "শ্রীকুলস্তম্ভদেবস্য" উৎকীর্ণ আছে।

এই তাম্রশাসনে কুলস্তম্ভের পূর্ব্বপুরুষ "ত্রিভুবনবিদিত শুল্কীকাংশবংশভূষণ" (সম্মুখভাগ ২য় পংক্তি) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটিক-সোসাইটীর পত্রিকায় শুল্কীবংশের দুইখানি তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন।* তাঁহার মতে এই শুল্কীবংশ দাক্ষিণাত্যের প্রাচ্য-চালুক্যবংশেরই এক শাখা। তাঁহার সম্পাদিত উভয় তাম্রশাসনই পুরীধামের রাঘবমঠ হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং এই উভয় তাম্রশাসনেই লিখিত আছে—"স্তম্ভেশ্বরীলব্ধবরপ্রসাদ শুল্কীকুলভূপক্ষিতিপ্রখ্যাতশ্রীমান্ কুলস্তম্ভদেবঃ কেদালো……
....কচ্ছদেব"। আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনে উক্ত কেদাল কচ্ছদেবের নাম

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1895, part I, p. 124*ff.*

নাই, কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য কলহস্তম্ভ এবং তাঁহার বংশধর 'রণস্তম্ভ' অপর নাম 'রাণক কুলস্তম্ভ' নাম পাওয়া যাইতেছে। এই বংশের অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্তম্ভেশ্বরী। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশের গৌরবরবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে এই বংশের কোন কোন মহাত্মা উৎকলের নিরাপদ পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারা 'শুল্কী' বা 'শুল্কীক' এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমি 'কেদাল' বা 'কেদার' নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই বংশ 'দাক্ষিণাত্য' হইলেও পরবর্ত্তীকালে ইঁহাদেরই কএকজন বংশধর মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ 'শুল্কী' বা 'শুক্লী' নামে পরিচিত। এই শুল্কীবংশের তিন শত বর্ষের প্রাচীন তালপত্রে লিখিত কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই বংশ 'শুলাকী' নামেও পরিচিত এবং উৎকলের উক্ত 'কেদাল' জনপদ 'পশ্চিমকেদার' নামে বিবৃত হইয়াছে।+ ইত্যাদি নানা কারণে এই তাম্রশাসনখানি একান্ত আলোচ্য ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি। নিম্নে সংশোধিত পাঠ ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

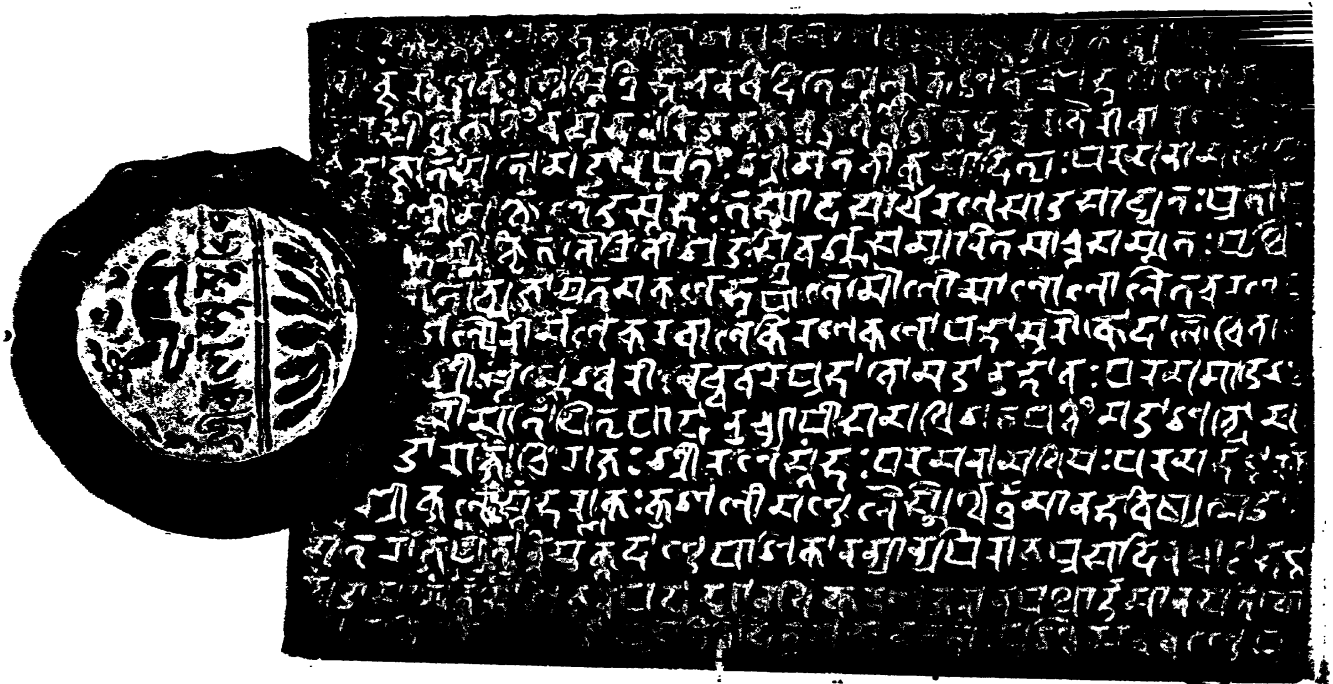
(প্রতিলিপি)

সম্মুখভাগ

(১ম পংক্তি) ওঁ স্বস্তি। জয়তি ভূ[১]জগভোগপরমাণবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃদ্ব্যাপিহরপ-
২য় „ দাজ্জরেণবঃ স্বস্তি ত্রিভূ[১]বনবিদিতে শূল্কীকাংশবংশভূষণো রাজো-
৩ „ ত্তম[২]সীতকাঞ্চনসূ[৩]ভননিজভুজবজ্রবিনির্জ্জিতদুর্দ্ধরবৈরী[৪]বারণগিরী[৫]
৪ „ ষা[৬]জ্জাতংসতো[৬] মহানৃপতিঃ শ্রীমৎবীক্রমাদিত্যঃ[৭] পরমনামধিপ[৮]
৫ „ শ্রীমৎকলহস্তংভঃ তস্মাদসার্ধরণসাহসাষ্ঠতঃ[৯] প্রতাপ-
৬ „ ভস্মীকৃতবৈরিবীগ্রহ[১০]স্ত্রিবগ্‌র্গসম্মানিত[১১] সাধুসম্মতঃ পৃথিব্যাং
৭ „ ততো ব্যজায়ত সকলভূপালমৌলীমালালালিতচরণযু-
৮ „ গলো নীর্ম্মল[১২]করবালকিরণকলাপভাসুরো কেদালোধিবাসী[১৩]
৯ „ শ্রীস্তম্ভেশ্বরীলব্ধবরপ্রভাবো মহানুভাবঃ পরমমাহেশ্ব-
১০ „ রো মাতাপিতৃপাদানুধ্যায়ী সমধিগতপঞ্চমহাশব্দো ম-

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড ২৪৩ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপাঠ—১ ভুজগ। ২ রাজোত্তমঃ। ৩ শোভন। ৪ বৈরিবারণ। ৫ গিরিশা। ৬ জ্জাতোংশতো। ৭ বিক্রমাদিত্যঃ। ৮ পরমনামাধিপঃ। ৯ তস্মাদসাধারণসাহসোদ্যতঃ। ১০ বিগ্রহ। ১১ সম্মানিতঃ। ১২ নির্ম্মল। ১৩ কেদালাধিবাসী।



রাণক কুলস্তম্ভের তাম্রশাসন

[সম্মুখভাগ।



রাণক কুলস্তম্ভের তাম্রশাসন

পশ্চাদ্ভাগ।

১১ „ হারাজাধিরাজঃ শ্রীরণস্তংভ পরমনামধিপঃ[৮] পরমভট্টরকঃ[১৪]

১২ „ শ্রীকুলস্তংভ রাণকঃ কুশলী মণ্ডলেস্মিন্বর্ত্তমানভবিষ্যত্মহা[১৫]সা-

১৩ „ মংতরাজপুত্রাম্নিযুক্তদণ্ডপাশিকানন্যাম্যপিরাজপ্রসাদিন[১৬] চাট্টভট্ট-

১৪ „ মহাসামংতভাগজনপদাস্থানধিকরণজনান্ যথার্হং মানয়তি বো-

১৫ „ ধয়তি সমাদিশতি জ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতাং পশ্চিমখণ্ডপূ-

পশ্চাদ্ভাগ

১ „ র্ব্ববিষয়ে সিঙ্গগ্রামচতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ তাম্রশাসনঃ চন্দ্রার্ক-

২ „ ক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে ॥ ভট্ট-

৩ „ পুত্র বিস্বরূপঃ[১৭] ঔতথস্য গোত্রায় ত্রৈয়ারেষয়[১৮] প্রবরো[১৯] ভবতাং[২০] ম-

৪ „ ঙ্গলবিলাবিনির্গত[২১] ভট্টপুত্র যদুসুত[২২] অণন্তরূপসুতঃ দণা-

৫ „ য়ন[২৩]সংক্রান্তৌ। আক্ষয়[২৪]নিধিধর্ম্মেনাকরত্বেন প্রতিপাদিতঃ উ-

৬ „ ক্তঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য

৭ „ যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ মাভূদফলশঙ্কা বঃ পরদত্তে-

৮ „ তি পার্থবাঃ[২৫] ॥ স্বদত্তা[২৬] ফলমানন্ত্যং[২৭] পরদত্তানুপালনে ॥ স্বদত্তা[২৮] প-

৯ „ রদত্তাপরম্পরদত্তাম্বা[২৯] যো হরেত বসুন্ধরাং ॥ স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা

১০ „ পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাদিদমুচ্য-

১১ „ তে ॥ স্বল্পমায়ুশ্চলা ভোগা ধর্ম্মো লোকদ্বয়ক্ষমঃ[৩০] ॥ ইতী[৩১]

১২ „ কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রীয়মনুচিন্ত্য[৩২] ॥ এত্য[৩৩]সিঙ্গগ্রামঃ তৃ-

১৩ „ ণপ্লুতিক প্রাপ্ত (?)[৩৪] ২॥ দূর্ব্বদাসেন উৎকীর্ণং ইতি ॥ চতুঃসীমাপর্য

☞ উপরে যে মূলের অনুলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, লিপিকরপ্রমাদেই হউক অথবা যিনি এই তাম্রশাসনের খসড়া করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত-

১৪ ভট্টারকঃ। ১৫ ভবিষ্যন্মহা। ১৬ প্রসাদিতান্। ১৭ বিশ্বরূপ।

১৮ ত্র্যার্ষের। ১৯ প্রবরায়। ২০ ভবতে। ২১ বিনির্গতঃ।

২২ যদুসুতঃ। ২৩ দক্ষিণায়ন। ২৪ অক্ষয়নিধি। ২৫ পার্থিবাঃ।

২৬ স্বদত্তাৎ। ২৭ ফলমানন্ত্যং। ২৮ স্বদত্তা।

২৯ 'পরদত্তাম্বা।' পাঠ দুইবার না হইয়া একবার হইবে।

৩০ লোকদ্বয়াক্ষয়ঃ। ৩১ ইতি। ৩২ শ্রিয়মনুচিন্ত্য। ৩৩ কিছু অস্পষ্ট।

৩৪ চিহ্নিত অংশে অস্পষ্ট হওয়ায় প্রকৃত পাঠ বুঝা গেল না।

ভাষার উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের অভাবেই হউক—কি ভাষা কি শব্দবিন্যাস অথবা কি বানানে যথেষ্ট ভুল থাকিয়া গিয়াছে, এই কারণে এই তাম্রশাসনের অবিকল অনুবাদ একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি তদ্রূপ অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

(অনুবাদ)

ওঁ স্বস্তি। ভুজগভোগপরায়ণ মহাদেব১ ও (সেই) সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকৃৎ ও সর্ব্বব্যাপী হরের পদাব্জ রেণুসমূহের জয় হউক। গিরিশের অংশে২ শুল্কীকবংশের ভূষণস্বরূপ নৃপশ্রেষ্ঠ শুভ্র কাঞ্চনবৎ প্রদীপ্ত নিজভুজবজ্রপ্রভাবে যাঁহার নিকট দুর্দ্ধর্ষ বারণরূপ শত্রুবর্গ পরাজিত, যে মহানৃপতি শ্রীমৎ বিক্রমাদিত্য পরম নাম রাজশ্রী কলহস্তম্ভ নামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হউক। তাঁহার অসাধ্য রণসাহসোত্তম ও প্রতাপে বৈরিগণ ভস্মীভূত হইয়াছে ও পৃথিবীতলে সাধুসম্মত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্গ কর্ত্তৃক যিনি সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহা হইতে মহানুভব পরম

(১) মূলে 'পরমাণবঃ' আছে। অণুশব্দের একটী অর্থ শিব, সুতরাং 'পরমাণু' শব্দে পরমশিব বা মহেশ্বর অর্থ করা যাইতে পারে। প্রশস্তার্থে এখানে বহুবচন।

(২) গিরিশ অর্থাৎ মহাদেবের অংশে শুল্কীবংশের উৎপত্তি,—মেদিনীপুরবাসী শুল্কীদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতেও এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে—

"কাশীপুরে বিশ্বনাথের চরণ কৈল পূজা।
সদয় হইয়া বর দিল দেবরাজা॥
সেথান হইতে সঙ্গে গয়াভূমে গেল।
পিতার উদ্দেশ হেতু কুশহস্ত হইল॥
ব্রহ্মবংশচূড়ামণি পুরোহিত তথা।
পত্রে লিখিয়া দিল পিণ্ডের ব্যবস্থা॥
যজ্ঞেতে আমার জন্ম জানিবে কারণ।
তাহা বুঝি কৈল বিপ্র মন্ত্র আবাহন॥
যজ্ঞের লক্ষণ সব বর্ত্তমান হইয়া।
বসিলেন পিণ্ডদানে চৌদিকে বেড়িয়া॥
দ্বিজরূপে বসিয়াছেন দেব বিশ্বনাথ।
দেখ' দেখ তোমাদের পিতা যে সাক্ষাৎ॥ ... ...
... ...
যজ্ঞে জন্ম হইল তার দেবমূর্ত্তি দেখি।
মহেশের মানসপুত্র বড় হইল সুখী॥" (তালপত্রের কুলজী)

[বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বৈশ্যকাণ্ড ১ম ভাগ ২৪৫ হইতে ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

মাহেশ্বর মাতাপিতৃপাদানুরত সমধিগত-পঞ্চমহাশব্দ৩ মহারাজাধিরাজ শ্রীরণস্তম্ভদেব জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার নির্ম্মল করবালের কিরণসমূহ সর্ব্বদা উজ্জ্বল, সকল রাজগণের শিরোমালা যাঁহার চরণযুগলে লালিত, কেদালঃ নামক স্থানে যাঁহার বাস, যিনি দেবী স্তম্ভেশ্বরীর বরলাভে সবিশেষ প্রভাবান্বিত, যে রাজার পরম নাম পরমভট্টারক শ্রীরণস্তম্ভ রাণক, তিনি কুশলে থাকিয়া এই মণ্ডলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মহাসামন্ত, রাজপুত্র এবং তন্নিযুক্ত দণ্ডপাশিক প্রভৃতি অন্যান্য রাজ-প্রসাদভোগীদিগকে এবং চাট্ট ভট্ট ও মহাসামন্তগণের অধীন জনপদাদির অধ্যক্ষগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন, প্রবোধ দিতেছেন, আজ্ঞা করিতেছেন ও জানাইতেছেন যে, আপনারা সকলে অবগত হউন—পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব্ব বিষয়ে (এই) তাম্রশাসনবর্ণিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সিঙ্গগ্রাম চন্দ্রসূর্য্য ও পৃথিবী যতকাল তত কালের জন্য মাতা, পিতা, আপনার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষে ভট্টপুত্র বহুর সুত অনন্তরূপের পুত্র (যাঁহার) উতথ্য গোত্র ও ত্র্যার্ষেয় প্রবর ভট্টপুত্র বিশ্বরূপকে অক্ষয়নিধিধর্ম্মানুসারে নিষ্করক্রপে প্রদান করিতেছেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে উক্ত আছে, সগরাদি বহু রাজাই ভূমিদান করিয়াছেন, যাহার যাহার যেখানে ভূমি, তাহার তাহার সেখানে ফল। হে রাজগণ! পরদত্ত ভূমির জন্য অফলের আশঙ্কা করিও না। নিজদত্ত অপেক্ষা পরদত্তের রক্ষায় অনন্ত ফল। স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যে ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পঁচিয়া থাকে। বেশী আর কি বলিব, সংক্ষেপে বলিতেছি। আয়ু অল্প, ভোগ অস্থায়ী, ধর্ম্মই কেবল ইহলোক ও পরলোকে অক্ষয়, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় সম্পদ্ চিন্তা করিয়া। এই সিঙ্গগ্রাম তৃণপ্লুতি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল। ২ ॥ দুর্ব্বদাস কর্ত্তৃক (এই তাম্রশাসন) উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

(৩) 'সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' অর্থাৎ যিনি পঞ্চমহাশব্দ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিগণ এই শব্দে বিশেষিত হইতেন। সাধারণতঃ মহাসামন্তগণই এইরূপ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। কোন কোন স্থলে মহারাজাধিরাজও 'সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' দ্বারা আখ্যাত হইয়াছেন। (Fleet's Gupta Inscriptions, p. 297)। লিঙ্গায়তদিগের প্রাচীন 'বিবেকচিন্তামণি' গ্রন্থে শৃঙ্গ, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘণ্টা এই পঞ্চবাদ্যধ্বনিই 'পঞ্চমহাশব্দ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) কেদাল—উক্ত তালপত্রের কুলগ্রন্থে এই কেদাল শব্দ 'পশ্চিম কেদার' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬ষ্ঠ। গোবিন্দদাস কবিরাজ

পদ-সমষ্টি ৪৫৯।

গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা।

পদ-সংখ্যা যথা :—৩।৪।৫।১০।১১।১২।১৯।২০।২৭।৩৯।৪০।৪৬।৫২।৫৩।৫৬।৫৮।৬২।৬৭।৭৩—৭৫। ৮৫।৮৬।৮৯—৯১।৯৩।১০০।১০১।১১৫।১২৮।১৩০।১৩২।১৩৯।১৪৯।১৫২।১৫৮।১৬৩।১৬৬।১৭৪।১৮৯। ১৯২।১৯৯।২০০।২০৪।২১৩।২১৭—২১৯।২২৫।২২৭।২৩৩—২৩৬।২৬১। ২৬৩-২৬৫।২৬৯।২৭০।২৭৫।২৮৭।৩০২।৩০৪।৩০৫।৩০৮।৩০৯।৩১৩— ৩১৫।৩১৭—৩১৯।৩২৬।৩৩৬।৩৩৮।৩৪১।৩৪৫।৩৫৭।৩৬০।৩৬১।৩৬৫।৩৬৮।৩৭০।৩৭৫।৩৭৮।৩৮২। ৩৯৭।৩৯৯।৪০৪—৪০৬।৪০৮।৪২২—৪২৪।৪২৯।৪৩০।৪৩২—৪৩৬।৪৩৯।৪৪০।৪৪২।৪৪৩।৪৫২— ৪৫৪।৪৫৬।৪৫৮।৪৬৪।৪৬৮।৪৬৯।৪৭১।৪৮৮।৪৮৯।৫০৭।৫০৮।৫১৮।৫২৬।৫২৮।৫৩০।৫৩৫।৫৩৭।৫৪৭। ৫৫২।৫৭৩।৫৭৬।৫৭৯।৫৮১।৫৮৭।৫৯২।৫৯৭।৬০০।৬০৩।৬০৯।৬১৯।৬২১—৬২৩।৬২৮।৬২৯।৬৪৫। ৬৪৭।৬৪৮।৬৮০।৬৮৭।৬৮৯।৬৯১।৬৯২।৬৯৪।৭০২—৭০৮।৭১৪।৭৪২।৭৪৭।৭৪৮।৭৫১।৭৫২।৭৫৭। ৭৫৮।৭৬৩—৭৬৬।৭৬৯—৭৭১।৭৮৬।৭৯২।৮৯৮—৯০০।৯০৮।৯৩৫।৯৩৭।৯৭৫।৯৭৭।৯৮২—৯৯০। ৯৯২।৯৯৫।১০০০।১০০৪।১০১১।১০২০।১০৩১।১০৩২।১০৩৪।১০৩৫।১০৩৮।১০৪৭—১০৫২।১০৬০। ১০৬২।১০৭০।১০৭৩।১০৮৭।১১০২।১১০৭।১২৪৯—১২৫২।১২৬০।১২৬২।১২৬৬।১২৭৪।১৩০০— ১৩০৪।১৩১৩।১৩১৫।১৩১৬।১৩২৮।১৩৩৪।১৩৩৬।১৩৩৭।১৩৬০।১৩৬৮।১৩৭৫।১৩৮৮।১৪০৭।১৪১৭। ১৪২৪।১৪৩০।১৪৩২।১৪৫৯।১৪৬৩।১৪৬৬।১৪৮১।১৪৮৫।১৪৯৫।১৫০৫—১৫০৭।১৫২২।১৫৪৫। ১৫৪৮।১৫৬৫।১৫৭৫।১৫৯৭—১৫৯৯।১৬০১।১৬০৬।১৬১১।১৬১৩।১৬১৭।১৬২০—১৬২২।১৬৩৫। ১৬৩৮।১৬৪৪।১৬৫৩।১৬৭১।১৬৮০।১৬৮২।১৬৮৬।১৬৮৯।১৭০২।১৭১৫।১৭১৬।১৭১৮—১৭২০।১৭২২ ১৭২৫।১৭২৬।১৭২৯।১৭৩৬—১৭৩৮।১৭৪৯।১৭৬৬।১৭৬৭।১৭৭২।১৭৭৫।১৭৭৯।১৮১১।১৮১২। ১৮১৬।১৮১৭।১৮২০।১৮২৩—১৮২৬।১৮৩১।১৮৩৪।১৮৪০—১৮৪২।১৮৪৪।১৮৫০—১৮৫৩।১৮৬৪। ১৮৬৮।১৮৮১।১৮৮৩।১৮৮৪।১৮৯৩।১৮৯৭।১৮৯৮।১৯১৪।১৯১৮।১৯৪৩।১৯৬৯।১৯৭০।২০০৫— ২০০৭।২০১০।২০১৪।২০২৮।২০৪১।২০৪৭।২০৫৯।২০৬০।২০৬২—২০৬৯।২০৯৭।২১১৪।২১২৫। ২১৪৩।২১৪৪—২১৪৬।২১৭৭।২২১৭।২২৬৫।২৩১৫।২৩২০।২৩২২—২৩২৪।২৩২৭।২৩২৮।২৩৩০— ২৩৩৪।২৩৩৬—২৩৪০।২৩৪২।২৩৪৫।২৩৫০।২৩৭২—২৩৭৫।২৩৭৭।২৩৮৪।২৩৯৭।২৪০৩—২৪০৫। ২৪৩৭।২৪৬০।২৪৬৩।২৪৬৬।২৪৭১।২৪৭৪।২৪৭৫।২৪৯৯।২৫১৫।২৫৩১।২৫৪৯।২৫৫৩।২৫৬৮।২৫৭১। ২৫৭৩,২৬০৭।২৬১৪।২৬১৬।২৬৩৩—২৬৩৪।২৬৫৩।২৬৫৫।২৬৫৮।২৬৬০।২৬৬৫।২৬৭০।২৬৭২।২৬৭৫।

২৬৮০।২৬৮২।২৬৮৫।২৬৮৬—২৬৮৮।২৬৯০—২৬৯৪।২৬৯৮।২৭০২।২৭০৩।২৭২৫।২৭২৬।২৭২৯। ২৭৩০।২৭৩৩।২৭৪৮।২৭৫০।২৭৫১।২৭৬৫।২৭৮২—২৭৮৫।২৮৪১।২৮৪৪।২৯০৩।২৯০৫।২৯৫০। *

বাঙ্গালা-সাহিত্যের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব।

সমস্ত পদকর্ত্তৃগণ-মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই যাঁহার স্থান,—যিনি কোন কোন বিষয়ে উক্ত কবিদ্বয় হইতেও শ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ-মধ্যে যিনি প্রায় সর্ব্ববিষয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন, সেই গোবিন্দ কবিরাজই এই—গোবিন্দদাস। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছে—তাহা আলোচনা করিবার স্থল ইহা নহে ;—তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের প্রভাবে, বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে দুইটী কথা বিশেষ বিবেচ্য। প্রথম কথা এই যে, যদিও শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সুমধুর পদাবলী রচনা দ্বারা পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর প্রভৃতি বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রায় সমকালে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের পদাবলির সুধারসে সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন, তাহা প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারেরই ফল। দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ও সুমধুর চরিত্রের রসাস্বাদন করিয়াই বাঙ্গালী জীবন-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রথমে উপলব্ধি করে—ইহার ফলেই "চৈতন্যচরিতামৃত," "চৈতন্যভাগবত," "চৈতন্যমঙ্গল" প্রভৃতির ন্যায় বহু জীবন-চরিত্র গ্রন্থের সৃষ্টি। বস্তুতঃ এই যুগের পদাবলি-সাহিত্য ও জীবন-চরিত্র-সাহিত্য এই দুইটির কোন্‌টি দ্বারা যে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অধিকতর পরিপুষ্টি হইয়াছে—তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত জীবন-চরিত্র-সাহিত্যেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই যুগের বহুসংখ্যক জীবন-চরিত্র-গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিলেও, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যপ্রভু ও তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান পারিষদের চরিত্রই বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের বিবরণ তাহাতে খুব অল্পই দেখা যায়, সামান্য যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতে কোনরূপেই কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না। তবে এ স্থলে ইহাই আমাদিগের প্রধান সান্ত্বনা যে, কবির চরিত্র তাঁহার কাব্যে যেরূপ পরিস্ফুট আর কিছুতেই বোধ হয় সেরূপ নহে ; সুতরাং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের চরিত্র জানিতে হইলে, তাঁহাদিগের অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয় লইতে হইলে, তাঁহাদিগের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সংগ্রহের আশা ছাড়িয়া দিয়া আমাদিগকে গভীরভাবে তাঁহাদিগের কাব্যের মধ্যেই নিমগ্ন হইতে হইবে।

প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী ও জীবন-চরিত সংগ্রহ করার জন্য অনেক মহাত্মাই অনেক গবেষণা ও শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন,কিন্তু "মহাজন-পদাবলী" নামে বিদ্যাপতির পদাবলীর

* এই প্রবন্ধের ব্যবহৃত পদ-সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরু-গ্রন্থের বুঝিতে হইবে।—লেখক।

প্রথম প্রকাশক, সুলেখক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কেহই করেন নাই। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থের সুবিস্তৃত উপক্রমণিকায়, অধিকাংশ বৈষ্ণব-কবিগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা জানা যায়, প্রায় সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক "গৌরপদ-তরঙ্গিণীর" উপক্রমণিকায় গোবিন্দদাসের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিবেন। (গৌ-প-ত ৬২-৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমরা এখানে সেই বিবরণের সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিব।

গোবিন্দদাসের জীবন-বৃত্তের কতিপয় ঘটনা।

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শাকে (কাহার মতে ১৪৪৭ শাকে) তেলিয়া-বুধরীগ্রামে বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে, গোবিন্দের প্রায় অর্দ্ধেক বয়স পর্য্যন্ত তিনি শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখন তিনি ভয়ানক গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় নিজ ইষ্টদেবতা ভগবতীকে স্মরণ করিতেছিলেন—এমন সময়ে—

"আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার।
গোবিন্দ-শরণ লও পাইবা নিস্তার ॥" (ভ-মা)

ইহার বহুপূর্ব্বেই গোবিন্দের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ কৌলিক শক্তি-উপাসনা ত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া গোবিন্দও উক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত আচার্য্যকে নিজালয় বুধরি গ্রামে লইয়া আসার জন্য অনুনয় করিয়া অগ্রজের নিকট পত্র লিখিলেন। রামচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আচার্য্যপ্রভু রামচন্দ্রের সহিত বুধরীগ্রামে গমন করিয়া গোবিন্দকে 'রাধাকৃষ্ণ' চতুরাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে, আচার্য্যপ্রভু গোবিন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পদ-গান শুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ—

"ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব-সিন্ধু রে ॥" (প-ক-ত, ২১৭০ পৃষ্ঠা)

ইত্যাদি পদটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন এবং ইহাই গোবিন্দদাসের প্রথম পদ-রচনা। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ অন্যান্য সুললিত পদাবলির সহিত তুলনা করিলে, এই পদটি তাঁহার প্রথম রচনা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে, কারণ "জনমসৎসঙ্গে" বাক্যটিতে যে শ্রুতি-কটুতা দোষ ঘটিয়াছে, গোবিন্দদাসের পরিণত বয়সের কোন পদে সেইরূপ ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু ঐরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও এই পদটি গোবিন্দদাসের প্রথম উপস্থিত রচনা হইলে, ইহা যে তাঁহার ভাবী কালের অসামান্য কবিত্বের সূচনা করিয়াছিল, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কথিত আছে যে, আচার্য্যপ্রভু কিছুদিন পরে গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করি-

বার জন্য তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন— গোবিন্দদাস সেই পদ এমন সুন্দরভাবে পূরণ করেন যে, আচার্য্যপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া তথায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উক্ত গোস্বামি-প্রভুদিগকে স্বরচিত "সঙ্গীত-মাধব" নাটক ও পদাবলী শ্রবণ করাইলে, তাঁহারা গোবিন্দের অসাধারণ কবিত্বে পরিতুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবু গোবিন্দদাসের কবিত্বের জন্যই "কবিরাজ" উপাধি পাওয়ার আখ্যায়িকাটি প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস তাঁহার কবিত্বের জন্য "কবিরাজ" উপাধি লাভ করার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার অগ্রজ তাদৃশ কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন না হইয়াও "রামচন্দ্র কবিরাজ" নামে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সর্ব্বত্র কথিত হইয়াছেন দেখিয়া, বৈষ্ণকবি গোবিন্দদাসের "কবিরাজ" উপাধিটি বংশগত উপাধি বলিয়াই আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মতে—পদ-কল্প-তরুর উল্লিখিত—

"কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ,
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" (প-ক-ত)

একই ব্যক্তি। 'কবি-নৃপ-বংশজ' বাক্যের অর্থ কবিরাজ-বংশ-জাত। সুতরাং রামচন্দ্র ও গোবিন্দের "কবিরাজ" উপাধিটি বংশগত ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। বৈদ্যবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে, অন্য উপাধিসত্ত্বেও সাধারণ "কবিরাজ" উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন—অদ্যাপি বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ইহা দেখা যায়; সুতরাং গোবিন্দদাসের "কবিরাজ" উপাধিলাভের আখ্যায়িকাটি অমূলক এবং গোবিন্দদাস প্রসিদ্ধ ষট্‌গোস্বামীদিগের ন্যায় বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই—ইহাই আমাদিগের অনুমান হয়।

কথিত আছে যে, নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র ও গোবিন্দদাসের প্রিয়বন্ধু রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গোবিন্দদাস সংস্কৃত 'সঙ্গীতমাধব' নাটক রচনা করেন এবং তৎসময়ে বিদ্যাপতির কোন কোন পদ অসম্পূর্ণভাবে বঙ্গদেশে প্রচারিত হওয়ায়, তিনি সেই সকল পদ পূরণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ করেন। বিদ্যাপতির "প্রেমক-অঙ্কুর, আত জাত ভেল" ইত্যাদি পদটি এইরূপেই পূর্ণ হয়। বিদ্যাপতি ঐ পদের কোন্ অংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দদাসই বা কোন্ অংশ পূরণ করিয়াছেন—তাহা বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ-রচয়িতৃগণ-মধ্যে গোবিন্দদাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইঁহার অনেক পদই বিদ্যাপতির পদ হইতে রচনা-দর্শনে পৃথক্ করা দুঃসাধ্য

গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদের পূরণ।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির যে কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিয়াছেন, তাহাদের ভণিতায়

বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজের নামও সংযুক্ত করিয়াছেন এবং তৎকর্ত্তৃক পদপূরণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর।" (প-ক-ত, ১১৮৭ পৃষ্ঠা)

"মুদিত নয়নে হিয়া ভুজ-যুগে চাপি।"—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটির (প-ক-ত ৭১ পৃষ্ঠা) ভণিতা ; যথা—

"বিদ্যাপতি ভণ মিছ্য নহে ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তহিঁ সাখি॥"

পদ-কল্প-তরু-গ্রন্থে "ভাখি" ও "সাখি" স্থলে "ভাঁতি" ও "সাথী" পাঠ আছে, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার "পদামৃত-সমুদ্রের" টীকায় লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতিরহং মিথ্যা ন ভণামি। ভো গোবিন্দদাস তত্র ত্বং সাক্ষী। অতস্তদনুরাগোঽন্তি নাস্তীতি কথয়েত্যর্থঃ। পক্ষে বিদ্যাপতি-ঠক্কুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাস-কবিরাজেন কৃতমিতি গম্যতে।" (প-স, ১১০ পৃষ্ঠা) রাধামোহন ঠাকুরের গৃহীত পাঠ ও অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। বস্তুতঃ যে পাঠই গ্রহণ করা যাউক না কেন, এই প্রসিদ্ধ পদটিও যে গোবিন্দদাস পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির বহু পরবর্ত্তী লোক সুতরাং উভয়ের একযোগে পদ-রচনা করা অসম্ভব। তবে এই গোবিন্দদাস যদি বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিল কবি হন—তাহা হইলে সেরূপ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ কোন মৈথিল গোবিন্দদাসের পদাবলি বাঙ্গালা বৈষ্ণব কবির পদাবলির সংগ্রহে স্থান পায় নাই—বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলি-সংগ্রহেও এইরূপ যুগল ভণিতাযুক্ত কোন পদ দেখা যায় না ; সুতরাং এস্থলে গোবিন্দদাস পদপূরণের স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও, ইঙ্গিতে তাহাই বুঝাইয়াছেন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সে যাহা হউক, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ২।৩টি অসম্পূর্ণ পদের পূরণ করিয়া থাকিলেও, পদাবলির লেখক কিম্বা গায়কদিগের সহিত পড়িয়া কোন কোন পদের ভণিতায় অকারণেও যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের নাম সংযুক্ত হইয়াছে,তাহা পদ-কল্প-তরুর "ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর" এই প্রসিদ্ধ পদটির (প-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠা) সহিত পদামৃত-সমুদ্রের "সুন্দরি রমণি জনম ধনি তোর" (প-স, ১১১ পৃষ্ঠা) পদটি তুলনা করিলেই প্রতীত হইবে। উক্ত দুইটি পদই বিদ্যাপতির একটি পদের রূপান্তর মাত্র। প্রথম পংক্তিতে দুই একটি শব্দের প্রভেদ ও পদ-কল্প-তরুতে ভণিতার পুর্ব্বে "হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি" ইত্যাদি চারি ছত্র অতিরিক্ত আছে। তারপরে ভণিতা লইয়াই গোলযোগ দেখা যায়। পদ-কল্প-তরুর ভণিতা যথা,—

"এতহুঁ নিদেশ কহল তোহিঁ সুন্দরি,
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।" (প-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠা)

পদামৃত-সমুদ্রের ভণিতা :—

"তাকর অন্তর জলই নিরন্তর
বিদ্যাপতি ভালে জান।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥" (প-স, ১১২ পৃষ্ঠা)

বস্তুতঃ বিদ্যাপতির পদাবলি যে গোবিন্দদাসের প্রিয় ছিল এবং তিনি যে সেই পদাবলির অনুকরণে ও সেই প্রণালী অনুসারেই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন; ইহা তিনি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পদামৃত-সমুদ্রে গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত পদটি দেখা যায়। যথা—

গোবিন্দদাসের উপর বিদ্যাপতির পদের প্রভাব।

"পেখলু অপরুব রামা।
কুটিল কটাখ লাখ শর বরিখান মন বান্ধল বিনু দামা ॥ ধ্রু
পহিল বয়স ধনি মুনি-মন-মোহিনী গজবর জিনি গতি মন্দা।
কনকলতা তনু বদন ভান জনু উয়ল পুনিমক চন্দা ॥
কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি দো কুচ চুচুক মরকত শোভা।
কমল কোরে জনু মধুকর শূতল তাহি বহল মনলোভা ॥
বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল রাধা রসময় কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল যো হেরি লাগয়ে ধন্দা ॥" (প-স, ১০০ পৃষ্ঠা)

এই পদটি বিদ্যাপতির সুপ্রসিদ্ধ—

"অপরুব পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণ-হীন হিম-ধামা ॥"

ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত হইয়াছে এবং কবি "বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল" বাক্য দ্বারা তাহাই জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদ বৈষ্ণবদাসের পদ-কল্প-তরু-গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও, এই পদটী উক্ত গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। রাধা-মোহন ঠাকুর বলেন, ইহাও গোবিন্দকৃত বিদ্যাপতির পদপূরণ। যাহাই হউক, পদটি বিদ্যা-পতির উৎকৃষ্ট অনুকরণ ও পদ-কল্প-তরুতে নাই বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ পদটি উদ্ধৃত করিলাম।

গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণ আর যাহা জানা যায়, তাহা এই যে, তিনি প্রসিদ্ধ খেতুরীর মহোৎসবে সমসাময়িক অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য ও পদকর্ত্তৃগণ-সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোকুলদাস কীর্ত্তনিয়ার মুখে গোবিন্দদাসের পদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া—

খেতুরীর মহোৎসব।

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥" (ভক্তিরত্নাকর)

কথিত আছে যে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদাস মিথিলাদেশের অন্তর্গত বিস্ফীগ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি-মন্দির দর্শন করেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

কথিত আছে, গোবিন্দদাস ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণাপ্রতিপৎ তিথিতে মানবলীলা সংবরণ করেন; সুতরাং তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তি-রত্নাকর" পাঠে জানা যায়, কবি শেষ বয়সে—

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদ-রত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥"

অতএব গোবিন্দদাসের শেষ বয়স যে, পরম শান্তিতে কাব্যালোচনা ও কাব্যরসাস্বাদে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গোবিন্দদাসের জীবন-চরিত্রের ঘটনাবলি এই খানেই শেষ হইল; কিন্তু যিনি শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার পদাবলীর সমালোচনা দুই চারি কথায় শেষ করিলে চলিবে না। তাঁহার পদাবলীর সম্বন্ধে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা এইক্ষণ তাঁহার পদাবলির বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গোবিন্দ-দাসের পদাবলির ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব ইত্যাদির প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিগণের কাব্যের সহিত তুলনা ব্যতীত হইতে পারে না, এজন্য বাধ্য হইয়াই আমাদিগের বক্তব্য সুদীর্ঘ করিতে হইবে। আমরা এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথা বলিব, যাহা উক্ত কবিদ্বয়ের সমালোচনাকালে আর পুনরুক্তি করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অতুলনীয় পদাবলি বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

গোবিন্দদাসের পদাবলীর বিশেষত্ব।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি　　রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে　　মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি অসাধারণ কবিত্ব ও মধুরতার জন্য পূর্ব্বেই সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তারপর তাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য হইয়া তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট অতি প্রিয়তম বস্তু হইয়া পড়িল; সুতরাং গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর উপরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গোবিন্দদাসের প্রকৃতিগুণে উভয় প্রভাব সমান কার্য্যকর হয় নাই। বিদ্যাপতি দুর্ব্বোধ্য মৈথিল ভাষায় পদরচনা করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—ইহা দেখিয়া যদিও গোবিন্দদাসের ন্যায়

বাঙ্গালী-কবির উপরে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক থাকা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু কার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক স্থলেই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ;—এমন কি তিনি যে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই—পক্ষান্তরে তাঁহার উপরে চণ্ডীদাসের অল্পমাত্র প্রভাব থাকিলেও, অনেক স্থলেই তাহা লক্ষ্য করা কঠিন। এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার কারণ কি? আমাদিগের বিশ্বাস গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ জীবন-চরিত্র হইতেই ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। গোবিন্দ কবিরাজের সংস্কৃত-সাহিত্যে নিতান্ত পারদর্শিতা ও প্রৌঢ় বয়সে পদ-রচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের কারণ বটে। গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাপতির সংস্কৃতমূলক মৈথিলভাষা আয়ত্ত করা কঠিন নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে গীতগোবিন্দের মাত্রা-বৃত্তের অনুকরণে যে সকল ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের ন্যায় লঘুগুরুবর্ণের প্রভেদবশতঃ ভাষার সজীবতা ও ছন্দের ঝঙ্কার যেরূপ রক্ষিত হইয়াছে—তাহাতে সংস্কৃত-কাব্য-সুলভ অনুপ্রাসাদি শ্রুতিমধুর শব্দালঙ্কার ও উপমারূপক প্রভৃতি মনোহর অর্থালঙ্কার যেরূপ লক্ষিত হয়, আর কোন ভাষা-কাব্যেই সেইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং আজীবন সংস্কৃত-সাহিত্যে আকণ্ঠ-নিমগ্ন গোবিন্দ কবিরাজ, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ যে চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলির আদর্শে পদ-রচনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? স্বীকার করি যে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সেইরূপ অলঙ্কারের ছটা না থাকিলেও, তিনি তাঁহার সরল ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকার যে সুমধুর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তিনি তাঁহাদিগের মুখ দিয়া প্রেমের যে গভীর উচ্ছ্বাসময়ী উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট—বাঙ্গালা-ভাষার নিকট তাহা অমূল্য; কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষার সেই শৈশব-অবস্থায় বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের অবিমিশ্র স্বাভাবিক বাঙ্গালা ভাষার মাহাত্ম্য বুঝার সাধ্য কাহারও ছিল না ; কোন ভাষার আদি কবির প্রকৃত মাহাত্ম্যই সমকালীন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃত-ভাষার রচনাই অধিক স্বাভাবিক ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রেমাবতার ও বিনয়ের আদর্শ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অন্য কোন ভাষায় তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাক্য না পাইয়া শিখরিণীচ্ছন্দে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অশ্রুজল-প্লাবিত-বদনে গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—"জগন্নাথ-স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।" কিন্তু যেমন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রভাব তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের কোন প্রেমিক ভক্তেরই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই, সেইরূপ স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও পরবর্ত্তী কবিগণের সাধ্যায়ত্ত ছিল না—তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেন অবিমিশ্র বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের এইরূপ বিশুদ্ধ পদাবলীর সংখ্যা খুব অল্প। পদ-কল্প-তরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদাসের ৪৫৯টি পদের

মধ্যে ঐরূপ পদের সংখ্যা ৮।১০টির অধিক হইবে না।, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত পদের ভাষাই বিশুদ্ধ কিম্বা মিশ্র মৈথিলী। ইহাই পরবর্ত্তী সময়ে, চলিত কথায় "ব্রজবুলী" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাব সমস্ত বিষয়েই বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন—ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার পদাবলির ভাষায় ও ভাবে তাঁহার এইরূপ একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও চমৎকারিত্ব আছে, যাহা আমরা রাধামোহন ঠাকুর, বলরাম দাস প্রভৃতি অন্যান্য অনুকরণকারী কবিগণের কবিতায় খুঁজিয়া পাই না। এইখানেই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব; ইহাই তাঁহার কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সফলতা। আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি একটি একটি করিয়া আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষার অনুকৃতি হইলেও, বিদ্যাপতির ভাষার অপেক্ষা তাহাতে সংস্কৃত-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, বিদ্যাপতি তাঁহার স্বদেশের প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ-রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ঐ ভাষার প্রচলিত 'তদ্ভাব' ও 'দেশজ' শব্দের ব্যবহার এবং মৈথিল ভাষার স্বাভাবিক রীতি (idiom) তাঁহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার রচনা স্বাভাবিকতায় তাঁহার স্বদেশীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অন্যদিকে তাহা ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে; সেই জন্যই বিদ্যাপতির পদাবলির স্থানে স্থানে অর্থ-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এত গোলযোগ দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্যাপতির সমকালিক মৈথিল ভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি জানা ব্যতীত, সেই ভাষার 'তদ্ভাব' ও 'দেশজ' শব্দাবলি কিম্বা রচনা-রীতিতে সেইরূপ পারদর্শিতা লাভ করা বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তিনি মৈথিল 'তদ্ভাব' ও 'দেশজ' শব্দের পরিবর্ত্তে যে 'তৎসম' অর্থাৎ সংস্কৃত-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবেন, ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক বোধ হয়। সে যাহা হউক, গোবিন্দদাস এই প্রণালী অবলম্বন করায় এবং তাঁহার পরবর্ত্তী পদকর্ত্তৃগণও পূর্ব্বোক্ত কারণে এই প্রণালীতে পদ-রচনা করায়, তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত 'ব্রজবুলি' বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। সংস্কৃত-ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলে এবং মৈথিল ভাষার কতকগুলি নিয়ম জানা থাকিলে, সহজেই এই ভাষা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। মৈথিল ভাষার নিয়মানুযায়ী কারক ও ক্রিয়া-বিভক্তির এবং অল্প পরিমাণ 'দেশজ' ও 'তদ্ভাব' শব্দের সহিত প্রচুর পরিমাণ সংস্কৃত-শব্দের ব্যবহারে এই যে নূতন লিখিত উপভাষার প্রচলন হয়—ইহাই পরে "ব্রজবুলি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা মৈথিল, হিন্দি, ব্রজভাষা প্রভৃতি উপভাষার ন্যায় কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় নাই।

গোবিন্দদাসের পদাবলির ভাষা।

গোবিন্দদাসের পূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবি এই "ব্রজবুলি"তে পদ-রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক

পদকর্ত্তৃগণ সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা-ভাষায় অধিকাংশ পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ২১১টি পদে কচিৎ ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়। কেবল গোবিন্দদাসের সময় হইতেই পদাবলি-সাহিত্যে আমরা "ব্রজবুলি"র প্রাধান্য দেখিতে পাই, যদিও গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলিতে কোন কোন স্থানে "ব্রজবুলির" ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার "সহজে সুনিক পুতলী গোরি। জাবল বিরহ আননে তোরি।" (প-ক-ত, ৩৭ পৃষ্ঠা) এবং "দেখবি সখি শ্যামচন্দ, ইন্দু-বদনী রাধিকা" (প-ক-ত) ইত্যাদি ব্রজবুলির পদগুলির রচনা ও ভাব বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু এরূপ পদের সংখ্যা নিতান্তই কম। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি-পদের জন্য বিখ্যাত নহেন—তিনি গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুললিত সরল বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের আদর্শে যে পদরচনা করিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসের পদ ছাড়া যে পদের তুলনা সমস্ত পদাবলী-সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই পদাবলির জন্যই জ্ঞানদাস বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যেমন বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস—পরবর্ত্তী যুগে সেইরূপ গোবিন্দদাস আর জ্ঞানদাস ;—যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি; সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ সাম্য ও বৈষম্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত কারণে গোবিন্দদাস কবিরাজকেই পদাবলি-সাহিত্যে ব্রজবুলির প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

গোবিন্দদাসের প্রবর্ত্তিত ব্রজবুলির এই নূতনত্বই একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি তাঁহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত-শব্দ গ্রহণ করায়, জয়দেব প্রভৃতি কবির রচনার ন্যায় তাঁহার রচনা অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্যে অনেক স্থলে এরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে যে, জয়দেবের রচনা ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও সেরূপ লক্ষিত হয় না।

গোবিন্দদাসের অনুপ্রাস-পটুতা।

গোবিন্দদাসের পদ-মাধুর্য্য ও অনুপ্রাসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র ;—সহৃদয় পাঠক তাঁহার যে পদটি বাহির করিবেন, সেই পদেই ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন, তথাপি আমরা কুতূহলী পাঠকবর্গকে পদ-কল্প-তরুর চতুর্থ শাখার ষড়্‌বিংশ পল্লবের ৫।৮।১২।১৩।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গোবিন্দদাসের—

"অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ-থল কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রঞ্জিত-চরণা॥" (প-ক-ত, ১৬৮৯ পৃষ্ঠা)

"মুকুলিত-মল্লী মধুর-মধু মাধুরী
মালতী-মঞ্জুল-মাল।
মন্দ-মকরন্দ- মুদিত-মত্ত-মধুকর
মণ্ডিত-মৌলি-মন্দার॥" (ঐ, ১১৯৯ পৃষ্ঠা)

ইত্যাদি সুমধুর রূপ-বর্ণনা সমূহের তুলনাস্থল কেবল গীতগোবিন্দেই পাওয়া যায়—কিন্তু

গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বুঝি জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের এরূপ কতকগুলি পদ আছে, যাহাতে পদের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই বর্ণের অনুপ্রাস চলিয়াছে। যথা ;—

"কুবলয়-কন্দল- কুসুম-কলেবর
কালিম-কান্তি কলোল।
কোমল-কেলি কদম্ব-করম্বিত
কুণ্ডল কাণ্ড কপোল ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়-কেশি- কংস-করি-কর্ষণ
কেশব কুঞ্চিত-কেশ ॥ ধ্রু।
কুল-বনিতা-কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত
কুসুমিত কুণ্ডল বণ্ড।
কালিন্দী-কমল কলিত-কর-কিশলয়
কৌতুক-কন্দল-কন্দ ॥
কমলা-কেলি কলপতরু কামদ
কামিনী-কোটি-করীন্দ্র।
কৃপণ কৃপা কর কলি-কলুষক্ষয়
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥"

ভাষা ও ভাবের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া এইরূপ অনুপ্রাস-যোজনা করা অন্য কোন কবি করিতে পারিয়াছেন কি? আমরা ২।১টি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী কবি রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ প্রভৃতি অনেকে গোবিন্দদাসের এই সংস্কৃত-বহুল রচনা-পদ্ধতি ও অনুপ্রাসচ্ছটার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু এ বিষয়ে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার নিকটেও আসিতে পারেন নাই। সুতরাং পদ-মাধুর্য্য ও অনুপ্রাস-প্রাচুর্য্যে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির পদাবলি পাঠ করিয়া—তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় যে কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগকে একরূপ হতাশ হইতে হয়। তাঁহার ব্রজবুলির পদাবলির তুলনায় বাঙ্গালা-পদসমূহের সংখ্যা যেরূপ অল্প, রচনা-পারিপাট্যেও তাহারা তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে। গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ আমরা রাধামোহন ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুসারে গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া জানিতে পারিতেছি; তদ্ভিন্ন গোবিন্দ-

গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা পদাবলি।

দাসের ভণিতাযুক্ত অপর বাঙ্গালা-পদগুলি সমস্তই গোবিন্দ কবিরাজের রচিত কি না বলা যায় না ; কিন্তু তন্মধ্যে কয়েকটি যে তাঁহার রচিত, রচনা-প্রণালীদর্শনে তাহা নিশ্চিত অনুমান হয়। আমাদিগের বিশ্বাস যে, গোবিন্দদাস সংস্কৃতবহুল ব্রজবুলি রচনার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেও, তিনি চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা-পদের সরল গাম্ভীর্য্য ও মধুরতার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়াই, চণ্ডীদাসের অনুকরণে ঐ বাঙ্গালা-পদগুলি রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের—

"থীর বিজুরী বরণ গৌরী
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে॥" ইত্যাদি (প-ক-ত, ৫৪ পৃষ্ঠা)

সুমধুর পদটি বোধ হয় পদাবলির প্রায় পাঠকগণেরই কণ্ঠস্থ আছে। গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায় ঐ ধরণের দুইটি পদ দেখুন—

"চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমরা বুলে
তেরছ নয়নে চায়॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘরমু যাইতে নারিনু সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশরি
মধুর মধুর গায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস।
রাতা উৎপল চরণ-যুগল
নিছনি গোবিন্দ দাস॥"

"ঢল ঢল কাঁচা　　অঙ্গের লাবণী
　অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির　　তরঙ্গ হিলোলে
　মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর　　কি খেনে দেখিনু
　ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর　　চিত বেয়াকুল
　কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া　　অঙ্গ দোলাইয়া
　নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাক্ষে　　বিষম বিশিখে
　পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের　　মালাটি গলে
　হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া　　মাতল ভ্রমরা
　ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে॥" (প-ক-ত, ১১৩ পৃঃ) ইত্যাদি

শব্দ চিত্রে গোবিন্দদাসের ক্ষমতা অসাধারণ বলিয়া তিনি এইরূপ বর্ণনায় সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাব-প্রধান রসোদগারের রচনা—

"অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক মুকুট-মণি　　নাগর হইয়া গো
　এত না আদর কেনে করে" ॥ ধ্রু ॥ (প-ক-ত, ৪৯৯ পৃঃ)

ইত্যাদি পদ কোনরূপেই চণ্ডীদাসের ঐ শ্রেণীর পদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলিতে যে সকল সমমাত্রিক ও বিষমমাত্রিক সুমধুর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন—গোবিন্দদাসের পদাবলিতেও প্রায় সেই সমস্তই দেখা যায়,—তাহা ছাড়া দুই একটি নূতন ছন্দও আছে।

প্রথমতঃ—বিদ্যাপতির ষোড়শমাত্রিক চোপাই ছন্দাত্মক "শৈশব-যৌবন দুহুঁ মিলি গেল" ইত্যাদির অনুকরণে লিখিত গোবিন্দদাসের—

"শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জীররবে উনমতি ধাব॥" (প-ক-ত, ৩৫ পৃষ্ঠা)
"সুরত পিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল নয়ানী॥" (প-ক-ত, ৪৫ পৃষ্ঠা)

গোবিন্দদাসের পদাবলির ছন্দ

ইত্যাদি পদগুলির ছন্দ প্রায় বিদ্যাপতির ছন্দের মতই নির্দ্দিষ্ট বটে। এই ষোড়শমাত্রিক চোপাই

ছন্দ হইতেই বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বিশেষরূপে এই ছন্দটির আলোচনা করিব। এই ছন্দটি কোন সময় হইতে ভাষা-সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ চৌহান নৃপতি পৃথ্বীরাজের সভাসদ্ কবিচাঁদ বরদাই স্বরচিত "পৃথ্বী-রাজ-রাসো" নামক গ্রন্থে এই ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন।*

ইহা হইতে প্রাচীনতম কোন ভাষা-কাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং চৌপাই ছন্দের ইহাই প্রাচীনতম প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুলসীদাসের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী রামায়ণের অধিকাংশই এই চৌপাই ছন্দে রচিত। আমাদিগের বিবেচনায় গীতগোবিন্দের,

"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভাবম্॥"

ইত্যাদি কতিপয় ষোড়শমাত্রিক গীতের ছন্দ হইতেই এই হিন্দী ও মৈথিল চৌপাই ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গীতগোবিন্দের "রসিক-প্রিয়া" টীকার কবিতা নৃপতি কুম্ভকর্ণ এই ছন্দটিকে "মাত্রা-চতুষ্পদী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত "চতুষ্পাদী" শব্দের অপভ্রংশ—'চউপই' "চৌপাই" হইয়াছে।

এই মাত্রা চতুষ্পদীর সহিত সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের বর্ণিত পজ্ঝটিকাছন্দের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃত পজ্ঝটিকাছন্দের প্রত্যেক চরণে অক্ষর-সংখ্যার কোন নিয়ম নাই। মোটের উপর চতুর্ম্মাত্রিক গণ বা অংশ বিভাজ্য ষোলমাত্রা ও প্রত্যেক দুই দুইটি চরণে অক্ষরের মিল (rhyme) থাকিলেই হইল, কিন্তু প্রত্যেক চরণের শেষ চারিটি মাত্রা—চারিটি লঘুবর্ণে গঠিত না হইয়া হয় দুইটি গুরুবর্ণ না হয় একটি গুরুবর্ণ ও দুইটি লঘুবর্ণে গঠিত হওয়া আবশ্যক। হিন্দি, মৈথিল ও ব্রজবুলির চৌপাই ছন্দেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। সংস্কৃত পজ্ঝটিকাছন্দটি যে আর্য্যা প্রভৃতি অন্যান্য মাত্রাবৃত্ত হইতে আধুনিক, ইহার প্রমাণ এই যে আমরা কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্যে কুত্রাপি এই ছন্দের

মাত্রাচতুষ্পদী বা ষোড়শমাত্রিক চৌপাই ছন্দ

ব্যবহার পাই নাই। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গরে আমরা ইহার প্রথম ব্যবহার দেখি। মোহমুদ্গরের "মা কুরু ধনজন যৌবনগর্ব্বং" ইত্যাদি শ্লোকগুলি এতই প্রচলিত যে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক, সুতরাং এই শতাব্দীতে কিম্বা তাহার কিছুপূর্ব্ব হইতেই এই ছন্দটি প্রচলিত হইয়াছে, জানা যায়। সংস্কৃত মাত্রাছন্দের অনুকরণে হিন্দী ভাষায় যে দোহা, চৌপাই ইত্যাদি মাত্রাছন্দ প্রচলিত হইয়াছে—তাহাতে একটি গুরুবর্ণ দুইটি লঘুমাত্রার সমান—এই সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের নিয়মটি রক্ষিত হইয়াছে—কিন্তু মৈথিল ভাষাতেই ঐ নিয়মের

* বারাণসীর "মেডিকেল হল" প্রেসে মুদ্রিত, নাগরীপ্রচারিণী-সভা হইতে প্রকাশিত "পৃথ্বীরাজ রাসো" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় "হনি মুনিবচন সোদ মন দিবং।" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কিছু ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির ছন্দে কৃতশ্রম ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলিতে অনেক স্থলে "আকার" "একার" "ওকার" প্রভৃতি গুরুস্বর বর্ণগুলিও লঘুবর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়, দৃষ্টান্তের জন্য আমরা বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে বারধি পাণি।
মৌন করবি পহুঁ করাইতে বাণী॥
যহ হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রণ ঠাট।
কামগুরু হই শিখায়ব পাঠ॥" [(প ক ত ৪৩ পৃষ্ঠা)

এই পদটির প্রথম ছত্রের লঘু গুরু উচ্চারণ ঠিক আছে। দ্বিতীয় ছত্রের "আজু হাম" ও "তোহে" শব্দের সমস্ত দীর্ঘ স্বরগুলি হিন্দির ধরণে গুরু উচ্চারিত না হইয়া বাঙ্গালার ন্যায় লঘু উচ্চারণ করিতে হইবে, নতুবা ছন্দঃপতন অনিবার্য্য। তৃতীয় ছত্র ঠিক আছে। চতুর্থ ছত্রের "হেরইতে" ও "পিয়া' শব্দের দীর্ঘস্বরগুলি হ্রস্ব উচ্চারিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিদ্যাপতির প্রত্যেক পদেই পাঠক এইরূপ স্বেচ্ছাধীন লঘুগুরুবর্ণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলির সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ গ্রিয়ারসন্ সাহেব ও বঙ্গীয় পদাবলির সম্পাদকগণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলি ও তদনুকৃতি বাঙ্গালার ব্রজবুলিতে এইরূপে লঘুগুরুবর্ণের উচ্চারণভেদ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় যে কারণেই হউক—সংস্কৃতানুযায়ী লঘুগুরু উচ্চারণ ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়াছে, দেখা যায়। চৌপাইর সহোদর বাঙ্গালা পয়ার যখন প্রথম প্রচলিত হইল, তখন মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পয়ারের প্রত্যেক চরণের অক্ষরসংখ্যা কচিৎ কম বেশী করা হইত—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে মাত্রার হিসাবে গুরুবর্ণ ও লঘুবর্ণের উচ্চারণ যখন সমান দাঁড়াইল—তখন পয়ারের প্রত্যেক চরণের ষোল মাত্রা পূরণ করিতে হিন্দী ও মৈথিল চৌপদীর অনুকরণে ছন্দের ভঙ্গী রক্ষার জন্য শেষ চারি মাত্রার পরিবর্ত্তে দুইটি দীর্ঘস্বর রাখিয়া বাকি সব মাত্রার পরিবর্ত্তে লঘুগুরু-নির্ব্বিশেষে চারটি অক্ষর—অর্থাৎ মোটের উপর চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারই ঐ পয়ারের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে শেষ দুইটি অক্ষর সর্ব্বদা গুরু থাকারও আবশ্যকতা রহিল না। এই ১৪ অক্ষরী পয়ার এক দিনে হয় নাই—

মাত্রাচতুষ্পদী হইতে পয়ারের উৎপত্তি

ক্রমপরিবর্ত্তনের কালে—সংস্কৃত পজ্‌ঝটিকা ছন্দ হইতে হিন্দি ও মৈথিল চৌ-পাইএর ন্যায় বাঙ্গালা পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য"-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়—সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক হইতে বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি হওয়া অনুমান করিয়াছেন—কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে কোনই আলোচনা করেন নাই। আমাদিগের মতে অক্ষর-বৃত্ত অনুষ্টুপ ছন্দ ও মাত্রা-বৃত্ত প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ারের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্। অনুষ্টুপ ছন্দ হইতে পয়ারের উৎপত্তি কোন মতেই স্থির করা যাইতে পারেনা। অনুষ্টুপ্ ছন্দ হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইলে অনুষ্টুপ ছন্দের ন্যায় পয়ারে ষোলটি কিম্বা অন্ততঃ চৌদ্দটি অক্ষরের সংখ্যা ঠিক থাকিত—কিন্তু কৃত্তিবাস ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের পয়ারে অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা আছে কি? কিন্তু তাই বলিয়া চণ্ডীদাসের—"ভাল হৈল আরে বাবু আই-লা সকালে" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের নিম্নলিখিত পংক্তি গুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি?

"সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥"

ইত্যাদি শ্রুতিমধুর পংক্তিগুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে. নিতান্ত বেতালা লোক ছাড়া অন্য কেহ একথা বলিতে পারেন কি? বস্তুতঃ এখানে উদ্ধৃত ছত্রগুলির অক্ষরসংখ্যা যাহাই থাকুক, তাহাতে মাত্রার পরিমাণ ঠিক থাকায় ছন্দ পতন না হইয়া—উহা নিতান্ত বৈচিত্র সম্পন্ন হইয়াছে। কৃত্তিবাসের সুবিখ্যাত "অঙ্গদ রায়বারের" ছন্দও এইরূপ মাত্রা বৃত্ত বটে আমরা "মাত্রা-ত্রিপদী" ছন্দের প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব।

দ্বাদশ মাত্রিক চৌপাই ছন্দ

একবার ষোড়শ মাত্রিক চৌপাই ছন্দের প্রচলন হইলে সেই দৃষ্টান্তে দ্বাদশ-মাত্রিক চৌপাইও রচিত হইতে লাগিল। যথা,—

বিদ্যাপতির পদাবলিতে—

"এ ধনি কর অবধান।
তো বিনু উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহসে গদগদ ভাষ॥" (প-ক-ত, ৭২ পৃঃ)

গোবিন্দ দাসের যথা,—

"গহন বিরহ গহ লাগি।
রজনী পোঁহায়ই জাগি॥
করতহি তোঁহারি ধেয়ান।
তো বিনু আকুল কান॥" (প-ক-ত, ৭০ পৃঃ)

ষোড়শ ও দ্বাদশ মাত্রাত্মক চৌপাই ছন্দের মিশ্রণে বিষম-পদী চৌপাই হইয়াছে। বিদ্যাপতির যথাঃ—

বিষমপদী চৌপাইছন্দ

"শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধাবি সাধে॥
চাঁদ দিশহি দীনহীনা।
সোপুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা" ॥ ইত্যাদি (প-ক-ত ৭০ পৃঃ)

গোবিন্দদাসের যথাঃ—

"হের ইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস-পরিহাসে হসই না হসই—॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ৬৬ পৃঃ)

এই বিষমপদী চৌ-পাই ছন্দে অযুগ্ম পংক্তিগুলিতে বার মাত্রা ও যুগ্ম পংক্তিগুলিতে ষোল মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়।

আমরা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক চৌপাই ছন্দের উদাহরণ দিয়াছি, ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের ২।১টি দৃষ্টান্ত দিব এবং এই ত্রিমাত্রিক চৌপাই হইতেই যে বাঙ্গালা একাবলি ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইব। যদিও চতুষ্পদী বা চৌপাই ছন্দের চরণ-

ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দ

গুলি চতুর্মাত্রিক চারিটিগণ বা অংশে বিভাজ্য বলিয়াই ঐ ছন্দের নাম প্রথমে চতুষ্পদী বা চৌপাই হওয়া অনুমান হয়, কিন্তু যখন বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক তিনটি গণবিশিষ্ট দ্বাদশ মাত্রাত্মক—ছন্দকেও উপ-যুক্ত নামান্তরের অভাবে চৌপাই নামেই অভিহিত করা হইয়াছে—ত্রিমাত্রিক চারিটি গণে বিভাজ্য, নিম্নলিখিত ছন্দটিকেও আমরা ত্রিমাত্রিক চৌপাইই বলিব। চতুর্মাত্রিক চৌপায়ের রীতি অনুসারে এখানেও শেষ তিনটি মাত্রার স্থলে তিনটি লঘুবর্ণ ব্যবহার না করিয়া চরণের সর্ব্বশেষ বর্ণটির গুরু কি লঘু উচ্চারণ করা ছন্দঃশাস্ত্রকারগণের মতে ইচ্ছাধীন বিধয় দুইটি গুরু বর্ণ কিম্বা একটি গুরু ও একটি লঘু বর্ণে শেষ তিন মাত্রা গঠিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই ত্রিমাত্রিকছন্দের পদ-রচনায় কি বিদ্যাপতি কি চণ্ডী দাস অক্ষরের লঘুগুরু উচ্চারণ প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই লঘুগুরুনির্ব্বিশেষে তিনটি অক্ষর তিন মাত্রা ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কেবল পাশাপাশি দুইটি গুরুবর্ণ ব্যবহার করেন নাই। বিদ্যাপতির ত্রিমাত্রিক ষোড়শ মাত্রাত্মক চৌপাই যথা :—

"আজি কেন তোমার এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা

সঘনে গৃগণে গনিছ তারা।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ১৬৯ পৃঃ)

গোবিন্দদাসের যথা :—

"একলি যাইতে যমুনা-ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া কাটে॥
প্রতিপদ-চিহ্ন চুম্বিয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ৫০৮ পৃঃ)

ত্রিমাত্রিক চৌপাই হইতে একাবলী ছন্দের উৎপত্তি

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দ পরবর্ত্তী সময়ে একাবলী ছন্দনামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির—"আজি কেন তোমায় এমন দেখি।" ইত্যাদির ছন্দের সহিত ভারতচন্দ্রের—"একি লো মালিনি কি তোর রীতি" ইত্যাদি বিদ্যার সুমিষ্ট ভৎর্সনার ছন্দের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তবে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্যবহৃত ছন্দে আমরা সর্ব্বত্র ষষ্ঠ ও নবম অক্ষরের পর যতি অর্থাৎ ৬ + ৩ + ২ = ১১ অক্ষর দেখিতে পাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের একাবলীতে ৬ + ৩ + ২ = ১১ অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন পংক্তিতে ৬ + ২ + ৩ = ১১ + কিম্বা ৫ + ৪ + ২ = ১১ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়, যথা,—

"নহে মাজা ক্ষীণ কুচ কঠোর।"
"সুন্দর পড়িল প্রেম-তরঙ্গে॥" বিদ্যাসুন্দর।

নিয়মের কঠোরতার পরিবর্ত্তে শিথিলতার দিকে গতিই অপভ্রংশভাষা ও ছন্দ আদির উৎপত্তির মূলসূত্র বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন, সুতরাং এস্থলেও সেই সাধারণ নিয়মের ক্রিয়া বশতঃই যে ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের ষষ্ঠ ও নবম অক্ষরের শেষের যতিটি উঠিয়া যাইয়া উহা বর্ত্তমান একাবলীছন্দে পরিণত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা দ্বারা ঐ ছন্দ অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের স্বাভাবিক গতি ও মাধুর্য্যের যে হানি হইয়াছে, তাহা উভয়বিধ ছন্দের কবিতা পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে। নবম অক্ষরের পর যতির অভাব বরং কথঞ্চিৎ সহনীয়, কিন্তু ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি না দিয়া পঞ্চম অক্ষরের পর যতি দেওয়ায় "মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে" চরণটি যে কিরূপে শ্রুতিকটু হইয়াছে, তাহা কেবল অনুভব দ্বারাই জ্ঞেয় বটে।

তোটকছন্দ

গোবিন্দদাস আরও এক প্রকার ষোড়শ মাত্রিক ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ 'তোটক ছন্দ'। তোটকে ও মাত্রা চতুষ্পদীর ন্যায় প্রত্যেক চরণে চারিটি চতুর্মাত্রিক গণে বিভাজ্য ষোল মাত্রা আছে কিন্তু ইহার সকল চতুর্মাত্রিকগণ বা অংশগুলিই দুইটি লঘুবর্ণ ও পরে একটি গুরুবর্ণ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ইহার অক্ষরসংখ্যা ৩×৪=১২ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহা ছন্দঃশাস্ত্রে অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে লঘুগুরুভেদে

অক্ষর বিন্যাস ব্যতীত তোটক ছন্দ হইতে পারে না। ব্রজবুলীতে প্রায় সর্ব্বত্র অক্ষরের লঘুগুরু ভেদ রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং তোটকছন্দটি ব্রজবুলীর পক্ষে নিতান্ত অনুকূল সন্দেহ নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পদাবলি-সাহিত্যে তোটক ছন্দের দৃষ্টান্ত অধিক নাই, আমরা বিদ্যাপতির পদাবলিতে তোটকছন্দ খুঁজিয়া পাই নাই। পদকল্পতরুর সংগৃহীত গোবিন্দদাসের সাড়ে চারিশতের অধিক পদাবলির মধ্যে আমরা একটি মাত্র তোটক ছন্দের পদ পাইয়াছি। এই পদের অনেক স্থলেই তোটকের নিয়মানুযায়ী লঘুগুরু উচ্চারণের ব্যতিক্রম দেখা যায়। গোবিন্দদাসের ন্যায় সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে সামান্য একটি তোটকছন্দের রচনায় অজ্ঞতাবশতঃ ভুল করিবেন, ইহা অসম্ভব, সুতরাং লিপিকরদিগের দোষে ঐ পদটিতে অনেক অশুদ্ধিপ্রবেশ করিয়াছে, কিম্বা ব্রজবুলীতে ঠিক সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবর্ণের লঘুগুরু উচ্চারণ বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় গোবিন্দদাস ইচ্ছা করিয়াই উচ্চারণবিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা এই উভয় বিধ কারণই এস্থলে কার্য্যকর হইয়াছে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত গত্যন্তর দেখা যায় না।

ঐ পদটি হইতে লিপিকরদিগের লিখার দোষ এবং গোবিন্দদাসের সময়ের উচ্চারণপদ্ধতি নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে, এজন্য আমরা সম্পূর্ণ পদটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ধনী কানড়া ছান্দে বাঁধে কবরী।
নব মালতী মাল তাহে উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
থেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥
ধনি সিন্দুর বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তহিঁ নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাণ্ড পাতা।
ভুরু ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজরশোভিত নীল ছটা ॥
তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনী সুন্দর শারদ ইন্দু-মুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্ব লখি ॥
গলে মোতিম হার সুরঙ্গ মালা।
কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তহিঁ অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥

ক্ষীণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিনী জানু হেমকদলী॥
পদ পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি-মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা॥
নখ-চন্দ্র ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তহি পরণাম॥"

প্রথম পংক্তির 'কানড়া' সম্ভবতঃ 'কানড়' ছিল। লিপিকর দোষে "কানড়া" হইয়াছে। কবরীর উপমা-স্থল 'কানড়' সর্প-বা পুষ্পবিশেষ, যাহাই হউক না কেন—পদাবলি-সাহিত্যে 'কানড়া' ও "কানড়" উভয় পাঠই দেখা যায়। 'কানড়া' যথা :—

"কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে" (প-ক-ত ৫৮২ পৃঃ)
"কানড় কুসুম হেরি শচী নন্দন
করতলে মুখশশী আপি।" (প-ক-ত ১১৭ পৃং)

কানড়া যথা :—

"কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে।" (প-ক-ত-১৫৪ পৃঃ)

এখানে 'কানড়' না হইয়া 'কানড়া' হইলে ছন্দঃপতন হয়, সুতরাং 'কানড়'শুদ্ধ পাঠ জানা যাইতেছে।

সেইরূপ প্রথম পংক্তির 'ছান্দে' শব্দের স্থলে 'ছান্দ' শুদ্ধ পাঠ জানা যাইতেছে—কারণ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তির 'একার' হিন্দী; মৈথিল ও ব্রজবুলীতে এমনি অনেক সময়ে লোপ হইতে দেখা যায়—ছন্দের জন্যত কথাই নাই। লিপিকারগণ বোধ হয় তাহা অশুদ্ধ ভাবিয়া 'একার' যোগ করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ 'একার' যোগ করায় উদ্ধৃত পদটির নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ছন্দঃপতন ঘটিয়াছে। যথা—

'খেনে উচ্চ বৈঠে তাহে ভ্রমরা' স্থলে হইবে 'খন উঠত বৈঠ তহিঁ ভ্রমরা'। 'তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া' স্থলে হইবে 'তঁহি অঙ্গ সুলেপন গন্ধ চুয়া'। 'পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা' স্থলে হইবে "পদ পঙ্কজপাশ শুভে আলতা" ইত্যাদি ইত্যাদি।

'খেনে,' 'বৈঠে', 'অঙ্গে' ও 'পাশে' শব্দগুলির স্থলে 'খন' 'বৈঠ' 'অঙ্গ' ও 'পাশ' শব্দের প্রয়োগ যে অশুদ্ধ নহে তৎসম্বন্ধে পদাবলি-সাহিত্য হইতে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ লিপিকারদোষে তহিঁ স্থলে 'তাহে' 'খিন' স্থলে 'ক্ষীণ' লিখিত হওয়ায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ চরণে ছন্দঃপতন হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য ভুলগুলিও প্রায় সমস্তই লিপিকারদোষে সংঘটিত হইয়াছে। বাহুল্যবশতঃ আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না।

মাত্রা চতুষ্পদী বা চৌপাই ছন্দের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া আমরা এক্ষণ গোবিন্দ দাসের

মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে গোবিন্দদাসের পয়ারছন্দের ২।১টি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

চণ্ডীদাসের পয়ার যেমন চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে, গোবিন্দদাসের পয়ারও সেই রূপ বটে ;—তবে চণ্ডীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসে চৌদ্দ অক্ষরী নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক কম দেখা যায়।

"গোলক ছাড়িয়া পহু কেন বা অবনী।
কালারূপ কেন হল গোরাবরণ খানি ॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহু কান্দে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফান্দে ॥" (প-ক-ত-১৫৭৮ পৃঃ)

ইত্যাদি পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৫ অক্ষর ও তৃতীয় পংক্তিতে ১৩ অক্ষর আছে দেখা যায়—কিন্তু উভয় স্থলেই চৌপাই এর নিয়মানুযায়ী মাত্রা ঠিক আছে—সুতরাং ছন্দঃপতন বা শ্রুতিকটুত্ব ঘটে নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিলে চৌপাই ছন্দ হইতে বর্ত্তমান পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারেনা।

বাঙ্গলা অক্ষর-বৃত্তের নিয়মানুযায়ী দশঅক্ষরী পয়ার ও গোবিন্দদাসের পদাবলিতে দৃষ্ট হয় যথা :—

গোবিন্দের দশ অক্ষরী পয়ার।

"এই ত বিরিদা-বন পথে।
নিতি নিতি করি গতায়াতে ॥
হাতে ধরি লই যাই সোণা।
তুমি কে না কহে কোন জনা ॥" ইত্যাদি (প-ক-ত-৯৭৪ পৃঃ)

মাত্রা ত্রিপদীছন্দের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে এই ত্রিপদী নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ছন্দটিও যে খুব প্রাচীন তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতকবিগণের কাব্যে এই ছন্দের কোন ব্যবহার দেখা যায় না।

মাত্রাত্রিপদীছন্দ।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের "ললিত-লবঙ্গ-লতা পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরে" "চন্দন-চর্চ্চিত-নীল কলেবর-পীত-বসন বনমালী" "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহরবেশং" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ সুমধুর গীত-সমূহে আমরা সর্ব্ব-প্রথমে এই ছন্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এই ত্রিপদী মাত্রা অনুসারে গঠিত বলিয়া অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা নাই এবং মাত্রা অনুসারে বিভাগ করিলে অনেক স্থলেই শব্দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না বলিয়া বাঙ্গলা ত্রিপদীর নিয়মানুসারে পংক্তিগুলি তিন থাকে লিখিত না হইয়া এক থাকে কিম্বা দুই থাকে লিখিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে "ললিত লবঙ্গ-লতা" ইত্যাদি পংক্তিটি গ্রহণ করা যাউক। মাত্রা অনুসারে এই পংক্তিটি তিন থাকে লিখিতে গেলে এইরূপ হয়, যথাঃ—

"ললিত লবঙ্গ-

লতা-পরিশীলন
কোমল-মলয়-সমীরে।"

এই ভাবে লিখিলে শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অর্থ-প্রতীতির নিতান্ত ব্যাঘাত করে। কিন্তু মাত্রা-ত্রিপদী যে চতুর্মাত্রিক সাতটি গণ বা অংশ বিভাজ্য তাহার চারিটি গণের পরে অর্থাৎ ষোল মাত্রার শেষে সর্ব্বত্র যতি থাকায় এই পংক্তিগুলি দুই থাকে স্বচ্ছন্দে লিখা যাইতে পারে। যথা—

"ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন
কোমল-মলয়-সমীরে।" ইত্যাদি

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বিনা প্রয়োজনে পরবর্ত্তী ত্রিপদীর পংক্তিগুলি তিন থাকে লিখা হয়নাই। আমরা গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে, জয়দেব তাঁহার মাত্রা-ত্রিপদীতে কোন কোন স্থলে প্রত্যেক চরণের অংশগুলির মধ্যে মিত্রাক্ষর (Rhyme) ব্যবহার করিয়াছেন যথা-

"রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে
মদন-মনোহর-বেশং।"

বলাবাহুল্য যে এরূপস্থলে পংক্তিটি তিন থাকে লিখিত হইলেই পড়িবার ও দেখিবার পক্ষে ভাল হয়; কিন্তু সংস্কৃতরচনায় এইরূপ মিত্রাক্ষরযোজনা করা নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় জয়দেবের কোন গীতেই আগাগোড়া এইরূপ মিত্রাক্ষর রক্ষিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে গীতগোবিন্দের

"সমুদিত-মদনে রমণী-বদনে
চুম্বন-বলিতাধরে।
মৃগমদ-তিলকং লিখতি সপুলকং
মৃগমিব রজনীকরে॥"

ইত্যাদি গীতটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মাত্রা ত্রিপদীর আটটি কলিতেই মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু জয়দেবের ন্যায় কবিও হীন-মিলন ছাড়াইতে পারেন নাই। যথা—

"মনিসর মমলং তারক-পটলং"
"ঘনচয় রুচিরে রচয়তি চিকুরে"
"মরকত-বলয়ং মধুকর-নিচয়ং" ইত্যাদি।

জয়দেবের অনুকরণে বিদ্যাপতি যে মাত্রা ত্রিপদী ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে মিত্রাক্ষরতা রক্ষার জন্য সমধিক চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও তাহার অভাবই সাধারণ নিয়ম বটে। গোবিন্দদাসের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, যেমন মাত্রা-চতুষ্পদীর শেষ চারিমাত্রাস্থলে চারিটি লঘু বর্ণ ব্যবহার না করিয়া প্রায় সর্ব্বত্র দুইটি গুরুবর্ণ এবং কচিৎ একটি গুরু ও দুইটি লঘুবর্ণ ব্যবহার করিতে দেখা যায়, মাত্রা-ত্রিপদীতে তাহা অবিকল দৃষ্ট হয়। কিজন্য যে সংস্কৃত মাত্রা-চতুষ্পদী ও মাত্রা ত্রিপদীর প্রত্যেক পংক্তির

শেষ চারিমাত্রার সম্বন্ধে এই নিয়মের সৃষ্টি হয় তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গরের ব্যবহৃত পদ্ঝটিকা কিম্বা জয়দেবের ব্যবহৃত মাত্রা-চতুষ্পদী সর্ব্বত্রই দুই দুইটি পংক্তির শেষে মিত্রাক্ষরতা দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের সনাতন নিয়ম "নাপদং প্রযুঞ্জীত" অর্থাৎ বিভক্তি ছাড়া শব্দ প্রয়োগ করিবে না। অধিকাংশ সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দ প্রথমা বিভক্তিতে 'ং' 'ঃ' যুক্ত, "আকারান্ত" কিম্বা "ঈকারান্ত" হয়—বিশেষণ শব্দের বিভক্ত্যন্ত রূপ সেইরূপ। 'ং' 'ঃ' যুক্তবর্ণ, আকারান্ত ও ঈকারান্তবর্ণ ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'গুরু' বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং চারিমাত্রার মধ্যে একটি গুরুবর্ণ দুইমাত্রা পরিমিত হইলে বাকী দুই মাত্রাস্থলে একটি গুরুবর্ণ কিম্বা দুইটি লঘুবর্ণ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমে ব্যাকরণের নিয়মরক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকিলেও ক্রমে তাহা অভ্যাসবশে নিয়মে পরিণত হওয়ায় শ্রুতিমধুর বোধ হয় এবং কোনস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কর্ণপীড় উৎপাদন করে, এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না; বস্তুতঃ, যে কারণেই এই নিয়ম প্রচলিত হউক না কেন, জয়দেবের মাত্রা ত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত মৈথিল মাত্রা-ত্রিপদী ও হিন্দী 'সবাই' ছন্দেও এই নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে; এবং সেই দৃষ্টান্তেই যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ত্রিপদীর শেষ চতুর্ম্মাত্রিক গণটি দুইটি বর্ণদ্বারা গঠিত হওয়ার নিয়মে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মাত্রা-ত্রিপদীর প্রতিচরণে অক্ষর-সংখ্যার স্থিরতা নাই—মোটের উপর আটাইশ মাত্রা হইলেই হইল।

বাঙ্গালা ছন্দে বর্ণের লঘু গুরু ধর্ত্তব্য নহে—সুতরাং ২৮ মাত্রায় ২৮টি অক্ষর ধরিয়া দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ৮+৮+১২=২৮ অক্ষর ব্যবহৃত দেখা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে উহা তিন থাকে লিখা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা কবি চণ্ডীদাস প্রভৃতির দীর্ঘ-ত্রিপদী-ছন্দের আলোচনা করিলে বর্ত্তমান সময়ের নির্দ্দিষ্ট ২৮ অক্ষরস্থলে কচিৎ কম বেশীও দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন পয়ারে কম বেশীর ন্যায় মাত্রা শুদ্ধ বলিয়া তাহা ছন্দোভ্রষ্ট বা শ্রুতি-কটু নহে। ছন্দের অক্ষরের এই কমী বেশীর জন্য প্রাচীন কবিদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া কৃতজ্ঞ হওয়াই সঙ্গত—কারণ এই কমী বেশীই বাঙ্গালা ছন্দের আকারের দিকে যেন অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আমাদিগের মনোযোগ পরিচালিত করিতেছে। মাত্রা-ছন্দ হইতে বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা মৈথিল "মাত্রা-ত্রিপদী" ও হিন্দি 'সবাই' ছন্দের ২।১টি উদাহরণ দেখাইয়া গোবিন্দ-দাসের নানাবিধ ত্রিপদীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বিদ্যাপতির মাত্রা-ত্রিপদী যথা,—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সকল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল আনন্দা॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ১৪০৪)

ধুয়ার গঠনে একটু বিশেষত্ব আছে। তাহাতে চারি চরণের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্রই গীতগোবিন্দের অনুকরণে তিনটি চরণ দেখা যায়।

গীতগোবিন্দের ধুয়া যথা,—

"বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি
বিরহি-জনস্ত দুরন্তে ॥"

বিদ্যাপতির ধুয়া ;—

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা-সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দই গেল ॥" (প-ক-ত ১৪৫ পৃষ্ঠা)

গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণও প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রণালীরই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ত্রিপদী যথা ;—

"বিদ্যাপতি-পদ-যুগল-সরোরুহ
নিস্যন্দিত-মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে কর অনুবন্ধে ॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয় ॥ ধ্রু ॥" (প-ক-ত ৯পৃষ্ঠা)

জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলিতে চতুর্মাত্রিক অষ্টাবিংশ মাত্রাত্মক ত্রিপদীই অধিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অন্যবিধ বিচিত্র বিচিত্র মাত্রা-ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। জয়দেবের ত্রিপদীছন্দ সুবিখ্যাত—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দর-তিমিরমতি ঘোরং।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥"

ইত্যাদি গীতের তিন থাকে লিখিত চরণের মোট ৩৪টি মাত্রা ও তাহার নিম্নলিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয় যথা— ২+৩+২+৩ ২+৩+২+৩
২+৩+২+৩+২+২

শেষের চারিমাত্রা কিন্তু সেই দুটি গুরুবর্ণেই ঘটিত বটে। চতুর্মাত্রিকগণের পরিবর্ত্তে এইরূপ ঝাঁপতালের ন্যায় ছন্দে পঞ্চমাত্রিকগণ ব্যবহৃত হওয়ায় এই গীতের ছন্দটি কিরূপ চমৎকার বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে, তাহা ছন্দোজ্ঞ পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

বিদ্যাপতির উদ্ভাবিত ২।১টি নূতন ছন্দও অতি সুন্দর। একটির নমুনা দেখুন—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥ধ্রু।
ঝঞ্ঝা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর-শর হন্তিয়া ॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ১২৪৮ পৃষ্ঠা)

এই মাত্রাত্রিপদীর ধুয়া ছাড়া অন্যান্য কলিতে তিন থাকে লিখিত চরণে মোটে ২৫ মাত্রা ও তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয়।—

৩+৪ ৩+৪
৩+৪+৪

ইহার শেষ চারিমাত্রা আগে একটি গুরু ও পরে দুইটি লঘুবর্ণ দ্বারা গঠিত। ইহাতে শেষ চারি মাত্রা ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ তেওড়া তালের ন্যায় লয় প্রতীত হয়।

গোবিন্দদাসের নিম্নের পদটি প্রায় ইহার অনুরূপ, কেবল শেষ চারিমাত্রাস্থলে দুইটি গুরুবর্ণ আছে যথা—

"পরখি পেখলুঁ পুরুষ-উত্তম
পুরুষ পাহুন জাতি।
প্যারি পামরী পিরিতি দারকে
পৈঠ পতঁগক ভাতি ॥" (প-ক-ত ১২৫১ পৃঃ)

বিদ্যাপতির পদাবলিতে মাত্রা ত্রিপদী ব্যতীত প্রচলিত বাঙ্গালার ২৮টি অক্ষরী দীর্ঘ-ত্রিপদী দেখা যায় না, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে চণ্ডীদাসের অনুকরণে ২৮ অক্ষরী দীর্ঘ-ত্রিপদীও দৃষ্ট হয়, কিন্তু এস্থলেও ধুয়াতে চারি চরণের পরিবর্ত্তে তিনটি চরণই প্রায়শঃ পাওয়া যায় যথা ;—

গোবিন্দদাসের দীর্ঘত্রিপদী—

"এইত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে বড় দুঃখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে ॥ ধ্রু।

আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
ফুলতুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস-পরিপাটীর কারণে॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ১২০৮ পৃঃ)

গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দের এই পদটী একাধারে সরল ভাষা ও গভীর ভাবের জন্য প্রশংসনীয়। এই পদের আর একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কবি খাটি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে যাইয়াও যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই "রহল" "বিহরই" "বিছায়ই" প্রভৃতি ব্রজবুলি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন ; "কেলিকৌতুক রঙ্গে" ও শেজ "বিছায়ই" বাক্য-দ্বয়ে অক্ষরের একটি দীর্ঘস্বরের মাত্রা দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালা দীর্ঘত্রিপদী যে মাত্রা-ত্রিপদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ?

ত্রিমাত্রিক ত্রিপদী

মাত্রা ত্রিপদী ও তদুৎপন্ন দীর্ঘ-ত্রিপদীর পরেই ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী ও তদুৎপন্ন বাঙ্গালা লঘু-ত্রিপদীর উল্লেখ করা সঙ্গত। মৈথিল ও ব্রজবুলির মাত্রা ত্রিপদীর সহিত বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদীর যে সম্বন্ধ-মৈথিল ও ব্রজবুলির ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদীর সহিত বাঙ্গালা লঘু ত্রিপদীরও অবিকল সেই সম্বন্ধ।

বিদ্যাপতির ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী যথা—

"সজনি না বোল বচন আন।
ভাল ভাল হাম অলপে চিহ্নলু
যৈছন কুটিল কান॥ ধ্রু।
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনক কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর॥"

ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের ন্যায় ত্রিমাত্রিক ত্রিপদীতেও প্রায়শঃই লঘুগুরুবর্ণের পার্থক্য আদৃত হয় নাই। এই রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে যে, এই ছন্দের ত্রিমাত্রিক অংশ-গুলির জন্য সর্ব্বত্র তিনটি লঘু বর্ণযুক্ত কিম্বা একটি গুরুবর্ণ ও একটি লঘুবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন,অতএব মৈথিল ও ব্রজবুলিতে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনেক পরিমাণে ইচ্ছাধীন বলিয়া বর্ণের লঘুগুরুত্ব বিচার না করিয়া তিনটি মাত্রার স্থলে তিনটি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, যে কারণেই বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব উপেক্ষিত হউক না কেন, "কাঠ কঠিন কয়ল মোদক" ইত্যাদি

ত্রিমাত্রিক ত্রিপদী হইতে লঘু ত্রিপদীর উৎপত্তি

পংক্তিতে "কাঠ" শব্দের দুইটি অক্ষরে তিনটি মাত্রা ধরা হইয়াছে দেখিয়া এই ত্রিপদীর উৎপত্তি ও যে—ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী হইতেই হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষায় নিয়মানুযায়ী

সুললিত লঘু ত্রিপদী ছন্দ-রচনায় যিনি বিগত পাঁচশত বৎসরমধ্যে কাহারও নিকটে পরাস্ত হইবেন না, বাঙ্গালা কবিতাকুঞ্জের সেই কল-কণ্ঠ-কোকিল চণ্ডীদাসও সেইরূপ বিশ অক্ষরী লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতা রচনা করিতে যাইয়া যেন অজ্ঞাতসারেই লিখিয়া বসিয়াছেন—

"ধীর বিজুরী　　বরণ গোরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে　　কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে॥" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, সুমধুর লঘু ত্রিপদীর "ধীর" "গোরী" "ছান্দে" ও "বান্ধে" শব্দগুলিতে প্রথম অক্ষরটি গুরুবর্ণ বলিয়া দুই মাত্রা ধরায় ও "গোরী" "ছান্দে" ও "বান্ধে" শব্দের শেষের "ঈকার" ও "একার" স্বেচ্ছাক্রমে লঘু অর্থাৎ একমাত্রাপরিমিত গণ্য করায় ছন্দোভঙ্গ না হইয়া বরং তদ্দারা ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের "ধীর বিজুরী" ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত গোবিন্দদাসের—

"চিকণ কালা　　গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে　　ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায়॥"

ইত্যাদি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদটিতেও ঠিক ঐরূপ কোন স্থলে অক্ষর-সংখ্যার ও কোন স্থলে মাত্রার প্রতি সমাদর দেখা যায়। কেহ মনে করিবেন না যে, এটি প্রচলিত ২০ অক্ষরী লঘুত্রিপদী নহে, ১৮ অক্ষরী কোন নূতন রকম লঘুত্রিপদীছন্দঃ হইবে, কারণ প্রথম কলিতে মাত্রার হিসাবে ১৮ অক্ষরের ব্যবহার হইয়া থাকিলেও অন্যান্য কলিতে প্রচলিত ২০ অক্ষরের প্রয়োগ দেখা যায় যথা:—

"চাঁদ ঝলমলি　　ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া　　মধুর বাঁশরী
মধুর মধুর গায়॥" ইত্যাদি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, চণ্ডীদাসের বহুসংখ্যক লঘুত্রিপদীর পদে আধুনিক নিয়মিত অক্ষর-সংখ্যার ব্যতিক্রম দেখা যায় না—কৌতূহলী পাঠক পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার তৃতীয় পল্লবের ৬।৭।৮।১০।১১ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যবিষয়ক অপূর্ব্ব পদগুলি পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা পদের সংখ্যাই অল্প, আবার তাহাতে পয়ার দীর্ঘত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহারবশতঃ বাঙ্গালা লঘু ত্রিপদী পদের সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তথাপি আমরা তাঁহার দুই তিনটি পদে আধুনিক অক্ষর-সংখ্যার কোন ব্যতিক্রম পাই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার

"এই মনে বনে দাসী হইয়াছে
ছুইতে রাধার অঙ্গ।" ইত্যাদি (প-ক-ত ৯৭৫ পৃঃ)

"কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।'" ইত্যাদি (প-ক-ত ৫০৬ পৃষ্ঠা)

গোবিন্দদাসের লঘুত্রিপদী

পদ দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গোবিন্দদাসকে পদাবলির প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যাপতির ছন্দের অনুসরণ করিতেই দেখিয়াছি, কিন্তু গোবিন্দদাসের ন্যায় শক্তিশালী কবি কেবল উত্তম অনুকরণ করিতে পারিয়াই সন্তুষ্ট থাকা সম্ভবপর নহে, তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি প্রাচীন মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের ২৮ মাত্রার স্থলে চারিমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ঐ ছন্দের নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন যথা ;—

"অরুণিত চরণে রণিত মণি-মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল-মিলিত-ললিত-বনমাল ॥" (প-ক-ত ১৬৯৭ পৃঃ)

গোবিন্দদাসের উদ্ভাবিত নূতন মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দ

যেরূপ ২৮ অক্ষরী মাত্রা ত্রিপদী হইতে বর্ত্তমান ২৬ অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদীর উদ্ভব, তদ্রূপ এই ৩২ অক্ষরী মাত্রা-ত্রিপদী হইতেই বর্ত্তমান ৩০ অক্ষরী দীর্ঘত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

এই ৩০ অক্ষরী বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দটি ভাববিস্তারের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বর্ত্তমান যুগে বহুলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহার জন্য আমরা গোবিন্দদাসের নিকট ঋণী। ৩০ অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত যথা ;—

"বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত সুধার পূরে নন্দন-কাননে,
কুসুম-কুল-কামিনী কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদনে।"

(মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য।)

আমরা গোবিন্দদাসের অনেকগুলি ছন্দের আলোচনা করিয়াছি, এইবার তাঁহার চৌপদী ছন্দের কথা বলিলেই গোবিন্দের ছন্দ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে।

চৌপদী ছন্দ যদিও নানা প্রকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্যে দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী এই দুই রকম চৌপদী ছন্দই পরবর্ত্তী সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট ভারতচন্দ্রের সুমধুর চৌপদীর মাধুর্য্য অজ্ঞাত নহে, বস্তুতঃ তাঁহার—

"নয়ন অমৃতনদী, সতত চঞ্চল যদি
নিজ পতি বিনা কভু অন্য দিকে চায়না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাপি অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥" (রসমঞ্জরী)

চৌপদী ছন্দ।

ইত্যাদি স্বীয়া নায়িকার মধুর বর্ণনা প্রেমিকা স্বীয়া নায়িকার মত রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চিত্ত হরণ করে। সুন্দরকে বর্দ্ধমানে বকুলতলায় দর্শন করিয়া রসিকা পুর-নারীগণ যে সুকোমল আবেগ-ময়ী ভাষায় মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ সেই সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করার জন্য মলিন। চিত্ত-বৃত্তি গুলির ব্যাকুল বাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহার এইরূপ অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলিলেও এখানে আমরা সেই নাগরীগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের সুরুচি-প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিবাদ বাঁধাইব না। কিন্তু চণ্ডীদাসের ২।৪টি পদের কথা ছাড়িয়া দিলে উহা অপেক্ষা অধিক সুললিত ও কোমল কবিতা সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্যে আর আছে কি না আমরা বলিতে পারি না। এই দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী ছন্দ বঙ্গ সাহিত্যে কাহার কর্ত্তৃক প্রথমে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয় বলা কঠিন। কিন্তু কিরূপে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, সেই প্রাচীন মাত্রা চতুষ্পদী বা চৌপাই হইতেই ৩২ মাত্রার ত্রিপদী ও ঐ ত্রিপদী হইতে ৩১ মাত্রার চৌপদী ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কথাটি একটুকু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। গোবিন্দদাসের একটি পদের প্রথম চারি পংক্তি যথা ;—

"জয় জয় জগজন-লোচন-ফান্দ।
রাধারমণ বৃন্দাবনচান্দ ॥
অভিনব নীল জলদতনু-ঢলঢল ॥
পিঞ্ছ-মুকুট-শিরে সাজনিরে।
কাঞ্চন-বসন, রতন-ময় আভরণ—
নূপুর রণরণি-বাজনিরে ॥" ৯

একটু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে যে, এই পদের ধুয়াটি চৌপাই ছন্দে ও কলিটি মাত্রা ত্রিপদী ছন্দে গঠিত হইলেও চৌপাই ছন্দের ধুয়াটির মিত্রাক্ষর (Rhyme) বর্জ্জন করিলে এবং ত্রিপদীর কলির শেষের দুইটি 'রে' শব্দের মাত্রা একটি দীর্ঘবর্ণের পরিমাণ (বাঙ্গালা ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষরের পরিমাণ) বাড়াইলেই এই চৌপাই ও ৩২ মাত্রার ত্রিপদীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই প্রণালীতে চৌপাইএর ৪টি পংক্তি ছন্দ ভাঙ্গিয়া লিখিলেই ত্রিপদীর ৪ পংক্তি হইবে। গোবিন্দদাসের—

"অরুণিত চরণে রণিত মণি-মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥"

ইত্যাদি পদে আমরা ৩২ মাত্রাত্মক ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। এক্ষণ যদি এই ছন্দের আরও একটু নূতন ভঙ্গী দেওয়ার জন্য শেষের মিত্রাক্ষর শব্দ দুটি হইতে মাত্রার হিসাবে একটি গুরুবর্ণ কিম্বা বাঙ্গালা ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষর উঠাইয়া লওয়া হয় এবং বাঙ্গালায় রীতি

অনুসারে অংশগুলির মধ্যেও মিত্রাক্ষরতা রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে এই ত্রিশ মাত্রাত্মক ত্রিপদীই চৌপদী ছন্দ হইয়া পড়ে। এই ছন্দটি যে বর্ত্তমান হিন্দীসাহিত্যের 'কবিত্ত' ছন্দ হইতে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দীসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চন্দ বরদাই-প্রণীত 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' নামক কাব্যে এই 'কবিত্ত' ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না। পরবর্ত্তী সময়ে যে ছন্দ 'ছপ্পৈ' নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহাই পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থে 'কবিত্ত' ছন্দ নামে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মোগলসম্রাট্ মহাত্মা আকবরের সমসাময়িক প্রাচীন কবি কেশব দাসের 'কবি-প্রিয়া' গ্রন্থে আমরা 'কবিত্ত' ছন্দ দেখিতে পাই, ইহার পরবর্ত্তী সময়ের হিন্দীসাহিত্যে এই ছন্দের এত অধিক ব্যবহার দেখা যায়, যে বোধ হয়, যেন সেই জন্তই ইহা হিন্দীসাহিত্যে 'কবিত্ত' ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 'দোহা' 'চৌপাই' 'সবাই' প্রভৃতি বহু ছন্দ থাকিলেও হিন্দী কবিতা যেন 'কবিত্ত' ছন্দেরই একাধিকার সাম্রাজ্য। এ

হিন্দী (কবিত্ত) ছন্দ।

স্থলে ইহাও বিশেষভাবে বক্তব্য যে, হিন্দীতে প্রায় সকল ছন্দেই অক্ষরের লঘু গুরু গণ্য করা হইলেও এই কবিত্ত ছন্দে সেইরূপ না করিয়া প্রত্যেক চরণে নির্দ্দিষ্ট ৩১টী অক্ষরের ব্যবহার করা হয়। আমরা এখানে পূর্ব্বোক্ত "কবিপ্রিয়া" নামক গ্রন্থ হইতে একটি কবিত্ত ছন্দের কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—যথা,—

"কোমল বিমল মন বিমলাসী সখী সাথ
কমলা জোঁ্যা লীন্হেঁ হাল কমল সনালকে।
নূপুরকী ধ্বনি সুনি ভোরেঁ কলহংসনকে
চৌকি চৌকি পরেঁ চারু চেটুবা মরালকে।
কচনিকে ভার কুচ ভাবন সকুচ ভার
লচকি লচকি জাত কটি-তট বালকে।
হরে হরে চলতি হ লোকতি হরেই হরে
হরে হরে চলতি হ রতি মন লালকে।" (ষষ্ঠপ্রভাব ৩৭শ্লোক)

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত "নয়ন অমৃতনদী" ইত্যাদি চৌপদীর সহিত এই কবিত্ত ছন্দের কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে এই চতুর্মাত্রিক কবিত্ত চৌপদী

ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদী

ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। মহাপ্রভুর ভক্ত ও সহচর বাসুদেব ঘোষের একটী—

গৌরচন্দ্র দোহা "চীত-চোর গৌর ঘোর,
প্রেমে মত্ত মগন ভোর,
অকিঞ্চন-জন করত কোর
পতিত-অধম-বঁধুয়া।
ভুবন-তারণ, কারণ নাব,

জীব লাগিয়া　　　উজল ধাম,
প্রকট হইলা,　　　নদীয়া-নগরে,
　　　　　　　　বৈছে শরদ-ইন্দুয়া ॥" ইত্যাদি

(প-ক-ত-২৪৯ পৃষ্ঠা)

এই ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদীতে নিম্নলিখিত রূপ মাত্রা আছে, যথা—

৩+৩　　৩+৩
৩+৩　　৩+৩
৩+৩　　৩+৩
৩+৩+৩+১

প্রচলিত চৌপদীর নিয়মানুসারে উদ্ধৃত সাতটি পংক্তিকে চারি পংক্তিতেও লিখা যাইতে পারে। যথা—

"চীত-চোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর
আকিঞ্চন-জন করত কোর, পতিত-অধম-বন্ধুয়া।" ইত্যাদি—

এই প্রণালীতে মাত্রা যথা—

৩+৩+৩+৩　　৩+৩+৩+৩
৩+৩+৩+৩　　৩+৩+৩+১

অর্থাৎ হিন্দী কবিত্ত ছন্দের প্রত্যেক ২ মাত্রার স্থলে ইহাতে ৩ মাত্রা আছে। এইরূপ ত্রিমাত্রিক গণ-দ্বারা গঠিত হওয়ায় এই ছন্দটীতে যে একটি অপূর্ব্ব গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাসুদেব ঘোষের পূর্ব্বে আর কেহ যে এই সুমধুর ছন্দে কোন পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নাই। যদি বাসুদেব ঘোষ কেবল এই একটী মাত্র পদ রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু যেমন ভারতচন্দ্র বহু বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের পদানুসরণ করিয়াও নিজের অসাধারণ শক্তির গুণে তাঁহাদিগের অধিকার বশ নিজে গ্রহণ করিয়াছেন,—এই স্থলেও গোবিন্দদাসের নিকট বাসুঘোষ সেইরূপ পরাজিত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের ঠিক সেই ছন্দের—

"শারদ-চন্দ　　　পবন মন্দ
বিপিনে ভরল　　কুসুম-গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা　　মালতী যূথী,
　　　　মত্ত-মধুকর-ভোরণী।
হের রাতি　　　ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন　　মদনে মাতি
মুরলী গান　　　পঞ্চম তান
　　　　কুলবতী-চিত চোরণী ॥" ইত্যাদি (প-ক-ত ৯০৫ পৃঃ)

সুললিত পদাবলী মাধুর্য্যগুণে বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। বর্ত্তমান সময়ের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির এই পদমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাদিগের সুরেই সুর মিশাইয়া গাইয়াছেন—

"গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোক-লাজে
সজনি আও আও লো।" ইত্যাদি।

যতদিন বঙ্গভাষা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই সুললিত গীতের সুমধুর স্বর-লহরী বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বৈষ্ণব কবিগণের স্মৃতি চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের ব্যবহৃত নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র ছন্দগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিগত যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে অদ্য পর্য্যন্তও বঙ্গভাষায় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ছন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর কোন নূতন ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের যে কি অপরিসীম পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। তবে এখানে ইহা বলা সঙ্গত যে, অপূর্ব্ব নূতন ছন্দের উদ্ভাবন ও নবীন ভাবের বিকাশ দ্বারা গৌরব-ভ্রষ্ট বঙ্গ-সাহিত্যের সমুন্নত নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করার জন্য অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও প্রশংসা যদি কোন ব্যক্তির সমুচিত প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা কবিও ব্রজাঙ্গনাগণের সহকারে প্রেমের মোহন নিকুঞ্জে বিচরণ করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-কবিগণের পদাঙ্কেরই অনুসরণ করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা বৈষ্ণব কবিগণের শ্রেষ্ঠতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। আমরা গোবিন্দদাসের ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গেই পরিচয় দিয়াছি। বস্তুতঃ, তাঁহার রচনায় আলঙ্কারিকদিগের বর্ণিত নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতের ন্যায় প্রায় সকল অপভ্রংশ ভাষাতেই অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ সুসাধ্য হইলেও দ্ব্যর্থক শব্দ-ঘটিত শ্লেষালঙ্কারের সংঘটন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার; সেই জন্যই মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের নিতান্ত প্রিয় ও বৈচিত্র্যময় শ্লেষালঙ্কারটীর প্রয়োগ ভাষা-কাব্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু গোবিন্দদাসের পদাবলীতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা এস্থলে দুই একটী উদাহরণ দিব।

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন

গোবিন্দদাসের পদাবলীর অলঙ্কার

সখী মানিনী শ্রীরাধার কৌতুক উৎপাদনদ্বারা তাঁহার মান-ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বলিতেছে—

"যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চর,
কৃশ-কটি করু অবগাহ।

চন্দ্রক-চারু　　শটা-পরিমণ্ডিত,
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥
শব্দ-শ্লেষ ও অর্থ-শ্লেষ ।　সুন্দরি ! তালে তুহুঁ হরিণী-নয়ানী ।
সো চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি,
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি ॥ ধ্রু ॥”

অর্থাৎ কৃশ-কটিবিশিষ্ট যে প্রাণীটি, পর্ব্বত গোচারণ-ভূমি ও কাননে প্রবেশ করিয়া সঞ্চরণ করে, যে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি চিহ্নের ন্যায় বর্ণ-যুক্ত, কুঞ্চিত কেশরাজিতে শোভিত ;—যে আরক্তিম বক্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে,—হে সুন্দরি ! তুমি সেই চঞ্চল হরিকে (এক অর্থে কৃষ্ণ অন্য অর্থে সিংহ) হৃদয়-পিঞ্জরে ভরিয়া রাখিয়াছ; ইহাতে বুঝা যায় যে, তুমি সামান্য হরিণ-নয়না নহ (এক অর্থে মৃগলোচনা অন্য অর্থে হরিণী)। ‘যো গিরিগোচর’ ইত্যাদি কলিতে হরির যে বিশেষণ-গুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ দ্বারা কৃষ্ণ ও সিংহ উভয়েরই প্রতীতি হয়, শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া সমার্থক অন্য শব্দ প্রয়োগ করিলে সেই অর্থের কোন ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং শব্দগত ও অর্থগত দ্বিবিধ শ্লেষালঙ্কার-মধ্যে ঐ অংশে অর্থগত শ্লেষের এবং ধুয়াতে দ্ব্যর্থক ‘হরি’ ও ‘হরিণী-নয়ানী’ শব্দের প্রয়োগবশতঃ শব্দগত শ্লেষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে ।

মানভঙ্গের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলনান্তে প্রেমোল্লাস-পুলকিতা শ্রীরাধা কৌতুক করিয়া হেঁয়ালীর ভাষায় সখীর নিকট প্রিয়-সমাগমের বর্ণনা করিতেছেন যথা,—

“শ্যাম-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ ।
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ ॥
তরল-তার কিয়ে টুটল হার ।
নখ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কাণ ।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান ॥
শ্লেষানুপ্রাণিত সন্দেহালঙ্কার ও রূপক ।　পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর ।
চীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥
তবহু যতন করি করইতে মান ।
হাস-কুমুদে তহি সব করু আন ॥
মানিনী-মান-গরব ভেল চুর ।
নাগর আপন মনোরথ পুর ॥
তবহুঁ না জানল দিন কিয়ে রাতি ।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥”

অর্থাৎ “ঐরূপ দোষাকর কৃষ্ণকে (এক অর্থে দোষের আকর কৃষ্ণ, অপর অর্থে কৃষ্ণ-রূপ চন্দ্রকে ; দোষা=নিশা, দোষাকর=নিশাকর অর্থাৎ চন্দ্র) দেখিলে প্রভাতকেই আমার

সন্ধ্যা বলিয়া অনুমান হইল। (আমার সন্দেহ হইল) এ কি শ্যাম-তনু কৃষ্ণ না তিমির বিরাজ করিতেছে? এ কি (অন্য নায়িকার) সিন্দূরের চিহ্ন না আরক্তিম (সন্ধ্যারাগ)? এ কি চঞ্চল অর্থাৎ স্থানভ্রষ্ট তারকা (সমূহ) না (শ্রীকৃষ্ণের) ছিন্ন হার! এ কি (নায়িকার) নখের চিহ্ন, না নূতন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চন্দ্র-কলার উদয় হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুমান করিতে করিতে আমি আত্ম-বিস্মৃত হইলাম,—শঠ কানাই আমাকে ক্রোড়ে লইল। তখন (চেতনা পাইয়া) আমি মান করিতে চেষ্টা করিলাম (কিন্তু) তাহাতে (সেই কানাই) হাস্যরূপ কুমুদের (বিকাশ) দ্বারা (আমার) সকল (চেষ্টা) অন্যথা করিয়া ফেলিল। মানিনীর মানের গর্ব্ব চূর্ণ হইল,—নাগর আপন মনোরথ পূর্ণ করিল। তখনও জানিলাম না (ইহা) দিন কি রজনী। গোবিন্দদাস কহে (ইহাই) সমুচিত শাস্তি।"

এস্থলে কবি 'শ্লিষ্ট' অর্থাৎ দ্ব্যর্থক "দোষাকর" শব্দের ও সেই শ্লেষানুপ্রাণিত সন্দেহালঙ্কার ও রূপকের প্রয়োগ দ্বারা যে বিচিত্র ভাবরাজির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার তুলনা পদাবলি-সাহিত্যে দুর্ল্লভ। প্রিয়-সমাগম-সুখে প্রেমিকা শ্রীরাধার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; দিবারাত্রি জ্ঞান ছিল না; এই প্রকৃত কথাটী লজ্জায় গোপন করিয়া শ্রীরাধা সেই কৌতুকজনক হেঁয়ালী রক্ষা করিয়াই বলিতেছেন "তখনও আমার সেই ভুল;—দিন কি রজনী বুঝিতে পারিলাম না।" কবির ভনিতার অর্থ ততোধিক মধুর,—কবি কহিতেছেন—এরূপ নায়িকার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত শাস্তি। "তবহু না জানল কিয়ে দিন রাতি" পংক্তিটীতে

"নীবিং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি॥"

এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন শ্লোকের ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু গোবিন্দদাস সেই পুরাতন ভাবটীকে যে বিচিত্র নবীন সৌন্দর্য্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহার তুলনাও নিতান্ত সুলভ নহে। এখন গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কারের আলোচনা করা যাউক। উপমা, রূপক, অর্থান্তর-ন্যাস প্রভৃতি কয়েকটী অর্থালঙ্কার সকল কবিগণেরই সাধারণ সম্পত্তি।

গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কার।

কালিদাসের উপমা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। বিদ্যাপতির উপমা ও রূপকগুলির সৌন্দর্য্যও বড় কম নহে। গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কার কিছু স্বতন্ত্র রকমের। অলঙ্কারের ব্যবহারে কালিদাসের সহিত পরবর্ত্তী কবি মাঘ, শ্রীহর্ষ কিম্বা জয়দেবের যে পার্থক্য, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দের অলঙ্কারের মধ্যেও সেই রকম পার্থক্য দেখা যায়। কালিদাসের উপমা প্রভৃতি এমন প্রাঞ্জল যে তাঁহার কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মল্লিনাথকে আমরা প্রায় কখনও কালিদাসের অলঙ্কারের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি নাই; কিন্তু মাঘ-কাব্য ও নৈষধের অধিকাংশ শ্লোকের টীকাতেই মল্লিনাথের সূক্ষ্ম অনুধাবন-শক্তির প্রয়োগ করিয়া ঘনীভূত অলঙ্কারের জটিল-গ্রন্থি উন্মোচন করিতে হইয়াছে। গোবিন্দদাসের অলঙ্কারের অবস্থাও কতক পরিমাণে সেইরূপ বটে। অভিজ্ঞ আলঙ্কারিক ব্যতীত তাঁহার অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব সম্পূর্ণ অনুভব করা সাধারণ পাঠকের সাধ্যায়ত্ত

নহে। ইহা সত্য বটে যে, মাঘ, নৈষধ প্রভৃতির অপর্য্যাপ্ত অলঙ্কারের পারিপাট্য সত্ত্বেও আমরা কালিদাসের পর্য্যাপ্ত উপমাদিরই অধিক অনুরক্ত, তথাপি এক শ্রেণীর সমালোচকের নিকটে মাঘের কাব্য কালিদাসের কাব্য হইতেও প্রীতিকর হইয়াছে।

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥"

এই প্রসিদ্ধ উদ্ভট-শ্লোকটীই তাহার প্রমাণ। অতএব সেইরূপ অনেক ব্যক্তি যে, বিদ্যাপতির পদাবলী হইতেও গোবিন্দদাসের পদাবলির সমধিক প্রশংসা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা বাহুল্যভয়ে গোবিন্দদাসের সাধারণ উপমা-রূপকাদি ত্যাগ করিয়া তাঁহার জটিল অলঙ্কারের ২।১টী উদাহরণ দিব।

শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে শ্রীরাধার মান অপনোদন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

গোবিন্দদাসের সাঙ্গ-রূপক

"মনমথ-মকর ভরহি ভয়-কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়া হার-তটিনী-তট কুচ-ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি! সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসীক মীন বড়শী কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক॥ ধ্রু॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
নাভি-সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী ভুজগী-সঙ্গ-ভয়ে,
ত্রিবলী-বেণী অবগাহ॥
তাহি কিরত কত কতহুঁ মনোরথ
দৈবকি-গতি নাহি জান॥
কিঙ্কিনী-জালে পড়ত ভেল সংশয়
গোবিন্দদাস রসগান॥"

অর্থাৎ 'আমার চিত্তরূপ মীন মন্মথরূপ মকরের ভয়ে ভয়াতুর হইয়া কাঁপিতেছিল; তোমার বক্ষের (মুক্তা) হাররূপ তরঙ্গিণীর তীরে (তোমার) কুচরূপ কলসী দেখিয়া উল্লসিত হইয়া (তাহার মধ্যে) পতিত হইল। হে সুন্দরি! তুমি কুটিল কটাক্ষ সম্বরণ কর;—কলসীর মধ্যস্থিত মীনের উপর তুমি বড়শী নিক্ষেপ করিতেছ, ইহা দারুণ দুরদৃষ্ট। (কটাক্ষরূপ বড়শীর ভয়ে) অস্থির হইয়া (আমার চিত্তরূপ মীন) পুনরায় যখন (তোমার) নাভিরূপ সরোবরের মধ্যে পতিত হইল, (তখন) সেখানে রোমাবলি-রূপ কাল-ভুজঙ্গীর সঙ্গ-ভয়ে ত্রিবলীরূপ অপ্রশস্ত জল-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে (তাহার) কতই বাসনা

হইতে লাগিল (কিন্তু) দৈবের গতি (কেহ) জানিতে পারে না ; (তখন সে) কিঙ্কিনীরূপ জালে পতিত হইয়া (উদ্ধার পাইবে কিনা) সংশয় উপস্থিত হইল। গোবিন্দদাস রসগান করিতেছে"।

উদ্ধৃত পদটির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সুবিন্যস্ত বিচিত্র রূপক-রাজিতে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বাসনা কি অপূর্ব্ব কৌশল ও রসিকতার সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে! আমরা আর একটিমাত্র অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র বিদ্রূপের সহিত বলিতেছেন—

গোবিন্দদাসের অসঙ্গতি-অলঙ্কার

"নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি।
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাহে মিনতি করু কাণ।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম-অঙ্গ॥
অতয়ে চল নিজ বাস।
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥"

অর্থাৎ "তোমার হৃদয়ে (অপরা নায়িকার প্রদত্ত) নখচিহ্ন ; (কিন্তু) আমার হৃদয় জলিতেছে। তোমার অধরে কাজল, (কিন্তু) আমার মুখ মলিন হইয়াছে ; আমি রজনী জাগরণে কাটাইয়াছি (কিন্তু) তোমার চক্ষুর বর্ণ আরক্ত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমি কিজন্য অনুনয় করিতেছ; (দেখা যাইতেছে) তুমি আর আমি এক আত্মা। আমার ক্রন্দনের ইচ্ছা হইতেছে, (কিন্তু) তোমার গদগদ বাক্য নির্গত হইতেছে। শুধু (তোমার ও আমার দেহেদেহে মিলন নাই, আমি গৌরবর্ণা ; তুমি শ্যামাঙ্গ ; অতএব গোবিন্দদাস কহিতেছে নিজগৃহে যাও।"

উদ্ধৃত পদটিকে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অসঙ্গতিনামক অর্থালঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে। এক-স্থানে কারণ আছে, অন্য স্থানে কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে—চমৎকারিত্বের সহিত এমন যদি কোন বিষয় বলা যায়, তাহাকেই অসঙ্গতি-অলঙ্কার বলে। মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী সুপ্রাচীন প্রাকৃত গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সংস্কৃত অনুবাদ এই—

"যস্যৈব ব্রণস্তস্যৈব বেদনা ভণতি লোকস্তদলীকম্।
দন্তক্ষতমধরে বধ্বাঃ বেদনা সপত্নীনাম্॥"

অর্থাৎ— "ক্ষত যার তারি সে বেদনা—
বলে লোকে ;—মিথ্যা এ বচন ;
দন্ত-ক্ষত বধূর অধরে
জলে কিন্তু সপত্নীর মন !"

সম্ভবতঃ এই কবিতাটীর ভাব লইয়াই জয়দেব গীতগোবিন্দে খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধার মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

"দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥"

'তোমার অধর-গত বটে এ দশন-ক্ষত
আমার অন্তরে কেন দেয় সে বেদন ?
এখনো যে তোমা সহ অভিন্ন আমার দেহ
এ ধারণা মম কিহে হবেনা ভঞ্জন ?" (মৎকৃত পদ্যানুবাদ)

সুতরাং গোবিন্দদাস যে, তাঁহার এই পদের মূলভাবটি জয়দেব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রদর্শিত একটি অসঙ্গতির স্থলে চারিটি অসঙ্গতি দেখাইয়াছেন ; তার পরে জয়দেবের শ্রীরাধার মনোগত ভাবটি এই যে, যখন শ্রীকৃষ্ণের অধরে ক্ষত তাঁহার মনে বেদনা দিতেছে, তখন ইহাদ্বারা অবশ্যই উভয়ের দেহ অভিন্ন থাকাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু তিনি নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ-কারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রভেদ চিন্তা করিতে ক্লেশ বোধ করেন, কিন্তু এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ এক হইবেন কেন ? গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চারিটি বিশিষ্ট কারণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের আত্মার একত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি উভয়ের দেহের একীভাব মোটেই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় শ্বেতাঙ্গী ও কৃষ্ণাঙ্গের একীভাব অসম্ভব। "গৌরী" ও "শ্যাম-অঙ্গ" শব্দের ভাবার্থ দ্বারা শ্রীরাধা বোধ হয় এ কথাও বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি সাদা অর্থাৎ সরলপ্রকৃতি, আর শ্রীকৃষ্ণ -কালো অর্থাৎ মলিন বা কদাচারী, সুতরাং উভয়ের মিলন হইবে কি প্রকারে ? বস্তুতঃ সেই সময়ে যে উভয়ের দেহের মধ্যে মিলন নাই, একথা শ্রীকৃষ্ণেরও অস্বীকার করার উপায় নাই ; অতএব শ্রীরাধার নিকট সম্পূর্ণ নিরুত্তর ও অপ্রতিভ হইয়া গোবিন্দদাসের সুপরামর্শ অনুসারে তিনি নিজ গৃহে যাওয়া ব্যতীত আর কি করিতে পারেন ?

এস্থলে ভাববৈচিত্র্যের জন্য সমধিক প্রশংসা কাহার প্রাপ্য রসজ্ঞ পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন।

গোবিন্দদাসের রস-বৈচিত্র্য

প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মাত্রেরই সিদ্ধান্ত এই যে, অলঙ্কারের প্রয়োগদ্বারা কাব্যের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু রসবত্তাই কাব্যের জীবন ; রস না থাকিলে শত অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত হইলেও কোন রচনাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না।

আলঙ্কারিকদিগের এই সিদ্ধান্তের মূলে বেদান্তের "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি তত্ত্বটি অন্তর্নিহিত আছে। সংসারের প্রেম, হাস্য, বীরত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি নানারসের (Emotions) পরিচালনায় যে ক্ষণিক আনন্দ তাহা যদিও বেদান্তের বর্ণিত সেই অসীম ব্রহ্মানন্দ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্তু আমরা প্রথমে ক্ষণিক আনন্দের পথে চলিয়াই সেই অসীম আনন্দের বার্তা পাইয়া থাকি, এইজন্যই প্রকৃতি আমাদিগের আসক্তি ও সুখানুভূতি ঐ প্রেমাদি রসাত্মিকা মনোবৃত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং যে রচনায় সেই সকল রসাত্মিকা মনোবৃত্তির উদ্রেক হয় না, তাহা যে আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর হইতে পারে না, এবং আমাদিগের সহানুভূতিও আকর্ষণ করিতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আর ম্যাথুআর্ণ্ড, কার্লাইল, রসকিন্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী সমালোচকদিগের মতানুসারে লোকোত্তর আদর্শ সৃষ্টি দ্বারা মানবগণকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে উদ্বোধিত করাই যদি শ্রেষ্ঠতম কাব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও কেবল আমাদিগের সুখ-দুঃখময় জীবনের নানা মনোবৃত্তিগুলির সাহায্যেই সেই আদর্শ আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সুতরাং যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, রসই যে কাব্যের প্রাণ ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

গোবিন্দদাসের পদাবলিতে এই রস কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

গোবিন্দদাসের কবিতার রস

বৈষ্ণবকবির পদাবলি রসের অনন্ত ভাণ্ডার। তাহাতে না আছে এমন রস নাই। বিশেষতঃ গীতিকাব্যের অসাধারণ উপযোগী বলিয়া তাহাতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সুমধুর প্রেম-লীলা ও সেই প্রেমের পূর্ব্বরাগ, উৎকণ্ঠা, মিলন, রসোদগার, মনে বিরহ, বিরহান্তে মিলন, রসোল্লাস প্রভৃতি বিচিত্র অবস্থাগুলি যেরূপ চমৎকার স্বাভাবিকতা ও অপূর্ব্ব কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে বোধ হয় তাহার তুলনা বিরল। গোবিন্দদাস যে কেবল অলঙ্কারের পারিপাট্যেই শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ না হইলেও তিনি প্রেমের পূর্ব্বোক্ত অবস্থাগুলির যে সমুজ্জ্বল চিত্রাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরকাল একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সমাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় গোবিন্দদাসের কাব্য-রসের অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার স্থান আমাদিগের নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার কতিপয় রসচিত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

নবীন অনুরাগে শ্রীরাধার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—

"শুনইতে চমকই গৃহ-পতি রাব।
তুয়া মঞ্জীর-রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে বরু লোর॥

কাঁহা তুহু গৌরী আরাধলি কান।
জানলু রাই তোহে মন মান॥
স্বামীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন মরম যতহু অভিলাষ।
কতহু নিবেদব গোবিন্দদাস॥"

এস্থলে কবি শ্রীরাধার কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বিচিত্র কার্য্যের বর্ণনা দ্বারা অল্পকথায়, অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহার প্রেমের যে আবেগ ও তন্ময়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই অতি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য। অল্পকথায় অনেকভাব প্রকাশ পাইলে আলঙ্কারিকগণ তাহাকে "ধ্বনি" বা "ব্যঞ্জনা" বলেন। এই ব্যঞ্জনাই শ্রেষ্ঠকাব্যের লক্ষণ। সখী যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলিত যে, "শ্রীরাধা তোমার প্রতি অনুরক্তা, সে তোমার প্রেমে তন্ময় ইত্যাদি" তাহা হইলে আমরা 'অনুরক্ত' 'তন্ময়' এইরূপ কতকগুলি বড় বড় কথাই শুনিতাম বটে, কিন্তু সেই অনুরাগ আর তন্ময়তা যে কি বস্তু তাহা দেখিতে পাইতাম না। আলঙ্কারিকদিগের মতে তাহাতে "স্ব-শব্দ-বাচ্যতা" দোষ ঘটিত; কিন্তু কবি একবারও বাক্যে "অনুরাগ" "তন্ময়তা" ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার না করিয়া "শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব" ইত্যাদি বাক্যের ব্যঞ্জনা দ্বারা শ্রীরাধার প্রেমের আবেগ, গভীরতা ও তন্ময়ত্ব প্রকাশ করায় কবিতাটী কাব্যাংশে অতি চমৎকার হইয়াছে।

প্রণয়-কলহান্তে অনুতাপিতা শ্রীরাধার একটী চিত্র দেখুন। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—

"কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই
　হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
　প্রেম করই জানি মান॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ।
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে
　কানু সঞে কি করব রোষ॥" ইত্যাদি। (প-ক-ত)

অর্থাৎ কোন কুলবতীই যেন নয়নদ্বারা কাহারও পানে তাকায় না; আর যদিই বা তাকায় তাহা হইলেও যেন কানুর পানে চাহে না; আর যদিই বা চাহে, তাহা হইলেও যেন কানুর প্রতি প্রেম বাড়ায় না; আর যদি প্রেমও বাড়ায়, তাহা হইলেও যেন মান করে না। (আমি

এই সমস্তই করিয়াছি) অতএব নিজের অপরাধ স্বীকার করি। আমার মান-দগ্ধ জীবন এখনও বাহির হইতেছে না (ইহাতে নিজের জীবনের প্রতি রাগ না করিয়া) কানুর প্রতি কি রাগ করিব? এস্থলে শ্রীরাধার ন্যায় কুলবতীদিগের বিষম সমস্যা, শ্রীকৃষ্ণের অনিবার্য্য মোহিনী শক্তি, দৃষ্টিমাত্র তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার গভীর প্রেমোদ্রেক ও সেই প্রেমের আতিশয্য ও তন্ময়তাবশতঃ সম্পূর্ণ আত্মাভিমানের বিসর্জ্জন, কবি অল্প কয়েকটী কথায় ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহার তুলনা যে কোন সাহিত্যে বিরল।

বিরহিণী শ্রীরাধার একটি চিত্র দেখুন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইয়া ব্রজে প্রত্যাগমনের কথা যেন বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই শ্রীরাধার সখী মথুরায় যাইয়া সখীর অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহ দূর।
অযতনে ধনীক মনোরথ পূর॥
কী ফল অম্বরে হিম-ঋতু-রাতি।
যাহাঁ শুতলি কিশলয়-দল-পাঁতি॥
কী ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উয়ত গগনহি চন্দ॥
কাঁহে সিনায়ব উতপত বারি।
নয়নহি তাপনি সলিল উতারি॥
ঐছন গণইতে তুয়াগুণ কোটি।
মানল পৌখক যামিনী ছোটি॥
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপন-চরিত॥
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সম্বাদ।
তনু জীবন দুহুঁ ধনীক বিবাদ॥"

অর্থাৎ "হে মাধব! তুমি দূরে রহিয়াছ (ইহা) ভালই হইয়াছে; (তুমি দূরে থাকার) বিনা যত্নেই ধনীর (শীত ঋতুর) আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইতেছে। শীত কালের রজনীতে (অধিক) বস্ত্রাদির কি প্রয়োজন? শ্রীরাধা সে সময়ে পল্লব-শয়নে শুইয়া থাকে। নিকটে সুখোষ্ণ অগ্নি রাখিয়া কি প্রয়োজন? রাত্রিতে ত চন্দ্রই গগনে উদিত হয়! শ্রীরাধাকে উষ্ণজলে কেন স্নান করাইব।—তাঁহার নয়নযুগলই তপ্তবারি বর্ষণ করিতেছে। সেইরূপ তোমার অনন্তগুণের কথা আলোচনা করিতে করিতে পৌষমাসের রাত্রি তাঁহার নিকট ছোট বলিয়া বোধ হয়; কেবল সূর্য্যটা তাঁহার নিকট শীতল কি উষ্ণ বোধ হয় তাহাই বুঝিতে পারি না। গোবিন্দদাস কহে এইমাত্র সংবাদ বলিলেই হয় যে, ধনীর দেহ ও জীবন এই দুইটার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে!" এই কবিতার ভাবার্থ পরিষ্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করার আবশ্যক

নাই। ইহা অপেক্ষা তীব্রতর বিদ্রূপাত্মক আক্ষেপের সহিত বিরহিণী শ্রীরাধার অবস্থার বর্ণনা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভৎর্সনা আর কিছু হইতে পারে কি? সূর্য্যের উত্তাপে শ্রীরাধা গ্রীষ্ম কিম্বা শীত-ভাব প্রকাশ করে না, ইহার দ্বারা কবি অপূর্ব্ব-কৌশলে দেহের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা বুঝাইয়াছেন। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমরা গোবিন্দদাসের রসবর্ণনার দৃষ্টান্ত স্থলে যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই কয়েকটীরই বর্ণনার ভঙ্গীতে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যকেই আলঙ্কারিকেরা অর্থালঙ্কার বলিয়া থাকেন; অর্থালঙ্কারের সংখ্যার কোন ইয়ত্তা নাই। তবে আলঙ্কারিকেরা তাঁহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রকারগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে কি কি অলঙ্কার আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। এই স্থলে ইহাই কেবল বক্তব্য যে গোবিন্দদাস এরূপ অলঙ্কারপ্রিয় ও অলঙ্কার-প্রয়োগে পারদর্শী ছিলেন যে তাঁহার রসভাবাত্মক কবিতাগুলিতেও নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি, সখীশিক্ষা ও সম্ভোগের বর্ণনা অতুলনীয়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ মধ্যে যদিও অনেকেই ঐ সকল বিষয়ে বিদ্যাপতির অনুকরণে পদরচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দদাসের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তুলনা করিয়া দেখাইবার আমাদিগের স্থান নাই। কৌতূহলী পাঠকবর্গ গোবিন্দদাসের "ধরি সখি-আচর ভই উপচঙ্ক।" (প-ক-ত ৭৫ পৃষ্ঠা) "সৌরভ-আগরি রাই সুনাগরী কনকলতা-সম সাজ" (ঐ ৭৬ পৃঃ) "সুরত-তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।" (ঐ ৪৫ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি পদগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

গোবিন্দদাস হাস্যরসের বর্ণনায়ও বেশ পটু ছিলেন। তাঁহার কোন কোন পদে হাস্যরসের সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক "আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক" (প-ক-ত ২৯২ পৃঃ) "সহজই গৌরী রোখে তিন লোচন" (ঐ ২৯৩ পৃষ্ঠা) "রামক নীলবসন কাঁহে পিন্ধ" (ঐ ১৭৯৭ পৃষ্ঠা) "রাধা-বদন চাঁদ হেরি ভুলল, শ্যামক নয়ন-চকোর" (ঐ ১৮০৬) ইত্যাদি পদগুলিতে গোবিন্দদাসের হাস্যরসের পরিচয় লইবেন।

আমরা স্থানাভাবে গোবিন্দদাসের অন্য কোন রসের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না। কিন্তু তাঁহার ভক্তি-ভাব সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বিশেষ অবিচার করা হইবে। এই ভক্তিভাবটী মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি। মহাপ্রভুর আদর্শ-জীবনের ইহা স্বাভাবিক ফল। পরবর্ত্তী অন্যান্য কবির ন্যায় গোবিন্দদাসও যে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ভক্তিপূর্ণ পদাবলি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। গোবিন্দদাস যে সংস্কৃতপ্রায় সুমধুর শব্দাবলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অবস্থার উপযোগী বহুসংখ্যক বিচিত্র রূপ-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে চাই।

এইরূপ বর্ণনাগুলি সংস্কৃত-স্তোত্রের ন্যায় অতি সুমধুর এবং তজ্জন্য কৃষ্ণভক্তগণের বড়ই প্রিয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলিতে এই জাতীয় কোন কবিতা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং

পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাসই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক বলিয়া চিরকাল পূজিত হইবেন। আমরা গোবিন্দের অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত স্থলে—'কুবলয়-কন্দন-কুসুম-কলেবর

কালিম-কান্তি-কলোল।" ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি।

গোবিন্দদাসের ঐ জাতীয় রূপবর্ণনা আরও অনেক আছে। কৌতূহলী পাঠক পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ষড়বিংশ পল্লবের ৫।৮।১২।১৩।১৫ —২৬ সংখ্যক পদগুলি দৃষ্টি করিবেন।

গোবিন্দদাসের কবিত্ব।

এখন কবিত্ব অনুসারে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাসের স্থান কোথায়, তাহা বলিলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হয়। পণ্ডিতমণ্ডলী যদিও অনেক সময়েই জনসাধারণের মতামত বড় একটা গ্রাহ্য করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহা যে তুচ্ছ করার বিষয় নহে,—অনেক সময়েই যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-বিশেষের ব্যক্তিগত মতামত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতই অধিক অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়—ইহার দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে বিরল নহে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি বাইরণ সেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় নাট্য-কাব্যগুলি হইতেও পোপের কবিতার অধিক অনুরাগী ছিলেন। আমাদিগের দেশেও কোন কোন পণ্ডিতমহাশয়কে কালিদাসের কাব্য অপেক্ষা মাঘ নৈষধ কিম্বা বাণভট্টের রচনারই অধিক পক্ষপাতী দেখা যায়। এই সকল স্থলে পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে জনসাধারণ যে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোন ভ্রান্তি দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কবির জীবদ্দশায় তাঁহার সম্বন্ধে কোন অভ্রান্ত মতামত জনসাধারণের নিকট পাইবার আশা করা যায় না; কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, জনসাধারণের বহুকাল-ব্যাপী মতামত কালরূপী বিরাট-পুরুষের গূঢ় ও অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কালের এই নিরপেক্ষ দোষগুণ-বিচারে আমরা যোগ্যতমের জয়ের দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই।

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক জনসাধারণ প্রায় একবাক্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই কবিত্ব অনুসারে ৺গোবিন্দদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজ সাড়ে তিনশত বৎসর হইতে চলিল—গোবিন্দের সম্বন্ধে সাধারণের এই মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলির যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে—পদলালিত্য, অনুপ্রাসচ্ছটা ও অলঙ্কার-পটুত্বে তাঁহার কবিতা পদাবলি-সাহিত্যে অতুলনীয়। কাব্যের প্রাণ রসাত্মকতাবিষয়ে যদিও তাঁহার কবিত্ব অপেক্ষা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলেও রস-বিকাশে গোবিন্দদাস অপটু নহেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রস-চিত্র শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি কোন কোন কবির বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ-রচনা অনেক স্থলেই উৎকৃষ্টতর এবং কোন কোন রস-চিত্র কোন স্থলে উজ্জ্বলতর হইয়া থাকিলেও আমাদিগের বিবেচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই গোবিন্দদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবায় নমঃ

পাট-পর্য্যটন

এবং

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়

আমরা দেমুড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতেছি, তাহার মধ্যে এই ক্ষুদ্র অপ্রকাশিত পুঁথিখানিতে অনেক শ্রীচৈতন্যভক্তের জন্মস্থান এবং পাট-বাটীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে দেখিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। আশা করি ইহাতে বহু সাহিত্যসেবীর বিশেষ উপকার হইবে, কারণ অনেকে বহু ভক্তের জন্মস্থান সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, বাসু, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের লেখক অভিরাম দাসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মূল পুঁথিখানি সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদান করিতে বাসনা আছে।

(শ্রীলোচনদাসের দুর্লভসার ও আনন্দলতিকা, বৃন্দাবন দাসের ভক্তি-চিন্তামণি ও তত্ত্ব-বিলাস, আনন্দলহরী, রাধিকামোহন প্রভৃতি এবং নরোত্তম দাসের আনন্দ বিলাস, ভাবামৃত ও স্মরণ-মঙ্গল প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

পাট পরিক্রমা যে যে করিবারে হয়।
সংক্ষেপে দিঙ্‌মাত্র লিখিয়ে নিশ্চয়॥
পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশা পাট কয়॥
চৌত্রিশ পাট যে যে গ্রামে তার নাম কহি।
ক্রমাগত নাম সব শুনহ নিশ্চহি॥
যেই গ্রামে যার বাস আছিল নির্দ্ধার।
নাম গ্রাম লিখি মুঞি করি পরিহার॥
শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোঙা প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচাকা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্যাস॥
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥

অভিরাম পূর্ব্বে সুদাস খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥
হলদা মহেশপুর সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্ব্বে সুদাম জানিবা নিশ্চয় ॥
কাঁচড়াপাড়া জন্মভূমি জলণ্ডিতে বাস।
ধনঞ্জয় বসুদাম জানিবা নির্যাস ॥
অম্বিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস।
গৌরীদাস পূর্ব্বে সুবল জানিবা নির্যাস ॥
আক্না মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি ॥
কমলাকর মহাবল পূর্ব্ব নাম হয়।
উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয় ॥
হুগুলির নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্ব্ব নাম ॥
সাগুণা সরডেঙ্গা সুখসাগর নিকটে।
মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে ॥
মহেশ মহাবাহু পূর্ব্বে জানিবা আখ্যান।
বড়গাছিতে বাস শ্রীকৃষ্ণদাস নাম ॥
পরমেশ্বর দাস পূর্ব্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল।
বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল ॥
বোদখানাতে হলদা পরগণা জানিবা সর্ব্বজনে।
সুদাম সখা পুরুষোত্তম পূর্ব্ব আখ্যানে ॥
সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুনসখা পূর্ব্বে এই খ্যাতি ॥
মাধবের সখা এই পাণ্ডব নহে।
হিরণগাঁ সাঁচড়া পাঁচড়া সর্ব্ব জনে কহে ॥
আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গ সখা যার নাম খ্যাতি ॥
খোলা-বেচা শ্রীধরের নবদ্বীপে বাস।

মধুমঙ্গল পূর্ব্বে এই জানিবা নির্যাস ॥
এই যে দ্বাদশ পাট হইল লিখন।
ভক্ত বাস যে যে গ্রামে শুনহ কথন ॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীহট্টে জন্ম হয়।
প্রভুর নিকটে আসি নবদ্বীপে রয় ॥
পণ্ডিতের ভ্রাতস্পুত্র তার শাখা হয়।
নয়নানন্দ মিশ্র নাম ভরতপুরে রয় ॥
আড়িয়াদহে গদাধর দাসের বসতি।
স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে সদা স্থিতি ॥
স্বরূপ ললিতা পূর্ব্বে জানিবা আখ্যানে।
বিসখিকা রামানন্দ জানিবা সর্ব্বজনে ॥
রামানন্দ রায়ের বাস গোদাবরী-তীরে।
দক্ষিণ দেশেতে বাস শ্রীবিদ্যানগরে ॥
পাট-পর্য্যটন মধ্যে না হয় গণন।
নীলাচল গেলে তার হয়ত ভ্রমণ ॥
কাঁচড়াপাড়া কুমারহট্টে শিবানন্দের স্থিতি।
পূর্ব্বে সুচিত্রা নাম ইহার হয় খ্যাতি ॥
কুলীন গ্রামেতে বসু রামানন্দের স্থিতি।
চম্পকলতিকা পূর্ব্বে যার নাম খ্যাতি ॥
মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ।
দুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটাখ্যান ॥
অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম।
এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ ॥
গোবিন্দঘোষ রঙ্গাদেবী বাসু সুদেবী কয়।
মাধবঘোষ তুঙ্গবিদ্যা জানিবা নিশ্চয় ॥
কোণ্ডরহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
ইন্দুরেখা সখী পূর্ব্বে জানিবা নির্যাস ॥
অনুবাদ বিধের নাম এইমাত্র হৈল।
এবে আর বিধের নাম লেখা নাহি গেল ॥

যে যে পরিক্রমা করিবারে হয়।
সে সকল গ্রাম লিখি জানিহ নিশ্চয় ॥
গ্রাম আর ভক্ত নাম করিয়ে লিখন।
অপরাধ ক্ষমা কর সর্ব্বভক্তগণ ॥
শ্রীমন্ত মহাপাট জানিবা সর্ব্বজন।
শ্রীখণ্ডে অনেক ভক্ত লভিলা জনম ॥
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
চিরঞ্জীব কবিরাজ আর সুলোচন ॥
সরকার ঠাকুর খ্যাতি করে ভক্তগণ।
অনেক ভক্ত জন্মহেতু মহাপাটাখ্যান ॥
কুলিয়া পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার।
বংশীবদন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর ॥
এই দুই গ্রামে তিনে সদত থাকয়।
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥
কাঁচড়াপাড়া কুমারহট্টের শুনহ কথন।
শ্রীকান্ত সেন কবিকর্ণ শ্রীরাম পণ্ডিত প্রকটন ॥
পানিহাটী গ্রামে রাঘব দয়মন্ত ধাম।
রাঘবের ঝালিবলি আছয়ে আখ্যান ॥
বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস।
সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তমদাস ॥
চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম ॥
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্রপণ্ডিত আদি বাস সবাকার ॥
বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর। *
বগনপাড়াবাসী শ্রীরামাঞি ঠাকুর ॥
গোপ্‌তিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি ॥

* বেলুন—বর্দ্ধমানজেলায় অন্তর্গত বড় বেলুন-গ্রাম।

জিরাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী।
যশড়াতে জগদীশ নিত্য বিনোদী॥
হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী-সুত।
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন-বিদিত॥ *
নতিগ্রাম জন্মস্থান স্থিতি দেন্দুড়াতে। †
শ্রীচৈতন্যভাগবত কৈল প্রচারিতে॥
বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের বাস।
নৈহাটীতে রূপসনাতন আছিলা নির্যাস॥
যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয়।
সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয়॥
পাট-নির্ণয়-গ্রন্থে ‡ আছয়ে বিস্তার।
তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার॥
পাটপর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল।
অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল॥

ইতি পাট-পরিক্রমা পাট-পর্য্যটন সমাপ্ত।

অভিরামচন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত।
তা সভার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত॥
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ॥
বুঢ়নগ্রামেতে হরিদাসের বসতি।
হেলাগ্রামে পাখীয়া গোপালদাসের স্থিতি॥
পাকমাল্যাটিতে বাস গুম্ফ্যানারায়ণ।
সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন॥
দাড়িয়ামোহন নাম বলে সর্ব্বজনে।
কিবা সে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে॥

---

* শ্রীবৃন্দাবনদাসকে কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ ব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

† দেন্দুড়া—ইহার বর্ত্তমান নাম দেন্দুড় বা দেন্দুড়, এখানে শ্রীবৃন্দাবনঠাকুরের পাট এখনও বিদ্যমান।

‡ পাটনির্ণয়-গ্রন্থ যদি কাহারও নিকটে থাকে, সন্ধান দিয়া বাধিত করিবেন।

মহিন্যামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম।
সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥
ভজমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান্ বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥
দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতোলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাসনিশ্চিত ॥
মালদহে মুরারি দাস করেন বসতি।
পানিহাটীতে ঠাকুরমোহনের স্থিতি ॥
রাধানগরেতে বাস যদুহালদার।
হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর ॥
মহেশগ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম।
কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥
পাটলাগ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ।
নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথদাস আখ্যান ॥
চুনাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর। §
পাতাগ্রামে ¶ বিদুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার ॥
বিষ্ণুপাড়াবাসী রামকৃষ্ণদাস নাম।
গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকরদাস আখ্যান ॥
গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস।
অঙ্গশাখা আচার্য্য জানিবা নির্য্যাস ॥
বিশ্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।
সাড়েচব্বিশ শাখার কহি নাম গ্রাম ॥
শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥

ইতি অভিরামচন্দ্রের শাখা-নির্ণয় সমাপ্ত।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

---

§ বোধ হয়, বর্দ্ধমানজেলার পাতুন গ্রাম, কারণ এই স্থানে অভিরামের এক শাখার নিবাস-ভূমি।

¶ রসকলিকা গ্রন্থ-প্রণেতা নন্দকিশোর দাস॥

দুইখানি অসমীয়া পুঁথি—কথাভাগবত ও সুকনাম্নি*

এই গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে যাহা প্রথমে উল্লেখ করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা ভারত-বর্ষীয় হিন্দুসাধারণের সর্ব্বজনবিদিত মহাগ্রন্থ—"শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র"। অসমীয়া ভাষায় ইহার দ্বাদশস্কন্ধের সুললিত এবং সহজ ও সুবোধ্যপূর্ণ পদ্যানুবাদ বিদ্যমান থাকা সত্বেও ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় ভট্টদেব গোস্বামী সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ রচনা করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন।

এখানে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু প্রকাশ করা আবশ্যক হইতেছে। সম্ভাবতায় ৺ শ্রীদামোদরদেব-গুরুর নাম এতদ্দেশীয় হিন্দুসন্তানগণের নিকট সুবিদিত। যে সময় মহাপুরুষ ৺ শ্রীশঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচার করেন, সেই সমসাময়িক কালে উপরোক্ত মহাত্মা পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্র স্থাপনে যত্নবান্ হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আসামদেশে মহাপুরুষীয়া সত্রবাদে যতগুলি সত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমস্তই প্রায় উল্লিখিত শ্রীদামোদর গুরুর অনুবর্ত্তী শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্দেশীয় মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় ভিন্ন অপর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে সুপরিচিত। শাক্ত-শৈবাদি অপরাপর সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উক্ত দুই সম্প্রদায়ের তুলনায় উল্লেখের অযোগ্য। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের বড়পেটা-সত্র যেরূপ কেন্দ্রস্থানীয়, দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের তদ্রূপ কেন্দ্রস্থানীয় পাটবাউসী-সত্র। বড়পেটা এবং পাটবাউসির ব্যবধান কিঞ্চিদধিক এক মাইল মাত্র।

৺শ্রীদামোদরদেব ইহসংসার হইতে বিদায় লইবার প্রাক্কালে তাঁহার প্রিয়শিষ্য এবং আত্মীয়-স্বজনের সমীপে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। এই যাচ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া দূর দূরান্তর হইতে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা স্বীয় স্বীয় কল্পনা ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার সুখাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন এবং যে যেরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সকলের আনীত খাদ্যের নাম শ্রবণ করিয়া ৺দামোদরদেব পরিশেষে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ভট্টদেব গোস্বামীর সংগৃহীত খাদ্যকেই পছন্দ করিয়াছিলেন। সেই খাদ্যবস্তু অন্য কিছুই নহে, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত অসমীয়া গদ্যানুবাদ গ্রন্থমাত্র। ইহা "কথাভাগবত" নামে আসামে সুপরিচিত।

উপাদেয় খাদ্য এ প্রকারে গ্রন্থে পরিণত হওয়াতে এবং তাহাতেই গুরু দামোদরদেব হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া সেই নবরচিত ভাগবতশাস্ত্র সর্ব্বজন-সমক্ষে পাঠ করিবার জন্য রচয়িতাকে আদেশ

---

* গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

প্রদান করাতে সকলেই পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। যখন ৺ভট্টদেব গোস্বামী তাঁহার ইষ্ট-দেব এবং ভক্তজনমণ্ডলীর সাক্ষাতে সর্ব্বপ্রথম 'কথাভাগবত" গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃ-মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় একাগ্রমনে পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পরম শান্তি-রসে আপ্লুত হইয়াছিলেন।

পাঠসমাপ্তির পর গুরু দামোদরদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি এবম্বিধ উপাদেয় খাদ্য চাহিয়াছিলেন। সংসারবিরাগী পুরুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অপর কোন পার্থিব খাদ্যই উপাদেয় হইতে পারে না। অনেকে ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার জন্য ক্ষণিক রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য তিনি নিরতিশয় দুঃখিত। ভট্টদেব গোস্বামী তাঁহার হৃদয়ের অভিলষিত খাদ্য-সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়াতে তিনি পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক যাচ্ঞা সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র ভট্টদেব গোস্বামীই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্মগদি-সংরক্ষণের উপযুক্ত লোক একমাত্র ভট্টদেব গোস্বামীই স্থিরীকৃত হইলেন।

তাঁহার বাক্যসমাপ্তির পর সকলেই লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া অধোবদন হইলেন। অবশেষে গুরু দামোদর স্বকীয় গলদেশ হইতে তুলসীর মালা উন্মোচন করিয়া ৺ভট্টদেব গোস্বামীর শিরে অর্পণ করিয়া অনুগত শিষ্য এবং স্বজনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমরা অদ্য হইতে ভট্টদেব গোস্বামীকে আমার স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিও। আমার প্রতিষ্ঠিত পাটবাউসী সত্রের গদিতে তিনিই অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া সকলেই ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পন্ন করিও। আমি এইক্ষণ তোমাদের এবং সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।" এই উপ-দেশ প্রদানান্তর তাঁহার জীবলীলার পরিসমাপ্তি হইল।

ভট্টদেব গোস্বামী পাটবাউসী সত্রের ভাগবতপাঠক ছিলেন। তাঁহার দশটী নামের মধ্যে "ভট্টদেব" ও "বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন" নাম দুইটীই আমার জানা আছে। অপর নাম এবং আবশ্যক অন্যান্য তত্ত্ব পাটবাউসী সত্রে অনুসন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান পাটবাউসী সত্রের অধিকারী গোস্বামী এবং তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ, তাঁহারই বংশধর।

পাটবাউসী সত্রের ভাগবতপাঠক ব্রাহ্মণকে সত্রের গদির ভার সমর্পণ করাতে ৺গুরু দামোদর দেবের ভ্রাতৃগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহার পাটবাউসী সত্রের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সত্রস্থাপনপূর্ব্বক ৺ দামোদর গুরুর ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সত্রের নাম অদ্যাপিও পোমারাসত্র নামে প্রসিদ্ধ। *

এক্ষণে কথাভাগবত গ্রন্থের রচনার পরিচয় প্রদান করিতেছি—

---

* দামোদর গুরুর ভ্রাতৃবংশধর পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্রদেব গোস্বামী সম্প্রতি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া দামোদর গুরুর পাদুকা কোচবিহার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নূতন সত্র প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পাদুকা সংরক্ষণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, আসামবাসী দামোদরী সম্প্রদায়ের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আরম্ভণ

শ্লোক ॥ যো লোকমোক্ষায় যশোবিতত্যৈ চকার লীলাং ব্রজবাসীভৃত্যৈঃ তং গোপবেশং প্রণমামি কৃষ্ণং সঙ্কীর্ত্তীগীতোদগতগোপপুষ্টং। শ্রীকৃষ্ণপাদযুগলাজস্থলুব্ধভৃঙ্গাঃ গায়ন্তি সজ্জনমনোহরশাস্ত্রমুচ্চৈঃ সম্প্রদায় কথয়ামি গাথাং মস্তকবৃন্দরটনায় সত্তাং জনানাং ॥

কথা ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণবিষ্ণু দেবকীনন্দন পরমানন্দ গোবিন্দঃ যো জগতঈশ্বর পুরুষোত্তমঃ সকললোকক কৃপায় অবতরি বহুবিধ লীলাকয়লঃ সেই গোপবেশ নন্দনন্দন-চরণে সহস্রকোটিবার প্রণাম করো ॥ যার নাম পাপহর ঃ পবনমঙ্গলমুকুতিদায়ক ঃ তাহান চরিত্র শ্রীভাগবতশাস্ত্র দ্বাদশস্কন্ধ তিনশত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ তাহার কথাবন্ধে কিছু নিবন্ধিতে চাঞঁ ॥ মঞিঁঅল্প-মতি ঃ তথাপি শ্রীদামোদরের আজ্ঞায়ঃ সন্তসবর অনুমোদনে টিকাভাষ্য অনুসারি সন্ধেপ প্রকারে নিবন্ধিবো প্রথমে প্রথমস্কন্ধ কহো ॥ বিশ্বসৃষ্টিআদি নবলক্ষণে লক্ষিত ঃ জগতর পরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে নমো ॥ বেদব্যাসঋষি প্রথমে নানাশাস্ত্র করিলা ঃ তথাপি মন প্রসন্ন নভৈল ঃ পরম খেদত শ্রীনারদের উপদেশে ঃ শ্রীভাগবত করিতে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকচিন্তন্ত ঃ যাহাত মিছাপ্রপঞ্চ প্রকাশে ঃ যাতহন্তে জগতর সৃষ্টিস্থিতিসংহার হয় ঃ প্রকৃতিপুরুষতপর ব্রহ্মারোজ্ঞানদাতা সত্য সর্ব্বজ্ঞ তাঁহাক চিন্তয়ো ঃ সকল শাস্ত্রত করি শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ ঃ যাক শ্রীনারায়ণে কহিছা ঃ যাত কহে পরমধর্ম্ম হরিভজন মোক্ষতো করি শ্রেষ্ঠ ঃ যাত ব্রহ্মজ্ঞান অযত্নে হয় ঃ পরম সুখ দেই ঃ তিনি তাপহরে ঃ আনশাস্ত্রে তার উক্ত সাধনেয়ো ঈশ্বরক সত্যে হৃদয়ত স্থিতি করিতে না পারে ঃ ইহার শুশ্রুষু সকলে তৎক্ষণে হরিক হৃদয়ত রাখে ; বুলিবা সবে কেনে সুশুনয় ঃ যতোপুণ্যবিনে শ্রবণত ইচ্ছা করিতে নাপারে ॥ বেদকল্পতরু ঃ তারফল ভাগবতশাস্ত্র ঃ কেবল অমৃতরস বৈকুণ্ঠে আছিল ঃ নারদে আনি ব্যাসক দিল ঃ ব্যাসো শুকক পঢ়াইলা ঃ শুকমুখে পৃথিবীত ব্যক্ত ভৈলা ঃ আকজানি হে রসিক সব সদায় পানকরা ঃ যাতো মুক্ত আদরে ঃ এন জানি সমাজিকসব শ্রীভাগবত সাবধান মনে নিত্যে শ্রবণ কীর্ত্তনকরা প্রথমে ডাকি হরিবোল হরি ॥ * ॥

প্রথম স্কন্ধ প্রথমোধ্যায় আরম্ভ

নৈমিষারণ্যত সৌনকাদি মুনিগণে বিষ্ণুপ্রাপ্তিঅর্থে সহস্রবৎসর যজ্ঞকরন্ত ॥ একদিনা প্রভাতে সর্ব্বকর্ম্ম করি পুরাণবক্তা সূতক আদরি প্রশ্ন করন্ত ঃ হে সূত তুমি পুরাণ ভারত ধর্ম্মশাস্ত্রচয় পঢ়ি ব্যাখ্যা করিছা ঃ আরো ব্যাসাদিমুনিগণে যি জানন্ত তাকো জানা ঃ যতো প্রিয়শিষ্যত গুরুসবে গুহ্যকো কহে ঃ সেই সেই শাস্ত্রত পুরুষর একান্তিক শ্রেয়স তুমি নিশ্চয় করি সুগমমতে কহ ॥ বুলিবা আঁমো বিচারি জানক ঃ তাক নপারে ঃ যাতো কলিযুগে লোক অল্পায়ু অল্পমতি অল্পভাগ্য ঃ আরো নানাতাপে তাপিত ঃ এতেকে বহুশাস্ত্র বিস্তাপি শুনিতে লোকে নপারে ঃ আকজানি তুমি সর্ব্বসার উদ্ধারি লোকর কুশল অর্থে কহ ঃ যাত লোকর মন প্রসন্ন হইবেক ॥ আরো প্রশ্ন করো ঃ ভগবন্ত দেবকীর গর্ভে কি নিমিত্ত উপ-

জিল। তাকশ্রদ্ধায়ে শুনিতে চাঞ : যার নামে সংসার হরে : যার ভক্তকদর্শনে লোক পবিত্র হয় : যারযশে কলিমল বিনাশে : এতেকে তাহান কথা কোনে মু শুনিব : আরো সৃষ্ট্যাদিলীলা কহ : যাক নারদাদিয়ো গায় : আয়ো হরির অবতারর কথা কহ : যাকশুনি তৃপ্তি নাই : যাতো ক্ষেণে ক্ষেণে স্বাদতো করি স্বাদু : আয়ো শ্রীকৃষ্ণর চরিত্র কহ : বলভদ্রসহিতে যে যে কর্ম্ম করিছা॥ আরো প্রশ্ন করো : ধর্ম্মর রক্ষক কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠক গৈলে ধর্ম্মে কাহাত শরণ পশিল : এহি চয় প্রশ্ন আমত বুঝাই কহ : হেন বুলিবা তোরা বজ্রদিত আকুল : কেমনে এতেক কথা শুনিবা : আমি কলিকাল দেখি তাক ভয়ে তরিবাক লাগি দীর্ঘসত্রপতি আছো : এতেক শুনিতে অবজয় পাই॥ শ্রীদামোদর পাদপদ্ম মধুব্রত কবিরত্নকৃতায়াং শ্রীভাগবতকথায়াং প্রথমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ হে কৃষ্ণ কৃপাময় : মহেশ্বর যাক জানিবাক লাগি ঋষি সয়েচয় প্রশ্ন করিলা : হেন ভগবন্ত কথা আরম্ভি তাঙ্ক প্রণাম করো : আকজানি সমাজিক সব ডাকি হরিবোল হরি॥

সমাপন।

দ্বাদশ স্কন্ধ ত্রয়োদশোধ্যায় আরম্ভ

শ্লোক। দ্বাদশস্কন্ধসম্বন্ধং প্রবন্ধেস্থ নিবন্ধিতং।
দ্বাদশে দ্বাদশোঽধ্যায়কথিতং হরিকীর্ত্তনং॥

কথা॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরাণর সংখ্যা কহিবা॥ সূতে বোলন্ত জানা শৌনক, আবে তোমাত পুরাণর সংখ্যা : ভাগবতর দান পাঠাদির মহিমা কহ॥ ব্রহ্মপুরাণের দশ সহস্র শ্লোক : পদ্মপুরাণের পাঞ্চমন্দ যাটিহাজার শ্লোক : বিষ্ণুপুরাণত তেইস হাজার : মার্কণ্ডেয় পুরাণত পোঁধরহাজার : বহ্নিপুরাণর সেহি মান : শিবপুরাণ চব্বিসহাজার : স্কন্দপুরাণ একশ একাসিহাজার : বামনপুরাণ দশহাজার : কূর্ম্মপুরাণর সতর হাজার : মস্তর চৌধ হাজার : গরুড় উনেশ হাজার : ব্রহ্মাণ্ডে বাড়হাজার : এমনে অষ্টাদশ পুরাণে চারিলাখ বুজিবা : তাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্রীভাগবত বুঝিবা : যাক ভগবন্তে কৃপায় ব্রহ্মাত কহিছা : যার আদি অন্ত মধ্যত বৈরাগ্য কহিছে : যার হরিলীলামৃতরসে সাধুদেব সবে আনন্দ লভে : যাতো সর্ব্ববেদর সারোদ্ধার এতেকে একবস্তুত নিষ্ঠা করাবে : কেবল ভক্তিক প্রয়োজন কহে : আক যি সুবর্ণ সিংহাসনত থৈয়া ভাদ্রর পূর্ণিমাত দান করে সি অবশ্যে পরম পদ পাবে তারে সে আন পুরাণ প্রকাশ করে : যাবত অমৃতসাগর ভাগবত ন শুনে যাতো আর রসে তৃপ্তজনর আনত রতি নহরে : নদীর মধ্যত যেন গঙ্গা : দেবর মধ্যত অচ্যুত : বৈষ্ণবর মধ্যত মহেশ তেমনে পুরাণর মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ বুঝিবা : এতেক শ্রীভাগবত বৈষ্ণব সবর প্রিয়॥ যাত পরমজ্ঞান কহে যার ভক্তিয়ে পুরুষমুক্ত হবে : যি ভগবন্তে কৃপায় ব্রহ্মত শ্রীভাগবত কহিছা ব্রহ্মারূপেয়ো নারদ কহিছা : নারদরূপেয়ো ব্যাস কহিছা : ব্যাসরূপেয়ো শুককদিলা : শুকরূপেয়ো পরিক্ষীতত কহিছা॥ হেন শুদ্ধবুদ্ধ

ভগবন্তক মঞি চিন্তো ॥ যাক ব্রহ্মারুদ্রইন্দ্রাদি স্তুতি করে : বেদেয়ো যাক গাবে যোগী সবে ধ্যানত যাক দেখে : যার অন্ত না জানে হেন পরমেশ্বরক প্রণাম করো ॥ যি মুনিয়ে পরিক্ষীত রাজক ভাগবত শুনায়া মুক্ত করাইলা হেন যোগেন্দ্র শুকক প্রণাম করো ॥ শ্রীভাগবতকথায়াং কবিরত্নকৃতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায় ॥ এহিমানে ইকরু গৈল ॥ হে সাধুসব মঞি শ্রীদামোদরর আজ্ঞায়ে সংখেপে ইকথা নিবন্ধ করিলো : অত যি অর্থ অন্তথা হৈল তাতমোত দোষ নে দিবা যতো মুনির মতি ভ্রম হয় : মঞি পুহ্ অতি অল্পমতি : তথাপি কৃষ্ণকথা বুলি সন্তোষ হৈবা ॥ যাতে সামান্ত বাক্যে হরিগুণ মিশ্র হৈলে মহন্তসবে শ্রবণ কীর্ত্তন করে : সেহি বাক্যেয়ো জগত শুদ্ধি করে : নারদ অক্রূর বাক্যত আর প্রমাণ আছে ॥ এতেকে মোক অসূয়া ন করি কথাক আদর করা যদি আপনার কুশল চাবে ॥ হে কৃষ্ণ কৃপাসাগর পরমানন্দ তোমার চরণত কোটীবার প্রণাম করো : একলেশ কৃপাকরা ॥ যেমনে তযুগুণ যশত মোর বাক্য-মন-কর্ণ বিরাম নহোক তেমন করা : যাতো তোমার চরণত শরণ পশিছো দীনক উপেক্ষা ন করিবা ॥ যাতো তুমি দীনদয়াল অনাথর বন্ধু পতিতপাবন : এতেকে আপুনার নামক সথের করি মোক কৃপাকরা : সমাজিক সব উচ্চকরি হরিবোল হরি ॥ সমাপ্ত ।"

এখানে কথাভাগবতের কথা শেষ করিয়া অপর গ্রন্থখানির সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ২য় গ্রন্থখানির মূল সর্ব্বজন-পরিচিত "পদ্মাপুরাণ"। ইহার গল্পাবলম্বনে কবিবর ৺ নারায়ণদেব একখানি গীতি-কাব্য রচনা করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। গ্রন্থখানি আয়তনে প্রায় রামায়ণের সমান হইবে। গ্রন্থের নাম "সুক-নান্নি" বলিয়া এদেশে সুপরিচিত। সমস্ত গ্রন্থখানি গীতিচ্ছন্দে বিরচিত। আসাম-দেশে দুর্গাপূজা এবং মনসাপূজার উৎসবোপলক্ষে গায়কেরা খুটীভাল সংযোগে উক্ত গ্রন্থের আখ্যায়িকা সকল গান করিয়া থাকে। মনসাদেবীর পূজার সময় বেউলা লক্ষীন্দরের আখ্যায়িকা গান করা পূজার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। দরঙ্গ-জিলার লোকের মধ্যেই এই গায়কের দল সমধিক। কারণ এই গ্রন্থ দরঙ্গরাজের অনুজ্ঞায় তাঁহার সভাপণ্ডিত কবিবর নারায়ণদেব রচনা করেন এবং উক্ত রাজা-কর্ত্তৃক এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ লোক সংগ্রহ করিয়া গায়কের দল সংগঠনপূর্ব্বক নবরচিত গীতি সকল শিক্ষাদান করেন, সুতরাং সর্ব্বপ্রথম দরঙ্গ জিলাতেই এই সমস্ত গীতি সুর-সংযোগে প্রচারিত হয় এবং ক্রমশঃ বর্ত্তমান কামরূপ জিলা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থকারের পরিচয় আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। দরঙ্গরাজপরিবারের বংশধর-গণের সমীপে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার পরিচয় জানা যাইতে পারে; দরঙ্গরাজ কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা, চিলারায়ের বংশধর।

এই খানে প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল। গ্রন্থের পরিচয় দিবার জন্ত "সুকনান্নি" গ্রন্থ

হইতে আরম্ভণ এবং মধ্য খণ্ডের কতকগুলি পদাবলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। সহৃদয় পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

সুকনাম্নির গল্প-আরম্ভণ

ধুয়া ॥ আজি ঘরে রহণ না যাইনারে মুরারির গাণ শুনিয়া ॥
পদ ॥ রাম রাম বোল ভাই রামনারায়ণ।
তথুপায়ে পদ্মাবতী লৈলোক্যে শরণ ॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্ত হোক পাপী।
অন্তকালে উদ্ধারিয়ো রাম বিষ্ণুরূপি ॥
একমনে পুস্থ কথা শুন বুদ্ধজন।
মুনিমুখে শুনি কিছু সৃষ্টির পত্তন ॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর যত কবিগণ।
সনক সনাতন আর নারদ তপোধন ॥
হরষিত হইয়া সকল মুনিগণ।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিলা লোমস তপোধন।
লোমসে কহিলা কথা শঙ্করের ঠাই।
পূর্ব্বের বিবরণ কথা কহতো গোঁসাই ॥
স্বর্গ মঞ্চ পাতাল হইল কেনমতে।
সত্ব রজ তমগুণ হৈল কার হওে ॥
কিমতে হইল শুনি সমুদ্রমথন।
কিকারণে ভস্ম হৈলা দেবতা মদন ॥
কিকারণে যোগভঙ্গ হৈল মহেশ্বর।
কিকারণে জন্মিলা চণ্ডী হিমালয় ঘর ॥
কিকারণে পুষ্পধারি গৈলা ত্রিপুরারি।
কেমন প্রকারে জন্ম হৈল বিষহরী ॥
সনকে শুনিয়া ভেবে লোমশ বচন।
নিরঞ্জন কল্পমায়া হৈল নারায়ণ ॥
সেতুই করিয়া মুখে বাহির হইল।
সেহি সে সেতুকাদেবী নামক ধরিল ॥
ধরিতে চাহিলা তার পীড়িত মদন।
চারিদিশ হইতে হৈল মুখর বচন ॥
তাতে ধরিয়া তারে বসাইলা উদরে।

নহে স্ত্রী নহে পুরুষ অক্ষয় শরীরে ॥ •
অধোভাগে গুপ্তঅঙ্গ বিদারিলা নখে।
কেলিকলা কৌতূহল করে নানা সুখে ॥
বিশ্বহৈতে গাছ হৈল রাত্রি হৈতে দিবা।
সত্ব রজ তমগুণে জন্মিল তিনি দেবা ॥
সত্বগুণে বিষ্ণো হৈল ব্রহ্মা রজোগুণে।
তমোগুণে মহেশ্বর জানে ত্রিভুবনে ॥
ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি বিষ্ণুরূপত পালন।
শিবরূপে সংহার করয় ত্রিভুবন ॥
সনকে কহিল কথা লোমশ বড়াবড়।
যিবারূপে হৈল তাহা অবধান কর ॥
দেবীক পাঠায়া তবে মহাদেবের ঠাই।
নিরাকার হৈয়া ভাসে অনাদি গোঁসাই ॥
বটপত্রে নিতে যেবে করিয়া শয়ন।
যোগনিদ্রা আরম্ভিলা তেয়াগি চেতন ॥
ছুইপায়ক ধরিআছো সংশয়ে আঙ্গুলি।
বালকরূপে দিলা হাত + + + +
অনেক অনন্তরে সে জলত ভাসিল।
মধুকৈটভ ছুই অসুর জন্মিল ॥
তার পুণ্যকথা তুমি করিয়া স্মরণ।
কহিব তোমার আগে সব বিবরণ ॥
বেকতে শুনিলে হয়ে পাপর বিনাশ।
রাহুয়ে ছারিলে যেন চন্দ্রর প্রকাশ ॥
একে একে যত কথা জিজ্ঞাসিয়া তুমি ॥
শুনহ সকলকথা কৈয়া দিবো আমি।
সুকবিবল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ ॥
এক লেচারি কহি অনাদি জনম ॥

লেছারি পঠমঞ্জরীরাগ

শুনিয়া লোমশ বাণী বুলিলা সনক মুনি
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোতে।
বিরূপে নিরঞ্জন সৃষ্টি কৈলা পত্তন
শুনহ শুনহ এক চিত্তে ॥

স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নাছিল মেরুমন্দর,
নাছিল পবনর গতি।
আন্ত অন্ত নাহি জানি শূন্তে উপজিলা বুনি,
নিরঞ্জন তৈলা উতপতি ॥
নাভি হৈতে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান চৈতন্ত হয়,
পরমপুরুষ তাহা স্থিতি।
নারূপে উতপত্তি দ্বিতীয়া নাহিকে স্থিতি,
এক পুরুষ নিরঞ্জন
\+ + + + ইত্যাদি।

দিহা ॥ বেহুলা জাগ উঠা মোর প্রিয়া ॥
উঠ উঠ অহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাস।
মোক খাইলা কিবা নাগে চক্ষুমেলি চাস ॥
তঞিঁ হেন অভাগিনী নাই ক্ষিতিতলে।
অকালত রারী হৈলি খণ্ডব্রতর ফলে।
কত জন্ম খণ্ডব্রত কৈলি গুরুতরে।
অকালত তোকে এড়ি যাঁও লক্ষীন্দরে ॥
মাও মরিবেক মোর মরণ শুনিয়া।
অনলত ঝাম্প দিয়া মরিবো পুরিয়া ॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাইলো আলিঙ্গন।
লজ্জার কারণে তুই নু তুশিলি মন ॥
সুকবি নারয়েণদেবের সরস পঞ্চালী।
লখাইর বচন বুলি এক যে লেছারী ॥
দিহা। উঠ কমলমুখী জাগ প্রিয়া কতনিদ্রা কবা মুখে।
পদ। তোমার যতেক নিদ্রা কালনাগে দিলা ছিদ্রা
মরি যাঁও মই যমের ভুবন।
আমি তুই একে সঙ্গে মেয়ত আছিলো রঙ্গে,
কোন দেবে দংশিল নাজানো ॥
তোমার আমার বিহা, বিষে মোর প্রাণ যায়,
মইলে দুখ মিলিবো অপার।
কিবা আজুলির বিষে, সর্ব্বাঙ্গে জলিলা বিষে,
পুরোহিত আনহ্ সত্বর ॥

আঠুমান পালাক বিষে নাজানোমোক খাইলা কিসে
যায় বিষ উজান কোবায় ।
উরতমান পাইলো বিষে নাজানো মোক খাইলো কিসে
সর্পর বিষ বজ্রর সমান ।
কোকাল মান পাইলা বিষে, নাজানো মোক খাইলা কিসে
সর্পর বিষ দগধে পরাণ ।
পেটমান পাইলা বিষে নাজানো মোক খাইলা কিসে,
যায় বিষ সহস্র নালায় ।
বুকত ধরিলা বিষে নাজানো মোক খাইলো কিসে
নাই লখাইর বদনর হাস ।
নাসিকাত ধরিলো বিষে নাজানো মই খাইলা কিসে
নাই লখাইর নাকর নিশ্বাস ।
সুমরিয়া হরিহর প্রাণ ত্যজে লক্ষীন্দর
ঢলিপরে পালঙ্কির উপর ।
নারায়ণদেব কন সুকবি বল্লভে হয় ।
কালিনাগে খাইলা লক্ষীন্দর ।

"কথাভাগবত ও সুকনান্নি প্রবন্ধের পরিশিষ্ট"

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়—আসামপ্রদেশের এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় জানিতে পারিয়াছি—

কথাভাগবত—এই গদ্যগ্রন্থখানি হস্তলিখিত পুঁথির আকারে অবস্থিত। অতি অল্পাংশমাত্র আসামীয়া ইণ্টারমিডিয়েট্ ও বি, এ, পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্যগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। উত্তমবাবুর বাড়ীতে যে গ্রন্থখানি আছে, তাহা প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। উহা সাচীপাতে অর্থাৎ অগুরুত্বকে লিখিত, প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভট্টদেব গোস্বামী শকাব্দা ১৪২১ সনে কামরূপের বজালি অঞ্চলে বিছানকুস গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫০২ শকে দেবদামোদর কর্ত্তৃক পাটবাউসি সত্রের অধিকারী নিযুক্ত হন এবং ১৫০৯ শকে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বংশধর বর্ত্তমান কেহ নাই। বর্ত্তমান পাটবাউসি সত্রাধিকার ভট্টদেবের ভ্রাতার অধস্তন দশম পুরুষ। ভট্টদেব যে সময়ে অসমীয়াভাষায় এই গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ কিছু ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, আশাকরি পরিষদের কোনও অভিজ্ঞ সভ্য তদ্বিষয় আলোচনা করিবেন।

সুকনান্নি—এখানিও হস্তলিখিত পুঁথি। আজ প্রায় ৬০ বৎসর হইল উত্তমবাবুর পিতৃদেব মহাশয় একখানি প্রাচীন সাচীপাতের পুস্তক হইতে একখণ্ড পুঁথি নকল করাইয়াছেন,

দুই তিনদিন মধ্যে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার পুঁথিখানি নকল করাইতে তাঁহাকে বহুলোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই পুঁথি কামরূপে কমই আছে, দরঙ্গ ও দুই এক স্থলে থাকার সম্ভব। সুকনান্নি নামের তাৎপর্য্য এই। ইহা সুকবি নারায়ণ দেবকর্ত্তৃক রচিত হওয়ায় ইহার নাম 'সুকবি নারায়ণী' হইয়াছিল, তৎপর বর্ত্তমানে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'সুকনান্নি' হইয়াছে।

আমি বাল্যাবধি পদ্মাপুরাণরচয়িতা নারায়ণ দেবের কথা স্বদেশে (শ্রীহট্টে) শুনিয়াছি, তাঁহাকে আমাদের অঞ্চলের লোক বলিয়াই ভাবিয়াছি, তাই উত্তমবাবুকে নারায়ণদেবের জন্মস্থানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি লিখিয়াছেন যে নারায়ণ দেবের জন্মস্থান কোথায় ছিল তিনি তাহা অবগত নহেন। তবে তাঁহার রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীয় কথার অনুযায়ী এবং তিনি দরঙ্গের রাজার অনুজ্ঞায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইমাত্র বলিতে পারেন।

কামরূপের লোকেরা নারায়ণদেবকে তাঁহাদেরই আপনার লোক বলিয়া দাবীদাওয়া করেন। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন—"আমাদের শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রবাদ এই যে, নারায়ণদেব ও কবিবল্লভ শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী হবীগঞ্জের উপরিভাগস্থিত নগর গ্রামে বাস করিতেন, উহারা উভয়ে মিলিয়া পদ্মাপুরাণ রচনা করেন তাই "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভে হয়" এইরূপ ভণিতা পদ্মাপুরাণে দেখা যায়। তৎপর কোন কারণে নারায়ণ ও কবিবল্লভ বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। নারায়ণদেব পশ্চাৎ জন্মস্থানেরই অনতিদূরবর্ত্তী ময়মনসিংহ জিলার বোরগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে নাকি আজিও তাঁহার বংশধরগণ আছেন। হইতে পারে দুইবন্ধু কবিখ্যাতি সম্বল করিয়া এই আসামপ্রদেশে আসিয়া "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই বচনের আর একদৃষ্টান্ত দেখাইয়া দরঙ্গরাজার সভায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় ভাষায় স্বরচিত পদ্মাপুরাণের এক সংস্করণ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। ক্রিয়া ও কারকের ঈষৎ পরিবর্ত্তন দ্বারা এই ভাষান্তর অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে, তাহা এই অসমীয়া 'সুকনান্নি' ও বঙ্গীয় নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ তুলনার সমালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজসভায় সম্মান লাভ করিয়া নারায়ণ প্রবীণ বয়সে বোরগ্রামে গিয়া অবস্থান করিতে পারেন। আবার কবিবল্লভ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাঁহার বংশধরেরা রঙ্গপুরের অন্তর্গত সুন্দর গঞ্জথানার চোরতাবাড়ীগ্রামে থাকিয়া আজিও পদ্মাপুরাণের গীত গাহিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন।

"সুকনান্নি" ছাড়াও কামরূপ অঞ্চলে অপর পদ্মাপুরাণ আছে তাহা অসমীয়া কবি দুর্গাবর রচিত "বিষহরীর পুঁথি"—ইহার বিষয় গৌহাটির বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী-সভার ষষ্ঠ অধিবেশনে "অসমীয় পদ্মাপুরাণ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস মহাশয় আলোচনা করিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে আসাম অঞ্চলের নানাস্থানে পদ্মাপুরাণবর্ণিত ঘটনার স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়াজিলার হেড কোয়ার্টার 'ধুবড়ী'ই নাকি নেতাধোবানীর স্থান ছিল, ধোবাবুড়ী হইতে ধোবুড়ী বা ধুবড়ী নাম হইয়াছে। সহরের একটি পাষাণময় ঘাট নেতাধোবানীর ঘাট বলিয়া আজিও পরিচিত।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

বহুদিবস যাবৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ এবং একখানি উৎকৃষ্ট অভিধানের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন জন্য বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা ১৬।১৭ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, যে সকল গ্রন্থ আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি তাহারই ভাষা আদর্শগ্রন্থের ভাষা হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। কোনও একখানি গ্রন্থ অপরিবর্ত্তিত বা অবিকৃত আকারে পাইয়াছি বলিতে পারি না। আবার যে গ্রন্থের যত অধিকসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, সে গ্রন্থের পাঠবিকৃতির মাত্রাও তদনুরূপ। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনামধ্যে প্রক্ষেপের আতিশয্যের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। এমতস্থলে চণ্ডীদাসের পদাবলী যে অবিকৃত আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বলা যায় না। পরম ভাগবত স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্ব্বাগ্রে চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু ও রমণীবাবু যথাক্রমে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ও চণ্ডীদাস নাম দিয়া দুইটী পৃথক্ সংস্করণ বাহির করেন। রমণীবাবুর সঙ্কলনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ স্থান পাইয়াছে। অধুনা শ্রীযুক্ত নীলরতনবাবু ও শ্রীযুক্ত শিবরতন বাবুর চেষ্টায় অনেক পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতন ও নূতন পদ লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০০ শত হইবে। প্রথমতঃ ঐ সমুদায় পদের ভাষা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। পদগুলির ভাষা যে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ অপরের পদ যে কবিকুলরবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহা কে বলিবে। কবির সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে তখন তাহার সুমীমাংসা হইবে।

অতঃপর আমরা চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এর কথা বলিব। কৃষ্ণকীর্ত্তন বর্ণজ্ঞানহীন পুঁথিলেখকদিগের হাত এড়াইয়া এবং জয়গোপালগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে! গ্রন্থখানি বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অযত্নে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্রবংশধর। পুঁথিখানি বাঙ্গালা তুলোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা, ২২৬ পত্রের পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধার

বিরহখণ্ড। কৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। অক্ষরগুলি অনেকটা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ। পুঁথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুররাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এমনও হইতে পারে উহা মহারাজ বীরহাম্বীরের অধীনস্থ দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর অন্যতম। উহার ভাষা বর্ত্তমানে সঙ্কলিত কবির যাবতীয় পদাবলীর ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। চণ্ডীদাস প্রথম বয়সে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' রচনা করেন। পদাবলীর তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শব্দযোজনার একটু পারিপাট্য ও উপমার কিছু বাহুল্য আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনপাঠে বেশ উপলব্ধি হয় কবি তখনও পাণ্ডিত্যাভিমান পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রচলিত পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। তাহাতে কোথাও আড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই। এক্ষণে কবির সে পণ্ডিতাভিমানী পূর্ব্বভাব চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল, আত্মহারা, তাই পদাবলীর ভাষা এতটা সরল, তরল ও প্রাঞ্জল অথচ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক। তবে উভয়ত্রই কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য ও ভাষার লালিত্য সমানভাবে বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল—

জন্মখণ্ড।

আরম্ভ—

পৃথ্বভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সংরম্ভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ॥

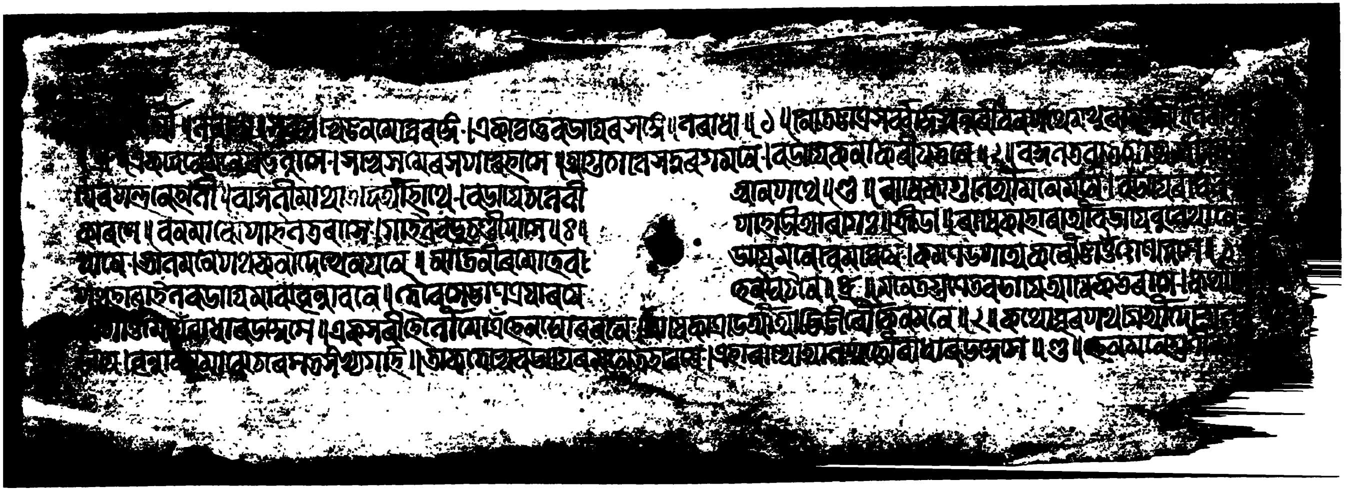
কোড়া রাগঃ॥ যতিঃ॥ দণ্ডকঃ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে॥ ১॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সভ্যেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ॥ ২॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে॥ ৩॥
তোহ্মে নানারূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলারে কংসের বধ হএ॥ ৪
হেন শুনী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে॥ ৫
এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেব ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে॥ ৬
তাহার হাতে হৈবে কংসাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেবে গেলা বাসে॥৭॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা এইরূপ—

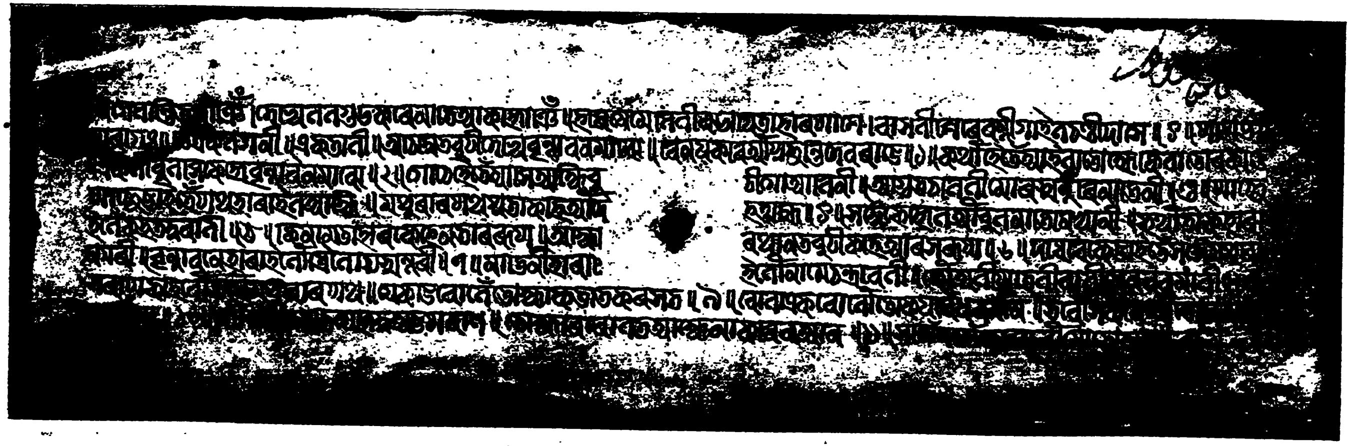
কোড়া রাগঃ॥ একতালী॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ুরের পুচ্ছ দিল সুবেশ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্যে উন্নত বিশালে॥ ১
সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী॥ ধ্রু॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়নকমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল॥ ২॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করকরবিন্দ-মাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষ(ঃ) স্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল॥ ৩॥



চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথির ৬ পত্র (১ম পৃষ্ঠা)

Visvakosha Electro-Machine Press.



চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথির ৬ পত্র (১ম পৃষ্ঠা)

মাণিক রচিত চন্দ্র সম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধকারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীতবসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥

শ্রীরাধার রূপবর্ণনা—

ধানুষী রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহাঞিঁ রসসম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১
তে কারণে পদুমাউদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল আল রাধা ॥ধ্রু
তীন ভুবন জনমোহিনী।
রতিরস কামদোহিনী ॥
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনক পুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জানী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপযৌবনে।
মাঅক বুলিল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর রূপ—

গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার আনে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীর মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাটবাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাজিল দুই পাশে ॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি ॥ ২ ॥
মাহাপুটনাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনী ॥ ৩।
কাঠিসম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বর্ণনাটী বড়ই স্বাভাবিক।

তাম্বূল খণ্ড।

পাহাড়ীআ রাগঃ। ক্রীড়া।

তোর মুখে সুনী　　রাধিকার রূপ
　আওর নব যৌবনে।
অহোনিশি দহে　　সকল পরাণ
　আর থীর নহে মনে ॥
এড়িলোঁ ঘরের　　আশ ল বড়ায়ি
　কহিলোঁ তোর চরণে।
মতি হারাইলোঁ　　বুলিতেঁ না জানো
　ভইলোঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল　　নিরাস বড়ায়ি
　আপণে চিন্ত উপাএ।
রাধার বচন　　না পাইলেঁ বড়ায়ি
　কাহ্নাইর প্রাণ জাএ ॥ ধ্রু ॥

আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি
মনে না করিহ হেলা।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মোসি আহ্মার ভেলা॥
আজি হৈতে বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভরিলা দাসে।
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন
চলহ রাধার পাশে॥ ২॥
বিথর দেখিলেঁ বিথর শুনিলেঁ
বিথর তোর বএসে।
এতেকেঁ এসব কাজের প্রকার
জানহ আশেষে বিশেষে॥
নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি
রাধারে করহ মিনতী।
মোর একবার কর উপকার
খণ্ডুক রাধার বিমতী॥ ৩॥
পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি
তাম্বুলেঁ ভরাআঁ ডালী।
মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥
আহ্মার বচনে বোলহ রাধারে
কাহ্নের পুরুক আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

দানখণ্ড।

পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥

তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব
দুর্জ্জন মথুরাপুরী।
বোল দিআঁ তোএঁ মোরে আনিলেঁ
মোর আন্তরের বৈরী॥
ঘৃত দধি সব খাইল কাহাঞিঁ
পাখাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চুলী ভাগিআঁ তন বিগুতিল
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা॥ ১॥
কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক
কত লিখি দুখভারে।
তে কারণে বিধি —দুখগণ
লেখিল সাঠীহারে॥
করলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ॥ ২॥
জরম গেল করমের খণ্ড
কাল কাহাঞিঁর হাথে।
মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ
সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে॥
কিবা চাহে কাহ্ন বাটে রহাএ
বুঝিতেঁ নারোঁ তার মণে।
রাজা কংসাসুর অতি দুরাচার
সে জণি এহাক শুনে॥ ৩॥
এড়ু দামোদর ঝাঁট জাওঁ ঘর
দিআরু মোকে মেলানী।
রাজা কংসাসুর সুণিলেঁ পাছেঁ
ফল পাইবেঁ চক্রপাণী॥
উলটি রসিআঁ সুন্দরি রাধা
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

নৌকাখণ্ড।

দেশাগ রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

মথুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ॥
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ॥

যে বোল তোরে বোলোঁ মোঞঁ রাধা ল
তাত না করহ আন।

অহিত না বোলোঁ। মোএঁ রাধা ল
　এহা সন্নপেসি জাণ ॥ ১ ॥
চিরদিন মথুরাক না জাহা ল
　কেহ্নে নঠ কর দহী ॥ ধ্রুঁ ॥
গোআল জরম আহ্মে শুণ
　দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে
　তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২ ॥
আনহ সকল সখিজন
　মেলী করিউ যুগতী।
তবেঁ মথুরাক জাইএ
　সঙ্গে হআঁ একমতী ॥ ৩ ॥
পসার সাজিউ দধি দুধে
　সেসি জীবার উপাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দী রাধা ল
　বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভারখণ্ড।

গৌরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কতখনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আঘল দহী।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥১॥
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী।
না বহিতেঁ ভার যবেঁ ধরোঁ-আন ভারী ॥ধ্রু॥
ষোলশত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥২॥
সব সখি গেলেঁ কাহাঞিঁ হৈবোঁ একসরী।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মে লাজেঁ মরী ॥
তোহ্মার মুখত কাহাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ।
ফুরাঅাঁ না দেহ তোহ্মে ভৈসি একো কাজ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহাঞিঁ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ভাটিআলী রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিষধিতেঁ কাহাঞিঁ　দধি দুধের ভার
　আপণ ইছাএ লৈবেঁ।
পরার নারী　　আকাশের চান্দ
　তাহাক কেমনে পাইবেঁ ॥ ১ ॥
লড়হ না কেহ্নে　নিলজ কাহাঞিঁ
　এড়িআঁ দধির ভারে।
ঘৃত দুধ দধি　　নঠ না কর
　জাউঁ মথুরা নগরে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন　　শুণ কাহাঞিঁ
　না লইহ দধির ভার।
কভোঁ না মানিবোঁ　সুরতী তোরে
　আপণে নিবোঁ পসারে ॥ ২ ॥
দাণ আধিকার　　নাহিঁক তোহ্মার
　কিকে মরিষহ দাণে।
বড়ই নিলজ　　নান্দের নন্দন
　ঘর জাহা নিজ মানে ॥ ৩ ॥
কথাঁ দেখিল　　বাঁওন হাথে
　তালতরু ফল পাএ।
বাসলী চরণ　　শিরে বন্দিআঁ
　বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ।

ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড।

রামগিরী রাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে।
দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকলিআঁ রঙ্গে।
পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥
হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলীবর।
কাহাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ মথুরানগর ॥ ১ ।

শরতের রৌদেঁ রাধা বড়ায়ি বিকলী।
বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসিলী ॥ধ্রু॥
বিনয় বুইল রাধা বড়ায়ির পাএ।
দেখ সব সখিগণ আহ্মা এড়ি যাএ ॥
না জাণো কি বোলে তথাঁ আইনের মাএ।
সকল ঠায়িত মোর তোহ্মেঁসি সহাএ ॥২॥
সখি সম্বোধিআঁ কিছু বুইল চন্দ্রাবলী।
তোহ্মার বিদিত মোএঁ যে হেন কৌঅলী॥
রৌদ পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর।
বুলিহ সাসুড়ী থানে এসব উত্তর ॥ ৩ ॥
আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে।
চারি পাশ চাহে রাধা তরল নয়নে।
দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিল ছেপাশে
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪॥

বৃন্দাবনখণ্ড।

দেশবরাড়ী রাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেত বেণু বাজাএ যতনে॥ ১ ॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাকে চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে ॥ধ্রু॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকে করএ কাহ্ন অতি বহুমানে ॥
পাখি বসিতেঁ তরুপাত চলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥
চাহে দশদিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কতখনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে ॥
গলিত বসনহীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লব শয়নে ॥ ৪ ॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল শুণী ॥
এবেঁ আয়ু গত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥

পাহাড়ীআ রাগঃ॥ ক্রীড়া॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন-রুচি তোহ্মারে।
হরে ছুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে।
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন-চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥
মদন-বাণে দগধ-ভৈলোঁ
তোর আকারণ মাণে।
বদন-কমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ সভোঁ কোপ করিলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধার কোকনদরূপে।

মদন বাণে　　কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁহ
　এ তোর আছুরূপে ॥
এ তোর কুচ　　শোভে মণি জঘনে
　নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত　　করেঁা মো তোহর
　থল কমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল　　খণ্ডন রাধা
　মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব　　আরোপ রাধা
　মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আন্ধার　　মদন বিকার
　সত্বরে করহ আদেশে।
বাসলী চরণ　　শিরে বন্দিআঁ
　গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

উপরি উদ্ধৃত পদদুইটী 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং' এবং 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং' পদদ্বয়ের কেমন সুন্দর অনুবাদ !

যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড ।

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ত্রিভুবন নাথ তোহ্মে হরী ॥
প্রভু হরিআঁ হেন নাহিঁ করী। ল কাহ্নাঞি ॥১॥
জগত না সহে তোহ্মার দাপ। আল।
কোণ ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥
তোহ্মে নিরমিল ত্রিভুবনে।
জল থল জীবজন্তুগণে ॥ ৩ ॥
সাপেরেঁ করিআঁ বিষ দাণে।
এবেঁ কেহে হরহ পরাণে ॥ ৪ ॥
সামী মোর সেবক তোহ্মার।
তোহ্মে এথাঁ দিলেঁ আধিকার ॥ ৫ ॥
মূঢ় সাপ জলের ভিতরে।
না জানিআঁ দংশিল তোহ্মারে ॥ ৬।
বারেক মোরে দয়া কর।
সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥
সুনিআঁ কাহ্নাঞির ভৈল তোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

যমুনাখণ্ড।

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যাই যমুনার　　পাণিকে আইস
　সখি মোর সঙ্গে।
যমুনার জলে　　কুম্ভ ভরিআঁ
　আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা　　কলসী লআঁ
　জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে　　বদন তাহার
　যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥১॥
আল।
পাইল রাধা　　কালীদহ-কূল
　লইআঁ সখিসমাজে।
ঘাটত ভেটিল　　নান্দের পো
　কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ　　গোপনারীগণ
　লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞির মুখ　　কমল দেখিআঁ
　কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল　　করেঁ ধরিতেঁ
　খসিল দেহ বসনে।
ওহার এহার　　মুখ চাহে সব
　কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥
তখন নয়ন　　নিমেষ না কৈল
　দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল　　যুবতী রহিলা
　যেহ কনক-পুতলী ॥

এথো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণিএক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে ॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্ন মতেঁ বুঝিল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

বালখণ্ড।

ধানুষী রাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥

খোঁপা পরতেথ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
কেশপাশে নীল বিগুমানে। এআ।
সিসের সিন্দুর সূর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ। ১ ॥
সুণ বড়ায়ি ল।
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে ॥ ধ্রু ॥
নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু পাশে কম্ন
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহুদণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥
বলি বসে নাভিতলে পৃথু নিতম্বযুগলে
মাঝদেশে সিংহ বিদ্যমানে।
জঘনে বসে নূপুরু আতিশয় রুচিগুরু
পদনখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥

হাথে ধরী ধনুবাণে কাহ্ন আসু বিগুমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে।
বোল দূতা কাহ্নপাশে গাই বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

বংশীখণ্ড।

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরাতুরাতুরা।
যমুনাতীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদং ॥

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
মো যমুনার তীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলো যমুনানীরে ॥
বড়ায়িল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণে বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥১
বড়ায়িল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে
কুসুমশোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
অহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুখ কহিব কাএ।
কাহ্নের ভাবে চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনা তীরে কদমের তলে
কাহ্ন মোরে দিলে কোলে।
তাহা সঁঅরিয়া বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্ন বিরসিল ভোলে ॥ ২ ॥
চারিদিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।

আষড়ালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণ ঘাএ ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ একখন
একযুগ যুগ ভাএ ॥ ৩ ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে ॥
এবেঁ আনিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুরত আহ্মার আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪ ॥

রাধার বিরহ।

দেশাগ রাগঃ। ক্রীড়া॥

তনের উপর হারে। আল।
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।
সরস চন্দন পঙ্কে। আল।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥১।
আল।
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কুসুম-শর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি একপাশেঁ ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশন দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২ ॥

দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥
বাম করেতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥
চলিতে তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলী চরণ বন্দী গাইল বড়ু
চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পদটী জয়দেব কৃত 'স্তনবিনিহিতমপি হার মুদারং' গীতেরই প্রতিধ্বনি।

বিভাষ রাগঃ॥ রূপকং॥ যতির্ব্বা॥

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥
করে মনসিজ-শর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পারিতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞি ল।
রাধা বিরহ দহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে ॥ ধ্রু ॥
অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥
সবখন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার
করে ॥ ২ ॥
নয়ন শলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চান্দ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥৩ ॥

তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে। বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥ দশ দিশি দেখে রাধা চকিত নয়নে॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে। দয়া করি এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥ ৪॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥(১)

পদগুলি এতই সুন্দর, এতই মধুর যে কোনটী রাখিয়া কোনটী উঠাইব স্থির করা কঠিন। যাহাহউক, এখন আমরা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক কবি চণ্ডীদাস ঠাকুর অঙ্কিত প্রথম আলখ্যের একটী নিখুঁৎ আদর্শ পাইলাম ভাবিয়া আনন্দ করিতে পারি। আলেখ্য-খানি এতাবৎকাল অপেক্ষাকৃত বিরল অন্ধকারের আবরণে আবৃত ছিল বলিয়া বর্ণটী বেশ উজ্জল রহিয়াছে। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' কবির সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের এবং তাঁহার ছন্দা-লঙ্কারপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি তাঁহার রচিত 'চণ্ডীর' (দেবীমাহাত্ম্য) একখানি উপাদেয় টীকা আছে। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের ভাষা বিচিত্র; উহাতে মৈথিলপ্রভাব সমধিক প্রবল। এরূপ প্রাকৃত শব্দবহুল বাঙ্গালা পুস্তক আর আছে কি না আমাদের জানা নাই। পুথিখানির বর্ণবিন্যাস প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে।

কবির পিতা (২) নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলীর আরাধনা করিয়া পুত্ররত্ন লাভ করেন এবং সেই হেতু পুত্রের নাম রাখেন চণ্ডীদাস। কবির আর একটী নাম ছিল "অনন্ত"।

মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ। দেবী বাসলীগণে॥
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ (কৃষ্ণকীর্ত্তন দানখণ্ড।)

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল আনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী চরণে॥ দেবী বাসলীগণে॥
গাইল আনন্তবড়ু চণ্ডীদাসেঁ (কৃষ্ণকীর্ত্তন বৃন্দাবনখণ্ড।)

'বড়ু' শব্দটী উপাধিবাচক। বাঁকুড়া অঞ্চলে 'বড়ু' উপাধি ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও প্রচলিত দেখা যায়।

গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে উহা কাব্যামোদীর নিকট যেরূপ আদরের বস্তু হইবে, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সকাশেও সেইরূপ অথবা ততোধিক প্রীতির সামগ্রী হইবে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

(১) এ পদটীও জয়দেবকৃত 'নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং' পদের অনুকরণে রচিত।

(২) চণ্ডীদাসচরিতলেখক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় ১৩৭৩ শকে লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথির একস্থলে ভবানীচরণ নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ভৈরবীদেবীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয় এইরূপ কথা পাইয়াছেন।

হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ, নামমাহাত্ম্য-প্রচারক হরিদাসঠাকুর প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে পূজিত। যিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই; সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় ভীষণ পাইকগণ কর্ত্তৃক অপমানিত, নিগৃহীত ও প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও সৎসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজনাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়া অদ্বৈতদেব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, যাঁহার প্রেম-প্রকাশ ও দৈন্য ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করিত, যাঁহার দেহত্যাগে স্বয়ং মহাপ্রভু বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের জন্ম দ্বারা কোন্ দেশ ধন্য হইয়াছিল, কোন্ জনপদ পবিত্র হইয়াছিল, তাহা জানিতে সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে।

এতকাল বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস ছিল এবং প্রামাণিক গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বূঢ়নে হরিদাস অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে এতকাল কোন তর্কও উঠে নাই। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়া অবধি এই প্রচলিত বিশ্বাস ভ্রমাত্মক বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। জয়ানন্দ বলিয়াছেন—

"স্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছী গ্রামে।
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব্বনামে॥"

জয়ানন্দের নির্দ্দেশ অনুসারে উক্ত গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গঙ্গাতীরে কলাগাছী গ্রামে ভাটবংশে হরিদাস জন্মিয়াছিলেন। তবে বূঢ়নের সহিত যে হরিদাসের বিশেষ সংশ্রব ছিল, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। জয়ানন্দও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাসের লেখায় যে ভ্রম ছিল, জয়ানন্দ তাহার সংশোধন করিয়াছেন।

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের লেখায় ভুল নাই। জয়ানন্দেরও ভুল হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়েরা স্বর্ণনদীকে সুরনদী (গঙ্গা) মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। স্বর্ণনদী সোনাই নামে বূঢ়নে এখনও আছে। স্থানে স্থানে মজিয়া গেলেও এখনও তাহার তীরে অনেক গ্রাম আছে। নদীতে অনেক জলও আছে।

বূঢ়ন একটী বৃহৎ পরগণার নাম। উক্ত পরগণা সাতক্ষীরার বাবুদিগের জমিদারীর অন্তর্গত। উক্ত নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামও আছে, তাহাকে আজকাল লাপসা বূঢ়ন বলে। ভাটকলাগাছী বলিয়া কোন গ্রাম নাই, ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সোনাইতীরে অনেক ভদ্রপল্লী এখনও আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন।

ইহারই নিকটে এক সময় বূঢ়নের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী "গণরাজার" বাটী ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। ঠাকুর হরিদাস 'যবন' ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাঁহাকে যবন বলা হইয়াছে। তিনি মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচার গ্রহণ করায় গৌড়ের বাদশাহ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দুর সন্তান, তাঁহার পিতা বাধ্য হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, এরূপ অনেক প্রবাদ আছে। তিনি যে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের দৌহিত্র এরূপও উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে বাদশাহ তাঁহাকে "মহাবংশ-জাত" বলায় অনুমিত হয় যে, তিনি মুসলমান কুলেই জন্মিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে কাজীর ছেলে বলিয়াও অনুমান করেন। জয়ানন্দ তাঁহার মাতাপিতার নাম উল্লেখ করিলেও তাঁহাকে হীনকুলোৎপন্ন বলিয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণতঃ তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যতদিন বলবত্তর প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, ততদিন তাহাই বহাল থাকুক।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব খাঁজাহান আলীর মন্ত্রী মহম্মদ তাহের (পীরালি খাঁ) বূঢ়নের অনেক ব্রাহ্মণবংশকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। সোনাইতীরবর্ত্তী হাকিমপুরের খাঁ সাহেবেরা এইরূপ ব্রাহ্মণ মুসলমান। বূঢ়নপরগণার মধ্যে এইরূপ আরও অনেক আছে। বাইতী, পটো, ধাওয়া প্রভৃতি শ্রেণীস্থ লোকেরা এই সময়ে মুসলমান হইয়াছিল। হরিদাস সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীগুলি সংগ্রহ করিলে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার পিতা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বেই হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল; তাঁহাকে মুসলমান করা হইয়াছিল, তাহা কোথাও শুনা যায় না। তিনি দেখিতে সুশ্রী ও সুপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। অল্পবয়সে আশ্রয়হীন হইয়া তিনি কোনও আত্মীয়ের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু উক্ত আত্মীয় মুসলমান হইয়া নবাবের প্রিয় হওয়ার জন্য নিতান্ত গোড়ামী দেখাইতেন। হরিদাসের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি প্রায় ২০ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলে যাইয়া অবস্থান করিলেন। প্রবাদ আছে যে, হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগের গৃহে তিনি গৃহত্যাগের পূর্ব্বে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, জয়ানন্দের উল্লিখিত ভাটকলাগাছী কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের ঠিকানা হয় নাই। তবে ভাটলী নামে এক গ্রাম সোনাইতীরে এখনও আছে এবং তাহার নিকট কেরাগাছী গ্রামও আছে। অনুমিত হয়, ইহাই জয়ানন্দ-বর্ণিত ভাটকলাগাছী ইতর ভাষায় কলাগাছীকে কেলাগাছী বলে। এই গ্রাম বূঢ়ন গ্রাম হইতে ২॥ ক্রোশমাত্র দূরে সোনাইতীরে অবস্থিত এবং ইহার অপর পারে হাকিমপুর। প্রবাদ মিলাইয়া দেখিলে এই ভাটলী-কেরাগাছীকে জয়ানন্দের ভাটকলাগাছি বলিয়া ধারণা জন্মিবে। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ উভয়ে যখন বূঢ়নের সহিত হরিদাসের সংশ্রব স্বীকার করিয়াছেন, তখন বূঢ়ন হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশেষতঃ যখন স্বর্ণনদীকে গঙ্গা বলিয়া বুঝিবার আবশ্যক

হইতেছে না, বূঢ়নের নীচেই স্বর্ণনদী বা সোনাই পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার অন্যত্র বাস কল্পনা করার আবশ্যক নাই। প্রবাদেও সোনাইতীরই হরিদাসের আদি লীলা-স্থান বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জয়ানন্দ যে ভাটকলাগাছীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে দুটী গ্রামের নাম তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইহার উত্তরে বলা যায়, পল্লী-গ্রামে এখনও কোন গ্রামের নির্দ্দেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অধিক দিতে হইবে না। দুই একটী দিলেই বুঝা যাইবে,—মাইনগর-মালঞ্চ, পলাবাড়ী-জয়নগর, তালপাতা-মেমারী, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, জিরাট-বলাগড়, ফুলেন-বলা, দাঁইহাট-মেটিরী, চূপী-কাঁকশিয়ালী, টাকী-শ্রীপুর, খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা, লাউপালা-সিমহাট, ক্ষীরপাই-রাধানগর, সিঙ্গ-ডুমুরদহ প্রভৃতি। ইহা হইতে বুঝা যাইবে জয়ানন্দ কেন যুক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ভাট শব্দ যে বংশবাচক নহে ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৃন্দাবনদাস কেবল বূঢ়নের উল্লেখ করিলেন কেন, তবে কি তিনি হরিদাসের জন্মস্থানের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পরগণার নামে পরিচয় দেওয়ার রীতি এখনও লোপ পায় নাই। এখনও বিক্রমপুর, কুশদহ, চৌরাশী, হলদা ও আনরপুর নিবাস বলিয়া পরিচয় দিলে একটী গ্রাম বুঝায় না। পরগণাই বুঝাইয়া থাকে। সেকালেও তাহাই বুঝাইত। বূঢ়নে বাড়ী বলিলে সাধারণভাবে পরগণা বুঝাইত, বাঙ্গালার জাতীয়-ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। বৃন্দাবনদাসও সেইরূপ সাধারণভাবে পরগণার নাম করিয়া পরে বূঢ়ন গ্রামের নাম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লাপসা বূঢ়নেই হরিদাস জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার বাস ভাটকলাগাছীতে ছিল। সকল বাঙ্গালী বালকই যে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করে, তাহা নহে। অনেক অবস্থাপন্ন বালক মাতুলালয়ে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রচলিত রীতি দেখিলে ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না। সুতরাং বৃন্দাবনদাসকে ভ্রান্ত মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৭শ বাৎসরিক অধিবেশন

সময় ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে, রবিবার—অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। মুক্তাগাছার জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরকে পরিষদের আজীবন সভ্য-নির্ব্বাচন। ৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ সভ্য-নির্ব্বাচন। ৫। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৬। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহা এম্ এ বি, এল, মহাশয়ের প্রদত্ত দুইটী প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাসবন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয় প্রদত্ত প্রথম কণিষ্কের সুবর্ণমুদ্রা, (গ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রদত্ত গৌড়ের মিনা করা ইষ্টক। ৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাবক্রমে পঞ্চম সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচনার্থ নিয়মাবলীর আবশ্যক সংশোধন। ৮। সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ-পাঠ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা। ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথবসুর তৈলচিত্র। ১০। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি-গঠন। ১১। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কর্ম্মচারি-নিয়োগ। ১২ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ। ১৩। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩১৭ সালের বাঙ্গালাসাহিত্যের বিবরণ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা। ১৪। বিবিধ।

উপস্থিত—সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ বি এল্
কুমার " অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
" " ধীরেন্দ্রকুমার রায়
রায় " চুনিলাল বসু
" " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ বি এল্
" " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" গৌরহরি সেন
কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" বনওয়ারি লাল চৌধুরী বি এস সি
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" যোগেশচন্দ্র সিংহ
" চারুচন্দ্র বসু
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি, এল্

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ মন্মথমোহন বসু বি, এ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমন্তকুমার রায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ অন্নদাচরণ কারকুন
„ রামকমল সিংহ
„ ফকিরচাঁদ রায়
„ গোপেন্দ্রকুমার সরকার
„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ কানাই লাল দত্ত

শ্রীযুক্ত চিত্রসুখ সান্যাল
„ হেমচন্দ্র সরকার এম এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল এম এ
„ করুণাকুমার মজুমদার
„ রেবতীকান্ত সেন
„ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ দীননাথ দত্ত
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ হৃষীকেশ মিত্র
„ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ-সম্পাদক
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ }

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য-নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ৩৬।১।১ কালীঘাট রোড।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি এল্	শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম এ	২। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ ৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীশচন্দ্র বসু	৩। শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০ পার্ব্বতী ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল ১৫ গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর।
		৫। শ্রীঅসিতমোহন ঘোষ মৌলিক, জমিদার পাঁচথুপি, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	”	৬। শ্রীভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমানী ১২।১ ওল্ড্ পোঃ আফিস ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬ক। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার্কসাড়া বেতড়, হাবড়া।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	৮। শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস Prof. Presidency College
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৯। শ্রীনীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এল উকীল, আলিপুর, ৮ কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীগৌরহরি সেন চৈতন্যলাইব্রেরী, বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	”	১১। শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় জয়দা বাহার ২৪ পরগণা।
শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৩৮।৯ বসুপাড়া লেন।
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র	১৩। শ্রীবিমলাচরণ লাহা ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
কে বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৪। মিঃ জি, জি, জেনিংস এম্ এ অধ্যক্ষ মুর সেণ্টাল কলেজ, এলাহাবাদ।
”	”	১৫। ডাঃ ডি এন রায় এম্ ডি Dr. of the Homeopathic of Late Dr. M. N. Bose, Calcutta.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	”	১৬। শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় গণপুর, মল্লারপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৭। শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য মগদা সিমলা টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮। শ্রীকেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী Secy Vidyasagar Reading Club, Kakurdah, Barisal.
"	"	১৯। শ্রীসৈয়দজামালদ্দীন জোকা নোহাটা, যশোহর।
"	"	২০। শ্রীবামপতি সরকার এম এ বিএল ১০নং কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	"	২১। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় জমিদার কাশীপুর, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	"	২২। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রায় জমিদার কাশীপুর, কলিকাতা।
"	"	২৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র	২৫। শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ বি এ Executive Engineer 1st Calcutta Division
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৬। শ্রীরাধিকামোহন সেন এম এ বিএল উকীল বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	২৭। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার খাগড়া, বহরমপুর।
"	"	২৮। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল খাগড়া, বহরমপুর।
"	"	২৯। শ্রীসুধাংশুশেখর বাগচী খাগড়া, বহরমপুর।
"	"	৩০। শ্রীবসন্তকুমার নন্দী রাজবাটী, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ।
"	"	৩১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী রাজবাটী, কাশীমবাজার।
"	"	৩২। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খাগরা, সৈদাবাদ।
"	"	৩৩। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি এল রাজবাটী, কাশীমবাজার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩৪। শ্রীবামাপদ দত্ত বি এল আগরা, বহরমপুর
"	"	৩৫। কুমার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় কুঞ্জঘাটা রাজবাটী, আগরা, বহরমপুর।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্রদাশ গুপ্ত	৩৬। শ্রীআদিনাথ সেন এম্ এ বি এস সি গাণ্ডারিয়া ঢাকা
"	"	৩৭। শ্রীঅতুলচন্দ্র বাগ্‌চী বি এল ট্রেনিং কলেজ রোড, ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	"	৩৮। শ্রীবিজয়চন্দ্র দাস গুপ্ত ময়মনসিংহ।
"	"	৩৯। শ্রীবসন্তচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
"	"	৪০। শ্রীবসন্তকুমার আইচ ঐ
"	"	৪১। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ
"	"	৪২। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মজুমদার ঐ
"	"	৪৩। শ্রীমধুসূদন সরকার ঐ
"	"	৪৪। শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ
"	"	৪৫। শ্রীমোহিনীমোহন রায় ঐ
"	"	৪৬। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ঐ
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৪৭। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র ঐ
"	"	৪৮। শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ ঐ
"	"	৪৯। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার উকীল ঐ
"	"	৫০। শ্রীদুর্গাদাস রায় ঐ
"	"	৫১। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
"	"	৫২। শ্রীমনোমোহন নিয়োগী ঐ
"	"	৫৩। শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় ঐ
"	"	৫৪। শ্রীচিন্তাহরণ মজুমদার ময়মনসিংহ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	৫৫। শ্রীরমণীকান্ত দাস ব্যারিষ্টার, ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	"	৫৬। শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ব্যারিষ্টার, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৫৭। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ঐ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	,,	৫৮। শ্রীচারুচন্দ্র দাস ব্যারিষ্টার ঐ
,,	,,	৫৯। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন পুঃ সবইনস্পেক্টর, ময়মনসিংহ।
মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬০। কুমার শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬১। শ্রীশ্রীনাথ রায় ম্যানেজার, মহারাজকুমার শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের ষ্টেট্, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৬২। মহারাজ কুমার শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ৭৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
,,	,,	৬৩। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৬৪। কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী গোলকপুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫। শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৬৬। শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী কালীপুর, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৬৭। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম,এ, বিএল ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৬৮। শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী ঐ
,,	,,	৬৯। শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ঐ
,,	,,	৭০। শ্রীরেবতী শঙ্কর রায় ঐ
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১। শ্রীসূর্য্যকুমার সোম এম এ বিএল ময়মনসিংহ।
,,	,,	৭২। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম, আর এস ময়মনসিংহ।
,,	,,	৭৩। শ্রীবিনয়ভূষণ নাগ বিএ সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪। শ্রীনরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী কালীপুর, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৭৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী ভবানীপুর ঐ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	৭৬। শ্রীবনবিহারী সেন আগরা, বহরমপুর।
,,	,,	৭৭। শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র ঐ
,,	,,	৭৮। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাগচী ঐ
,,	,,	৭৯। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ঐ
,,	,,	৮০। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	,,	৮১। শ্রীযতীন্দ্রকুমার চৌধুরী সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৮২। শ্রীবিজয়কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৮৩। শ্রীসুধেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৮৪। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় জ্ঞানচৌধুরীর লেন ঐ
,,	,,	৮৫। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৮৬। শ্রীবিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৮৭। শ্রীশ্রীনাথ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
,,	,,	৮৮। শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী ঐ।
,,	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	৮৯। শ্রীতারকেশ্বর চিত্রনবীশ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	,,	৯০। শ্রীনলিনীকুমার রায় জীবনপুর বাটী, ঢাকা।
,,	,,	৯১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র ৫নং নয়াবাজার রোড, ঢাকা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	৯২। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ অধ্যাপক ঢাকা কলেজ।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	৯৩। শ্রীবরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা. ময়মনসিংহ
"	"	৯৪। শ্রীসারদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	৯৫। শ্রীগোপালদাস আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	৯৬। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	৯৭। শ্রীরমেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১৬০।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
"	"	৯৮। শ্রীসুধীরচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
"	"	৯৯। শ্রীকিরণচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	১০০। শ্রীসুরেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	১০১। শ্রীহরিদাস আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	১০২। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ৪৩ বিডন রো
"	"	১০৩। শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
"	"	১০৪। শ্রীকালীনাথ ঘোষাল মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	১০৫। শ্রীসূর্য্যকুমার সরখেল ম্যানেজার হরিদাস আচার্য্য চৌধুরীর ষ্টেট।
"	"	১০৬। শ্রীগিরিশচন্দ্র দে হেডমাষ্টার, আর, কে, এইচ স্কুল মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
"	"	১০৭। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	১০৮। শ্রীরমেশচন্দ্র সান্ন্যাল ঐ
"	"	১০৯। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সান্ন্যাল ঐ
"	"	১১০। কুমার হরেকিশোর রায় চৌধুরী রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	১১১। রায় সতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর ভবানীপুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১১২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ দোলক, বরিশাল।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১১৩। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ১৯ রামবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	১১৪। শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য নগদা সিমলা, টাঙ্গাইল।
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	”	১১৫। শ্রীউমেশচন্দ্র সেন, লাবান, সিলং।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীচন্দ্রভূষণ মৈত্র	১১৬। শ্রীমণীন্দ্রলাল মিত্র এম, বি, ৩২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
”	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১১৭। শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমপ্রসন্ন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	১১৮। শ্রীগিরিজামোহন নিয়োগী কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীহেমপ্রসন্ন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	১১৯। শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী এম্, এ, বি, এল কালীতলা, দিনাজপুর।
”	”	১২০। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত কালীতলা, দিনাজপুর।
”	”	১২১। শ্রীবামনদাস ঘটক কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীগোপেন্দ্র সরকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১২২। শ্রীরাসবিহারী সেন সদরপুর, ২৪ পরগণা।
”	”	১২৩। শ্রীআশুতোষ রায় ক্যোয়ার ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল, দিল্লী।
”	”	১২৪। শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় c/o মেসার্স সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
”	”	১২৫। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ক্যোয়ার ৫নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
”	”	১২৬। শ্রীপ্রসিদ্ধ কুমার বসু ১৩।৩ হিদাম মুদির লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার	১২৭। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু স্কোয়ার ৪৪ নং মুরারীপুকুর রোড, মাণিকতলা।
„	„	১২৮। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্কোয়ার ৫নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
„	শ্রীসারদা চরণ মিত্র	১২৯। শ্রীগঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, বগুড়া।
„	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার	১৩০। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় বি, এ, Assistant Secry & Dy R Compt Hindusthan Co-Operative Insurance Society ৩০নং ডালহাউসি স্কোয়ার।
„	„	১৩১। শ্রীঅম্বিকাকুমার রায় চৌধুরী জমিদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
„	„	১৩২। শ্রীনিশীথনাথ রায় স্কোয়ার বালেশ্বর।
„	„	১৩৩। শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল, সবজজ, ময়মনসিংহ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার	১৩৪। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৬।৯৭ চিৎপুর রোড।
„	„	১৩৫। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Hd. Asst. Lower Ganges Bridge-office Paksey (Pubna)
„	„	১৩৬। শ্রীনরনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ, বাগেরহাট, খুলনা।
„	„	১৩৭। শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় ৫৬নং চক্রবেড়ীয়া রোড, ভবানীপুর।
„	„	১৩৮। শ্রীফকিরচাঁদ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, জগৎবল্লভপুর, হাবড়া।
„	„	১৩৯। শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, উলা, রাণাঘাট, নদীয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪০। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি, এ জমশেরপুর, নদীয়া।
„	„	১৪১। ডাঃ শ্রীসুকুমার সান্যাল বি, এস, সি, এল্, এম, এস্, নয়ানচাঁদ দত্তের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
মাননীয় মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৪২। রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„	„	১৪৩। মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর নাইট্, বাহাদুর প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	১৪৪। শ্রীবিপিনবিহারী রায় C/o কুমার জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১৪৫। শ্রীশ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	১৪৬। শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেরপুর, ময়মনসিংহ।
„	„	১৪৭। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ময়মনসিংহ।
„	„	১৪৮। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সোম ঐ
„	„	১৪৯। শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস ঐ
„	„	১৫০। শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী সেরপুর, ময়মনসিংহ।
„	„	১৫১। শ্রীরেবতীমোহন গুহ ময়মনসিংহ
„	„	১৫২। শ্রীনবকান্ত গুহ ঐ
„	„	১৫৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল ঐ
„	„	১৫৪। শ্রীগিরিশচন্দ্র কবিরত্ন ঐ
„	„	১৫৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী ঐ
„	„	১৫৬। শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত ঐ
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫৭। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১ আহিরিটোলা ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৮। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„	„	১৫৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কটনকলেজ, গৌহাটী।
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৬০। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১০১ বকুলবাগান-রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৬১। শ্রীঅমূল্যচরণ বসু বি, এল্, ৩৬ নং চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৬২। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত বি, এল্, ১৭নং গোপীকৃষ্ট পালের লেন।
"	"	১৬৩। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস এম্, এ, বি, এল্, ৩৯নং চক্রবেড়িয়া রোড।
"	"	১৬৪। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল্, ৫৯ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	১৬৫। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম,এ,বি,এল্, ৭।২ চক্রবেড়িয়া রোড।
"	"	১৬৬। শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম, এ বি, এল্, ৫০।১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	১৬৭। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্, ১৭নং মধুরায়ের লেন।
"	"	১৬৮। শ্রীধীরেন্দ্রলাল কাস্তগীর বি, এল্, ৬৫।২ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
"	"	১৬৯। শ্রীগোপালকৃষ্ণ পাল এম, এ, বি, এল্ ৩৬ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৭০। শ্রীহারাধন নাগ এম, এ, বি, এল্ ৪৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	১৭১। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র এম,এ, বি,এল্ ৯৯নং কাঁশারীপাড়া রোড।
"	"	১৭২। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল্, ২৯নং হজুরিমাল লেন।
"	"	১৭৩। শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি, এল্ ১২।১।৩।১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	১৭৪। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এল্, ৬৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	১৭৫। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল্, ৮নং চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৭৬। শ্রীকরুণাময় বসু এম, এ, বি, এল্ ৯৫ নং কাঁশারীপাড়া রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৭৭। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ বি, এল্, ১৮নং রামমোহন দত্ত রোড।
”	”	১৭৮। শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল্, ৬৩।৪নং পদ্মপুকুর রোড।
”	”	১৭৯। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ুয্যেপাড়া লেন।
”	”	১৮০। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্, ৭।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
”	”	১৮১। শ্রীমন্মথনাথ রায় এম্, এ, বি, এল্, ২নং বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন।
”	”	১৮২। শ্রীমুকুন্দনাথ রায় বি, এল্, ৬নং অরিক লেন, বিডনস্কোয়ার।
”	”	১৮৩। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, বি, এল্, ১১ ন্যায়রত্ন লেন।
”	”	১৮৪। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্, ৫২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
”	”	১৮৫। শ্রীপ্রিয়শঙ্কর মজুমদার বি, এল্, ৫৪নং হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি রোড।
”	”	১৮৬। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল্, ৪৮নং সাঁকারিপাড়া রোড।
”	”	১৮৭। শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি, এল্, এস্, আই, আর, এস্, ২৫।১নং বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন।
”	”	১৮৮। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্, ৭৩নং পদ্মপুকুর রোড।
”	”	১৮৯। শ্রীপ্যারীমোহন রায় বি, এল্, ৪৬নং চক্রবেড়িয়া রোড।
”	”	১৯০। শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এল্, ১৩।৩ বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
”	”	১৯১। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পালিত বি, এল্, ১৩নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
”	”	১৯২। শ্রীসমতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্, ১৭নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৯৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এম, এ, বি, এল্ ২নং কুণ্ডু রোড।
"	"	১৯৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ ৬০নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	১৯৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্, বেহালা।
"	"	১৯৬। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খাঁ বাহাদুর বি,এল্, ৭নং মৌলবী গোলাম সোভান লেন।
"	"	১৯৭। শ্রীযতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, ২৫নং হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জির রোড।
"	"	১৯৮। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ৫।২নং মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন।
"	"	১৯৯। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এল্, ৫৯নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২০০। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এল্ ৫৯।৩ হ্যারিসন রোড।
"	"	২০১। শ্রীশ্যামাচরণ রায় বি, এল্, ১ বলরাম বসুর ঘাট রোড।
"	"	২০২। শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্, ৪৭নং বোসপাড়া লেন।
"	"	২০৩। শ্রীতারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ ৮নং কেদার দত্তের লেন।
"	"	২০৪। শ্রীউপেন্দ্রগোপাল মিত্র বি, এল্, ৩০নং জেলেপাড়া রোড।
"	"	২০৫। শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল্, ১৮নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২০৬। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, উত্তর পাড়া, হুগলী।
শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	২০৭। শ্রীঅসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ ৪৫নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
"	"	২০৮। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ৪নং গঙ্গাধর বাবুর গলি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	২০৯। শ্রীবারাণসী মুখোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল্, ৫০নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২১০। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, ২৮নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট।
"	"	২১১। শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল্ ২৩নং নেবুতলা লেন।
"	"	২১২। শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস এম্, এ, বি, এল্ ৫৮নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২১৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্ ৫০নং বকুলবাগান রোড।
"	"	২১৪। শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্,এ, বি,এল্, ১০।১ চক্র বেড়িয়া রোড।
"	"	২১৫। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ ৪৯নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	২১৬। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল্, ৭৯নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।
"	"	২১৭। শ্রীযতীশচন্দ্র হাজরা এম্, এ, বি, এল্, ৫নং কালীঘাট রোড।
"	"	২১৮। শ্রীযতীশচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল্, ২৭নং ডাক্তারের লেন।
"	"	২১৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, এ, বি, এল্, ১।৩ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।
"	"	২২০। শ্রীমোহিনীনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্, ৬৯নং বিডন ষ্ট্রীট।
"	"	২২১। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি, এল্, ৩০।৩ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	২২২। শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ ৪৫নং গিরীশ মুখার্য্যির রোড।
"	"	২২৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, ৫।১ কুণ্ডুরোড ভবানীপুর।
"	"	২২৪। শ্রীশশধর রায় বি, এল্, ৫৮নং চক্রবেড়িয়া রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	২৪৫। শ্রীসতীশচন্দ্র ভড় বি, এল্ ২৩।১ রামবাগান ষ্ট্রীট।
		২২৬। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মজুমদার বি, এল্, ১নং অনাথ নাথ দেব লেন।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ম যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪০২। Epigraphia Indica & Record of the Archæological Survey of India part I 1888 (oct.)
	৪০৩। do do
	do part II January 1888
	৪০৪। do „ III April 1889
	৪০৫। do „ IV July 1889
	৪০৬। do „ V October 1889
	৪০৭। do „ VI November 1890
	৪০৮। do do
	৪০৯। do Vol 11 part X August 1892
	৪১০। do do part XI September 1892
	৪১১। do do part XII December 1892
	৪১২। do do part XIII June 1893
	৪১৩। do do part XIV March 1893
	৪১৪। do do part XV May 1894
	৪১৫। do do part XVI December 1894
	৪১৬। Further Jaina Inscriptions from Mathura (Epigraphia Indica)
	৪১৭। Maps of Asia East Indies & General View of the principal Roads & Divisions of Hindustan 1790
	৪১৮। জাহীর পীর (১খণ্ড) শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব
	৪১৯। বঙ্গীয় কৃষি-বৈজ্ঞসমিতির অনুষ্ঠানপত্র— শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল

	৪২০। বেকারে ব্যাপার (১ম, ২য় খণ্ড শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব)
	৪২১। উড়োকদ
	৪২২। পানের পাঁচালী
	৪২৩। Kanya Sulkamu (A Telegu comedy) G. V. Apparow N. A.
	৪২৪। The nineteenth century July, 1899
	৪২৫। Do August, 1899
	৪২৬। Do October, 1899
	৪২৭। Do „
	৪২৮। Report of an Archaeological tour with the Beneras field-force.
	৪২৯। Geographical & Statistical Report of the Dst. of Birbhum
	৪৩০। A map of India (Ad Antiquarine Indian Geographical Tebula)
মৌলবী সেখ আবদুল জব্বর	৪৩১। বর্ক্তৃতা-মালা—মহম্মদ মেহের উল্লা
	৪৩২। শ্লোক-মালা—মহম্মদ মেহের উল্লা
	৪৩৩। বাল্যবিবাহের বিষময় ফল „
	৪৩৪। উপদেশমালা „
Mr. C. W. Me mimi I. C. S.	৪৩৫। Frasers magazine 1857
	৪৩৬। Do 1858
	৪৩৭। Do 1859
	৪৩৮। Do 1860
	৪৩৯। Do 1861
শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন রায়	৪৪০। প্রেমের স্বপন
„ নগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ	৪৪১। চরিত-শতক—শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব
	৪৪২। নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ব বা বেদ কোরাণাদির স্থূল মীমাংসা „
	৪৪৩। গৌরীসঙ্গীত-হার „
	৪৪৪। Report in higher Education in the state of New York for the year ending 1909
	৪৪৫। গন্তীরার গীত
	৪৪৬। Words from letters

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ	৪৪৭। সংযুক্তা (স্বরচিত)
" হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪৪৮। অহল্যা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
	৪৪৯। গায়ত্রী ঐ
সম্পাদক, আরজাবাদ-সম্মিলনী	৪৫০। আরজাবাদ সম্মিলনীর ১১শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	৪৫১। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত (দুষ্প্রাপ্য)—রামনারায়ণ তর্করত্ন
	৪৫২। গে সাহেব রচিত ইংরাজী-ভাষাভাষিত ইতিহাসচয় The Version of Gay's Fables (দুষ্প্রাপ্য) Poet Gay.
	৪৫৩। জীবন-মৃগতৃষ্ণা—তারাকুমার চক্রবর্ত্তী
দৌলত আহাম্মদ এস এস দোহার	৪৫৪। জীবন-মঙ্গল
শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী	৪৫৫। ওঁ ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা
" নীরদবরণ মিত্র	৪৫৬। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
" প্রভাতচন্দ্র মজুমদার	৪৫৭। ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয়সমূহের নিমিত্ত স্বাস্থ্যরক্ষার ১ম পুস্তক
	৪৫৮। ফুলের ডালা ৩ খানি
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪৫৯। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব (খণ্ডিত) প্রাচীন মুদ্রিত
	৪৬০। উর্দ্দু ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ
	৪৬১। সার ১খানি ঐ
" বিরজাকান্ত ঘোষ	৪৬২। দুর্গাপুরাণ (পুঁথি)
	৪৬৩। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ঐ
	৪৬৪। মণিহরণ পুস্তক ঐ
	৪৬৫। রামায়ণ (অরণ্যকাণ্ড) ঐ
	৪৬৬। রামপ্রসাদের মানসীগান ঐ
	৪৬৭। ১০০ বৎসরপূর্ব্বে তৌজিলিখন কএকপৃষ্ঠা নমুনা
" অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন	৪৬৮। ধাতুপাঠম্ (পুঁথি)
	৪৬৯। স্মৃতিগ্রন্থের অংশ "
	৪৭০। লিঙ্গানুবাদনং "
	৪৭১। মুগ্ধবোধব্যাকরণম্ "
	৪৭২। সুবাও বৃত্তি "
	৪৭৩। নারদ পঞ্চরাত্র "
	৪৭৪। গৌতমীয় তন্ত্র "
	৪৭৫। রাধিকার সহস্রনাম "
" পুলিনবিহারী দত্ত	৪৭৬। চিকিৎসা-সার

৪৭৭। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪৭৮। পদ্যমালা—তারাকুমার চক্রবর্ত্তী

৪৭৯। The city of the East

" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮০। ছড়া ও গল্প

অতঃপর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত রাজন্যবর্গ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

১। মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর নাইট বাহাদুর
প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা

২। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ-সদস্য নিযুক্ত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—বসন্ত বাবু পরিষদের পুঁথিসংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুঁথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নূতন নূতন পুঁথির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুঁথি সংগ্রহের জন্য ইঁহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, তজ্জন্য ইঁহার বাহনের খরচ আছে, খাই খরচ আছে, পরিষৎ হইতে তিনি তাহার এক কপর্দ্দকও লয়েন না বা এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহবশে তিনি বহুব্যয় স্বীকার করিয়াও এই কার্য্য করেন। অধিকন্তু তিনি পরিষদের প্রথম বৎসর হইতেই ইহার সদস্য আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য-সম্পর্কে ইহার কোন না কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, অথচ নিয়মিত ভাবে ইহার চাঁদা দেন। পূর্ব্বে তিনি সমস্তিপুরে রেল আপিসে কার্য্য করিতেন। এখন পেন্‌সন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্ব্বস্নেহ সমান বজায় রাখিয়াছেন, এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী বন্ধুকে ইহার বিশেষ সদস্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।

সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ক্যানিংলাইব্রেরী পুস্তকালয়ের সুপ্রাচীন সুপরিচিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনারা অনেকেই জানেন। ইনি পরিষদের একজন অপ্রার্থিত বন্ধু। ইনি পরিষদের চিত্রশালায় রাখিবার জন্য বঙ্কিম, হেম, নবীন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু সাহিত্যিকের লিখিত এবং অন্যান্য কএকজন দেশের গণ্যমান্য লোকের পত্র আমাকে দান করিয়াছেন। এরূপ অযাচিত স্নেহ যাঁহার নিকট পরিষৎ পাইয়াছেন, তাঁহাকেও আমি পরিষদের বিশেষ সদস্যপদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্যোমকেশ বাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর প্রাচীন মুদ্রাগুলির কোন প্রদর্শকই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুদ্রাগুলির উল্লেখ করিয়া উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৭ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি বিষয় পড়িয়া শুনাইলেন, ১৭শ বৎসরের কার্য্য-বিবরণ শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে কার্য্যবিবরণ পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন—সুখের বিষয় দিন দিন পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার বাড়িতেছে। কার্য্যক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইতে হইতেছে। প্রথমে একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী দ্বারা ইহার সমস্ত কর্ম্ম সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইত। ক্রমশঃ গত বৎসরপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর্ম্মের বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া এক এক বিভাগের কার্য্যপরিদর্শনের জন্ম এক একজন সহকারী সম্পাদকের প্রতি ভার দিতে হইয়াছে।

গতবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য এবং সাহিত্য-বিভাগের সমস্ত কার্য্যের ভার লইয়া কার্য্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় পত্রব্যবহার ও সভাধিবেশনের যাবতীয় কার্য্যের ভার লইয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালা, প্রাচীন পুঁথিসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ও রমেশভবনের সমস্ত কার্য্য চালাইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয় হিসাবপত্র ও আয়ব্যয়ের বিভাগে কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। আজকাল এই বিভাগগুলি ব্যতীত মুদ্রণ-বিভাগ পরিষদের কার্য্য বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পরিষৎ শ্রীভাষ্য, শতপথ-ব্রাহ্মণ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, রাঢ়ীয় শব্দকোষ প্রভৃতি বহু বৃহৎগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় পত্রিকাসমিতির নিয়মানুসারে নবপ্রথায় পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা করায় মুদ্রণ-বিভাগে আট-নয়টি ছাপাখানায় যুগপৎ বহুকার্য্য চলিতেছে। সমস্ত বিষয়ের পরিদর্শন প্রুফ দেখা, ছবিছাপা, তাগাদাকরা কাগজের ব্যবস্থা করা, দপ্তরীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বহুকার্য্য বাড়িয়া গিয়াছে। গতবৎসরে পত্রিকা-সমিতির অভিপ্রায় মত পত্রিকার কার্য্য পরিচালনার্থ আপনারা পত্রিকা-সম্পাদককে একজন বেতনভোগী সহকারী প্রদান করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হওয়ায় এই সহকারী দ্বারা মুদ্রণবিভাগের অন্যান্য কর্ম্ম পরিচালনের সাহায্য লইতে হইয়াছে, ইহাতেও পত্রিকা বা গ্রন্থাবলীর কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইতেছে না। অতএব আমি প্রস্তাব করি, এই মুদ্রণ-বিভাগের তত্ত্ব করিবার জন্ম এবৎসর হইতে আর একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক এবং এইজন্ম পরিষদের নিয়মাবলীর ১৯শ ও ২৩শ নিয়মের আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করা হউক। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরিগৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি এস্ সি (লণ্ডন) মহাশয়ের

প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিপদে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জন্ত নিযুক্ত হইলেন।

১। শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্ (সভাপতি)
২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, (সহকারী সভাপতি)
৩। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্ শ্রীকণ্ঠ ঐ
৪। মাননীয় মহারাজ শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ঐ
৫। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)
৬। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)
৭। শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এম্, আর, এ, এস্ ঐ
৮। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ঐ
৯। শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, ঐ
১০। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ, ঐ
১১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (পত্রিকা-সম্পাদক)
১২। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন (ধনরক্ষক)
১৩। অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ (গ্রন্থরক্ষক)
১৪। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ (ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক)
১৫। গৌরীশঙ্কর দে এম্, এ, বি, এল্ (আয়ব্যয়-পরীক্ষক)
১৬। শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র এম্, এ ঐ

এই সময় কোন প্রয়োজনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় অন্যত্র গমন করিলে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৮ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-নির্ব্বাচনের ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, এবার সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭৯ জনে ভোট দিয়াছেন। সদস্য-প্রার্থীদিগের মধ্যে এবারে সহরে ২৩জন ও মফস্বলে ৯জন ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়মত ভোট পাইয়াছেন।

১। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি, এচ্, ডি
২। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ
৩। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্ এ,
৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৫। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ,
৬। শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,
৭। শ্রীখগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
৮। শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

৯। শ্রীবনওয়ারী লাল চৌধুরী বি, এস্‌, সি (লণ্ডন)

১০। শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ

ইহাদের মধ্যে ২য় ও ৩য় ব্যক্তি পূর্ব্বে কর্ম্মচারী-পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের স্থানে ৯ম ও ১০ম ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৮ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া স্থির হইল।

অতঃপর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আপনাদের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত চারিজনকে মনোনীত করিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

২। „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

৩। „ চারুচন্দ্র বসু

৪। „ মন্মথ মোহন বসু বি, এ

অতঃপর কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সাধারণ সদস্য দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৮জন, মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ৪ জন, এই ১২ জন নির্ব্বাচনে প্রাপ্ত এবং কর্ম্মচারীরূপে প্রাপ্ত ১৪ জনকে লইয়া এবার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইতেছে। ইহাতে সংখ্যার অনুপাত ঠিক হইতেছে না। আমি প্রস্তাব করিতে চাহি নির্ব্বাচিত ও কর্ম্মচারী-সদস্যের সংখ্যা সমান হউক। এজন্য ১৪ জন কর্ম্মচারী ও মনোনীত সদস্যের ৪জন স্থলে ২জন এবং সাধারণ নির্ব্বাচনে গৃহীত ৮ জনের স্থলে ১৬ জনকে লওয়া হউক। এবারকার ভোটে নির্ব্বাচিত ১০ জনকে লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের পরবর্ত্তী আর আটজন ভোটের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া লওয়া হউক। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, মনোনীত দুইজনকে বাদ না দিয়া নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অপর আটজনকে লওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ দুর্গানারায়ণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, চারু বাবুর প্রস্তাব দুর্গানারায়ণ বাবুর প্রস্তাবের মূল কথার বিরোধী তাহাতে নির্ব্বাচিত ও কর্ম্মচারী সদস্যের সংখ্যা সমান হইবে না।

ইহার পর মন্মথবাবু ও সতীশ বাবু কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তাবের গুরুত্ব দেখাইয়া বলিলেন, এ বৎসরের জন্য এ পরিবর্ত্তন অপ্রয়োজনীয়, কারণ সংখ্যার সমতার অভাবে যে দোষের আশঙ্কা আছে পরিষদে তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, প্রস্তাবকের যুক্তি গ্রহণীয় কিন্তু তাহা হইলে নিয়মাবলীর বহু নিয়মের বহু অংশ এখন পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সাধারণকে তাহা না জানাইয়া তত বেশী পরিবর্ত্তন করা দোষের হইবে। বিশেষতঃ পরিষদের সেই শৈশব-গঠিত বর্ত্তমান নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্ত্তন যে এখন প্রয়োজন, তাহা পরিষৎ বুঝেন, আর সেই জন্য নিয়মাবলীর আমূল সংস্কারের জন্য নিয়ম-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিয়ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য এ সকল কথারও বিচার করিবেন। অতএব তাড়াতাড়ি করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ বৎসর যাহা হইয়াছে তাহার আর

পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ নিমন্ত্রণ-পত্রে পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপন না দিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে না জানাইয়া হঠাৎ এত বেশী পরিবর্ত্তনের কল্পনা করা বা তদনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় রামেন্দ্রবাবুর কথা অনুমোদন করিয়া বলিলেন, এবৎসরে আপনারা এই রূপেই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন করুণ, পরে নিয়ম-সমিতির মীমাংসা লইয়া বিচারকালে সাধারণ সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করিলে ভাল হইবে।

প্রস্তাবক কবিরাজ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধমত আপন প্রস্তাব নিয়ম-সমিতির মীমাংসাকাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিলেন।

পরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন কর্ম্মচারী ১৪ জন, নির্ব্বাচিত সদস্য ৮জন এবং মনোনীত সদস্য ৪জনকে লইয়া ১৩১৮ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন "আমি পরিষদের নিয়মাবলীর ১৫ (খ) ও (গ) নিয়মের প্রতি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও তদনুসারে অদ্যকার গঠিত সমিতি হইতে যে সকল ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা দেওয়া হউক ও তাঁহাদের স্থানে ভোটের সংখ্যাধিক্যানুসারে অপর ব্যক্তিগণকে সমিতিতে গ্রহণ করা হউক। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার কর মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই প্রস্তাবের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রবাবু বলিলেন ১৩১৮ সালের বৈশাখের হিসাব এখনও খতিয়ান করা হয় নাই, কাজেই বলিতে পারি না কাহার কত বাকী আছে। সুতরাং নিয়ম অনুসারে আমি এখন কাজ করিতে পারি না। সভাপতি মহাশয়ও এস্থলে পূর্ব্ব প্রস্তাবের যুক্তি দেখাইয়া অনুরোধ করিলেন এবারকার নির্ব্বাচন পণ্ড করা ঠিক নহে, কারণ নির্ব্বাচনকারীরা নাম পাইয়া সরল বিশ্বাসে ভোট দিয়াছেন। যাঁহারা প্রার্থী হইয়াছিলেন, আপীস হইতে তাঁহাদের নামাদি ঐই নিয়মানুসারে বাছিয়া ছাপিতে দেওয়া উচিত ছিল, অতএব আমাদের ত্রুটিতে যাহা দোষাবহ হইয়াছে তাহার জন্য এবার সাধারণের প্রদত্ত নির্ব্বাচন নষ্ট করা উচিত নহে। সত্যভূষণ বাবু বরং এ বিষয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে কর্ত্তব্য অবধারণে অনুরোধ করিলে সুব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। সত্যভূষণ বাবু তাহাতে সম্মত হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

অতঃপর পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় বলিলেন—চন্দ্রনাথ বাবু ও আমার বাসস্থান একই স্থানে। আমাদের উভয়ের জন্মস্থান আধক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। আমাদের মধ্যে বাল্য-বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একত্র বহুস্থানে কাজ কর্ম্ম করিয়াছি। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সেবক অতি অল্পই পাওয়া যায়। তিনি প্রথম হইতে সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বহুদিন ইহার সভাপতি থাকিয়া ঐকান্তিক যত্নে এবং প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ইহার গঠনকার্য্যে উন্নতি সাধন এবং কার্য্যপরিচালনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধৈর্য্যশালী এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে সভাপতিত্বে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া পরিষদের প্রথম অবস্থায় নিরুপদ্রবে সর্ব্ব-

বিষয়ে উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিজের রচনায় ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষায় একটা বিশেষ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। রচনার বিশুদ্ধিতা রক্ষায় জন্ত তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিতেন। তাঁহার এসম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর প্রসঙ্গ আছে। পরিষৎ-মন্দিরে আজ এরূপ একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের এবং ইহার একজন অকৃত্রিম হিতৈষী বাবুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিজের অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় এবার ইহার সদস্ত-সংখ্যা-বৃদ্ধি, মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্ত নানারূপ সহজ এবং সুবিধাজনক প্রস্তাব করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রীতিপূর্ণ ও সহজ-সাধ্য প্রস্তাবাদি শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। (এই অভিভাষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "১২১৭বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ হওয়াতে এ প্রবন্ধটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ হইয়াছে। (এই প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্ষশেষে পরিষদের সকল হিতৈষী ও অনুগ্রাহকবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন;—সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বদা পরিষৎ-কথা স্ব স্ব পত্রে প্রকাশ করিয়া ইহার কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করেন। অনেকে অযাচিত ভাবে ইহার সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইহার বলবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়তা করিবেন। গত বৎসরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং এবৎসর পণ্ডিত রসিকরঞ্জন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যত্নের ও চেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের প্রশংসা করিলে পর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

মালদহের পল্লীভাষা

প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়, অতি প্রাচীন কাল হইতে সমৃদ্ধিসম্পন্না নগরী বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছে, কত রাজা বাদশার অধিকার চলিয়া গিয়াছে, কত বিপদাপদ্ দ্বারা গৌড়নগরী বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত কত ভিন্ন জাতীয় নরগণের শৌর্য্য-বীর্য্যপ্রকাশ এই স্থানকে চমৎকৃত করিয়াছিল, কত বিভিন্নভাষী জনগণের আলাপনে গৌড় মুখরিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা ও কল্পনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অশোক-শাসনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কতপ্রকার ভাষার পতন ও উত্থান এই স্থানকে মোহিত করিয়াছে তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সচরাচর রাজধানীতে বৈদেশিক বিভিন্নভাষী নরগণের সমাবেশ হইয়া থাকে। রাজধানীর জনসঙ্ঘের কথিত ভাষা মিশ্রভাব-দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন ভাষী নরগণ আপন গৃহে স্বজাতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকেই আবার দেখিতে পাই, তাহাদের কথিত ভাষার সুর টান ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষার টুকরা এতদ্দেশীয় কথিত ভাষার সহিত মিশাইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া ব্যবহার হইতেছে। এই প্রকার পূর্ব্বকালেও যে না হইত একথা বলা চলে না।

ভাষাপার্থক্য

এক দেশের কথিত ভাষা বাক্যকথনচ্ছলে শিক্ষা করা সহজ হইলেও তত্তৎদেশীয় লিপি-মালা শিক্ষা সহজ নহে। আমরা মালদহের পল্লীভাষায় 'লিপির' কথা আদৌ উত্থাপন করিব না। কথিত ভাষার সহিত গ্রাম্য কবির ভাষার তুলনা মধ্যে মধ্যে করিতে হইবে, নচেৎ পল্লীভাষা সুন্দর হইবে না। গ্রাম্য সংগীতাদিতে প্রাণের ভাষা মনের শাসন না মানিয়া উৎসের ন্যায় ছুটিয়া চলে। সুতরাং গ্রাম্যসংগীতগুলি হইতে আমাদিগকে 'পল্লীভাষা' সংগ্রহ করিতে হইবে। আবার রমণীকুলের কথিত ভাষায় কত আদিমভাব বর্ত্তমান থাকে, পুরুষের কথিত ভাষায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রমণীগণ গ্রাম্যগণ্ডীর মধ্যে নিয়ত অবস্থান করিয়া প্রাচীন কথিত ভাষাকে সজীব করিয়া রাখে। পুরুষ-গণ গ্রাম্যভাষার গণ্ডী ছাড়াইয়া অন্যত্র কথিত ভাষাও শিক্ষা করে বলিয়া তাহাদের কথিত ভাষা প্রকৃত প্রাচীনত্ব ভাব বহন করে না। এই জন্য স্ত্রীপুরুষভেদে কিঞ্চিৎ ভাষাভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কথিতভাষা ও লিখিত ভাষা

স্ত্রী ও পুরুষভেদে কথিতভাষার প্রভেদ

ব্রাহ্মীলিপি, অশোকলিপি, গুপ্তলিপি, সারদা, শ্রীহর্ষ ও কুটিল লিপিমালার উদ্ভব-প্রসঙ্গ ভাষাতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। গৌড় ও পুণ্ড্রনগরে যে উপরোক্ত লিপিমালার অবাধ প্রচলন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে

বিবিধলিপি

পারা যায়। অনেকে আবার নাগরী-অক্ষর বঙ্গাক্ষর হইতে অপ্রাচীন বলিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় ভাষার আদর

যাহাহউক গৌড়ীয়ভাষা এক সময়ে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল। গৌড়ীয় রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া একদা অনেকে ধন্য বোধ করিতেন। গৌড়নগরে বিহার, মিথিলা দেশের কথিত ভাষার সহিত বড়ই মেশামিশি দেখিতে পাই। প্রাচীন গৌড়ীয় পদকর্ত্তারা মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে এক অভিনব সুন্দর ভাষার সমাবেশ করিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থের উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। একদিন সেই ভাষা গৌড়দেশে সমাদৃত হইয়াছিল। ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত গৌড়ীয় বেশ-পারিপাট্যের যদ্রূপ আদর নাট্যসমাজে হইয়াছিল সম্ভবতঃ গৌড়ীয়ভাষাও ততোধিক আদৃত হইয়াছিল। যোজনভেদে ভাষাভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। যদি: পদব্রজে গৌড় হইতে রাঢ়দেশের মধ্যদিয়া মেদিনীপুর অতিক্রমপূর্ব্বক উৎকলে গমন করা যায় এবং কথিত ভাষার প্রতি দৃঢ়ভাবে মনঃসংযোগ করা যায়

কথিত ভাষাভেদের সূক্ষ্মপার্থক্য

তাহা হইলে কীদৃশ প্রণালী অবলম্বনে ধীরে ধীরে ভাষার বেশান্তর সংসাধিত হইয়াছে তাহা অক্লেশে উপলব্ধ হইবে। ভ্রমণকারিগণ এই বাক্যের সার্থকতা যত দূর উপলব্ধি করিতে পারেন, পুস্তকপাঠে তাহার একাংশও সংসাধিত হইতে পারে না। রেলযাত্রীর পক্ষে এ প্রকার ভাষাপার্থক্যের সূক্ষ্মগতিবোধ দুরাশামাত্র।

প্রাদেশিক লিপির কথা বলিতেছি না, কিন্তু মৈথিলী, রাঢ়ী ও উৎকলী ভাষা-সংমিশ্রণে এদেশের ভাষা গঠিত অথবা গৌড়ীয় ভাষাই তাহাদের মৌলিক আদর্শ ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না।

বৌদ্ধ ও কুটিল-লিপি

বৌদ্ধ পালরাজাদের সময়ে কুটিললিপি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল। কথিত ভাষাও সম্ভবতঃ স্থানভেদে পরিবর্ত্তিতাকারে কথিত হইত। লিপি প্রচলন এক হইলেই যে কথিত ভাষা তদনুযায়ী এক হইবে এমত বলা চলে না। পুস্তকের লিখিত ভাষা ও কথিত গ্রাম্যভাষা একরূপ নহে, কিন্তু বঙ্গে এমন এক দিন চলিয়া গিয়াছে যে, লিখিত-ভাষা ও কথিত-ভাষার বড় একটা ভিন্ন ভেদ ছিল না।

বঙ্গীয় গীতিপুস্তকে প্রাচীন কথিতভাষার আদর্শ

চণ্ডী, মনসা, যোগীপাল মহীপালের গীত, শিবসংগীত প্রভৃতি গ্রাম্য কথিত ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া গড়া বলিয়া মনে হয়। খাঁটী সেকেলে কথিত ভাষার আদর্শ ঐ সমুদায় সংগীতপুস্তকে ভুরি ভুরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শূন্যপুরাণীয় ভাষা অতি আদিম বঙ্গভাষা বা গৌড়ীয়। ক্রমে মাণিকগাঙ্গুলী, ঘনরাম, কবিকঙ্কণ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

মিশ্র ভাষা

গৌড়ীয় ভাষাই বঙ্গের আদর্শ ভাষা। কালক্রমে গৌড়নগর অরণ্যে পর্য্যবসিত হইলে মালদহী ভাষা প্রাচীন গৌড়ীয় ভাষার

মৌলিকতা বজায় রাখিয়া এবং মৈথিলী, রাঢ়ী, উৎকলী ও মোসলমানী ভাষার সহিত মিশিয়া এক অভিনব ভাষায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা পুস্তক-লিখিত ভাষাও কিঞ্চিৎ স্থান গ্রহণ করিয়া প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার হারমধ্যে উজ্জ্বল মণিকাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

মালদহের প্রাচীন পল্লীভাষার আদর্শ আমরা নিম্নে বন্দনাদি হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

বৌদ্ধযুগাবসান-কালের ভাষা

গম্ভীরার ভাষা

"স্বর্গের কপিলা মর্ত্তে নামিলা।
বিশ্বেশ্বর ব্যেত বাঁহনে চড়িলা॥
নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী সুদ্ধ।
তাতে উজ্জে দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ॥
কহনৃত গুরু গোসাই সরস্বতীর বরে।
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে॥"

(গম্ভীরা বঙ্গীয় পরিষৎ-পত্রিকা)

মালদহী মঙ্গলচণ্ডীর ভাষা

"টানিঞা ছিড়িল গলের কনক-পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ইতিন ভুবন॥
জাও জাও বাসুকি হউক চিরাই।
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই॥"

(মঙ্গলচণ্ডী-মাণিকদত্ত।)

"জলেতে আসন গোঁশাই জলেতে বৈসন।
জলভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল তত ক্ষণ॥" (ঐ)

শূন্যপুরাণীর মার্জ্জিত ভাষা

উপরি উক্ত কবিতাংশ মালদহে বৌদ্ধযুগাবসানের সাময়িক কবিতা পরিমার্জ্জিত হইয়া ঐ প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বকার ভাষা শূন্যপুরাণীর ভাবের ছিল।

প্রাচীন শব্দ

ব্যেত, গোথনে, উজ্জে, কহনৃত (কহন্ত) একগোটা, ইতিন, চিরাই, বৈসন, করিঞা, ঠেসন, বহিঞা ইত্যাদি শব্দ পূর্ব্বকালের কথিত ভাষার অনুরূপ। ঐ সমুদায় শব্দ গ্রথিত পুঁথিলিখিত ভাষা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে।

প্রাকৃত ভাষার সহিত গৌড়ীয় ভাষার সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকে আবার প্রকৃত গৌড়ীয় ভাষাকে রাক্ষসীভাষা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হই, তাহার হতাদর সম্ভবে না। অধিকন্তু প্রাকৃত-ভাষা

বা গৌড়ীয় ভাষা অতি প্রাচীন ভাষা। ভাষার নিগড়রূপ বৈয়াকরণিক শাসন, কথিত ভাষার মধ্যে বড় বদ্ধমূল নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কথিত ভাষা প্রয়োগে মনের ভাব প্রকাশ করা দুষ্কর। যত সহজে, সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বভাব সুলভ-কথিত ভাষাই জাতীয় জীবনে আদৃত ও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

প্রাচীন শূন্যপুরাণাদিলিখিত বিবরণ ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া মালদহী প্রাচীন সংগীত পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন বিরল নহে।

শূন্যপুরাণ ও মাণিকদত্তের চণ্ডীর ভাষা-বিচার

"পরভুর বিম্বুতে জল হইল আচম্বিতি ॥" ৫০ (শূঃ পুঃ)
"মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল।
(ইষ জিনিঞা তবে সিন্ধু উথলিল ॥) (মাণিকদত্তের চণ্ডী)
"কত শত জুগ গেল এক বস্তু গেআনে ॥ ৮৪
বড় কাতর কূর্ম্মরাজ সহিতে নারে ভর ॥
কূর্ম্মরাজ পলাইল ভাসে মাআধর ॥ ৮৫" (শূঃ পুঃ)
"চৌদ্দযুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ ॥" (মাঃ দঃ চণ্ডী)
"আপনে ধর্ম্ম গোশাই কূর্ম্মরূপ হৈল।
কূর্ম্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল ॥
কূর্ম্মে সহিতে নারে প্রিথিবির ভার।
গজ কূর্ম্মে পৃথিবি জায় রসাতল ॥" (মাঃ দঃ চণ্ডী)

এই প্রকার সাদৃশ্য-দর্শনে আমাদের বোধ হয় শূন্যপুরাণের প্রভাব মালদহে বিলক্ষণ ছিল।

মালদহে শূন্যপুরাণের প্রাধান্য

ক্রমশঃ শূন্যপুরাণের বৌদ্ধভাব চণ্ডীকাব্যে সংবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্তর-বাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে। রথি-মুকুন্দভারতীকৃত প্রাচীন হস্তলিখিত 'জগন্নাথ-বিজয়ে' দেখিতে পাই, শূন্যবাদের আদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম্ম-মতবাদ সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে।

মালদহী জগন্নাথবিজয় পুস্তকের ভাষা

"স্থল,জল (কূল) নাহি ছিল নরহেঁ পবন।
স্বরূপ আকার নাহি ইতিন ভুবন ॥ ২
দিগ্ বিদিগ্ নাহি সৃষ্টি লোকপাল।
ঋষিগণ নাহি ছিল প্রলয় বিসাল ॥ ৩
হেনকালে নিরঞ্জন সয়ন তেজিল।
কেবল প্রকৃতি হৈতে সৃষ্টে মন দিল ॥" ৪ (জগন্নাথ-বিজয়)
তবে ত্রিজগতনাথ বৌদ্ধরূপ ধরি।
প্রবেশ করিল হরি দেউল ভিতরি ॥ ৮৩
লুকাইঞা জোগধ্যানে রহিল শ্রীহরি।
দেউল গঠিঞা রাজা গেল ব্রহ্মপুরি ॥" ৮৪ (জগন্নাথবিজয়।)

"সকল বৃর্ত্তান্ত আমি না জানি ভালমতে।
সুনিছু ইসব কথা উরপি সাক্ষাতে ॥ ১৪১
রাজা বোলে বৃক্ষরাজ কহ উপদেশ।
কোথাতে উলুক বৈসে কহংত বিশেষ ॥ ১৪২
বৃক্ষ বোলে সুন তুমি পুরুষ পুরাণ।
চিরি জিবি নহে কেহো তাহার সমান ॥" ১৪৩
"তবে জোগনিদ্রাতে আছিলা নারায়ণ।
পাশানে রুপিঞা পাদ হৈল্যা অন্তর ধ্যান ॥ ৪৭
কনক কঠুর মধ্যে থাকিলা শ্রিহরি।
আপনা আপুনি চিত্তে জোগধ্যান করি ॥ ৪৭" ঐ

মুকুন্দ ভারতীকৃত অপ্রকাশিত জগন্নাথবিজয় গ্রন্থখানিও মাণিকদত্তের চণ্ডী জগৎজীবন ও তন্ত্রবিভূতি নামক মনসাগীতের ন্যায় বৌদ্ধমতবাদে পূর্ণ দেখিতে পাই, সুতরাং এই সমুদায় প্রাচীন পুঁথিগুলি অবলম্বনে আমরা তান্ত্রিক বৌদ্ধযুগান্তের ভাষার পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলাম। পুঁথিগুলি মালদহলেখকগণের হস্তলিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মুকুন্দভারতী মানিকদত্ত জগৎজীবন কবির মালদহী ভাষা

থসিঞা, ইষ, জিনিঞা, বহিঞা, নরহে, বৃর্ত্তান্ত, সুনিছু, ইসব কথা, উরপি, বোলে, কহত, চিরজিবি কঠুর ইত্যাদি শব্দ তৎকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

মুকুন্দ ভারতীর ব্যবহৃত শব্দ

"তাহার নির্ম্মল জল গহিম্ গম্ভির ॥" ৩৬ (ঐ)

ইত্যাদি পদমধ্যস্থ "গহিম্—গম্ভির" শব্দ অতি উপাদেয়।

মাণিক চাঁদের গীত

মাণিকচাঁদের গীতের ভাষা

"দস গিরির ষাও বইন রবে স্যাথি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব থালী ঘর মন্দিরে ॥"
"জীরব জীবন ধন আমি কন্তা সঙ্গে গেলে।
র'াধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥"

গোবিন্দচন্দ্র গীত

গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভাষা

"সুন্তাছি তোমার তত্ত্ব গুরুর বরাবরী।*
গোবিন্দাই গুরু হইব সিদ্ধা জলন্ধরি ॥৯২
পাসান দেয়াল ঘরের লোহার কপাট।
হিয়ার বাহুনি নাই পিপিড়ার বাট ॥" ৯৩

* বরাবরী—বোসলমান ভাষা হইতে গৃহীত।

"যুক্তপথে আসি জম প্রাণ লিল কাড্যা।
প্রাণ পুরুষ ছাড্যা গেল কায়া রইল পড্যা॥ ১১০
"জোগ সিদ্ধা ময়না মন্ত্রি দেখ্যা লাগে ধন্দ।
মারে পোয়ে জুগী হয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র॥" ১৬৪

গীতিপুস্তকের সাময়িকতা

মাণিকচাঁদের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, জগন্নাথবিজয় ও মাণিকদত্তের চণ্ডী জগৎজীবন ও তন্ত্রবিভূতি নামক মনসাগীতের সমসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়।

পল্লী ভাষা

জ্বালি, দিমু, সুন্তাছি, বরাবরী, গোবিন্দাই, হিরায়, বাহুনি, পিপিড়ার বাট, কাড্যা, ছাড্যা পড্যা, "দেখ্যা লাগে ধন্দ" প্রভৃতি সেই সময়ের কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হইত।

মালদহের পল্লীভাষায় এই সমুদায় শব্দের যথেষ্ট প্রচলন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই প্রকার বৌদ্ধপ্রভাব মন্দীভূত হইলে পর বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যদিও বৌদ্ধ-যুগান্তে শৈবধর্ম্মের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা যে বৌদ্ধপ্রধান সময়ের বর্ণনা করিলাম প্রকৃত পক্ষে উক্ত সময় শৈব-প্রধান বলিয়াই ধরিতে হইবে।

বঙ্গীয় শৈবধর্ম্মপুস্তকে

শিবসংগীত বহুলাংশে পরিমার্জ্জিত; আমরা রামেশ্বরের শিবায়নে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই—

"ঠারি পদ্মা বলে শুন ঠাকুরের ঝি।
শঙ্খপর সম্প্রতি মূল্যের কথা কি॥" (শিবায়ন)
"ঝুটি ধরে ঝাঁটা মেরে দূর করে দিব।
গলাটিপি দিয়া শাঁখা গুণগার লব॥
হর বলে হরি হরি সে শাঁখারী নই।
সইয়ের সাধের সয়া তারে মারে সই॥
মহতের মাগ্ সই মহতের ঝি।
বলে শঙ্খ পরিলে বুড়ার চারা কি॥" (ঐ)
"সকল পরায়ে শেষে উজাইল বাই।
বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনী রাই॥" (ঐ)
"এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥" (ঐ)
"হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ইষদুষ্ণ সুপ দিল বেসারির পরে॥" (ঐ)
"নাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ॥" (ঐ)
"মৈনাক গোড়াল্য যেয়ে মা বাপ রহিল চেয়ে
বুক যেয়ে পড়ে প্রেম ধারা।" (ঐ)

শিবায়নের ব্যবহৃত শব্দ

ঠারি, খুঁটি, ঝাঁটা, গলাটিপি, গুণগার, সয়া, সই, রাগ, ঝি, চারা, উজাইল, বাই, রাই, হাড়িপানে, বেগারির, নাটাপাটা, বাটা, আলাইল, গোড়াল্য, বেয়ো ইত্যাদি শব্দ রাঢ়দেশে এবং এতদ্দেশেও অধিক পাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ভাষা পরিমার্জ্জিত হইলেও তাহাতে গ্রাম্য শব্দের বিপুল সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

কবিকঙ্কণের ভাষা

"ভাদ্রপদমাসে বড় দুরন্ত বাদল।
খালিজুলি ভরা হইল নাচলে ছাগল॥
ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি মুচাকানি খানি॥" (কবিকঙ্কণ)
"মণ্ডলার বেস্তা আইল শঙ্কর লায়ের বেটা।
আঙলা বাটিয়া যার করতলে ঘাঁটা॥" (কবিকঙ্কণ)
"নীলাম্বর দাস বলে, শুন রাম রায়।
পসরা করিত বাপা নাহি প্রত্যবায়॥
কড়ীর পোটলী বান্ধি জাতি ব্যবহার।
এটোচোপা খাইলে নহে কুলের খাঁখার॥" (কবিকঙ্কণ)

কবিকঙ্কণের ব্যবহৃত শব্দ

খালি, জুলি, কাঁকালে, মুচা, কানি, বেটা, আঙলা, বাটিয়া, ঘাটা, পসরা, বাপা, এটো, চোপা, খাঁখার ইত্যাদি শব্দ এদেশেও প্রচলিত রহিয়াছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভাষা এদেশে তত আদৃত নহে, মাণিকদত্তের চণ্ডী এদেশী ভাষায় লিখিত বলিয়া উহার আদর যথেষ্ট আছে। গৌড়ীয় বাদশাহ হোসেন শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক ভাষা অতি সুন্দর এবং প্রাকৃতাভিমুখী ছিল।

হোসেনশাহী আমলের ভাষা

হোসেন শাহী আমলে যে সমুদায় গ্রন্থাদির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মালদহের ভাষার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহার যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব।

পল্লীভাষা

মালদহের কয়েকটা জাতি ও ভাষা

মালদহ জেলায় নাগর, ধানুক, চাঁই ও পলিয়া জাতির সংখ্যাধিক্যনিবন্ধন ভাষারও পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নাগর, ধানুক প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধারণ বঙ্গভাষা, যাহা মালদহের নিজস্ব বলিয়া দাবী করা চলিতে পারে, তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

(১ম)

মালদহে প্রচলিত কতিপয় বিশেষ্যপদবাচক শব্দের নামোল্লেখ করিলাম ; জাজা, ত্যালাই,

মালদহের পল্লীভাষায় ব্যবহৃত শব্দ

খাঁড়ী, ভুনি, খড়ী, দাও, পাস্নি, কাঁচি, হাঁসুয়া, ব্যাসর, টিকোলী, গোদানী, বেন্তী, খোয়া, ডাবোর, চ্যারাক্, তস্বির, টিকিয়া, তামাকুল, হুকা, আড়া, পহি, কাম্পা, তাকী, রসা, ভাদা, বাল, পুরী, আহুরশা, উখরা, ব্যাসাতি, পাতিল, চাকোন, চুকাই, ঝাঁজোর, মুঁই, মুঁয়া, ঢোক্সা, ডালি, করপা, খুঁনী, ঠুসী, বিজি, (বংশনির্ম্মিত) ধোকড়া, নাইদ বা নাইন্দ, গাছা, কুঠী, হাঁড়া, আওয়াক্কা বা আঁধারখা, কোতা, জাঁত, থুনী, টাটি, নাও, বইঠা, তজি, খল্পা, বাইগ্যা, বিলাতু, পসকরী, বর্সী, (বসি) আখা, চুলা, বোতা, পেটারি, ঝাঁপি, পথের। উপরি উক্ত শব্দসমূহ সচরাচর গ্রাম্য চলিত কথায় নিয়ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্যবসা ও ব্যক্তিগত নাম

(পুংলিঙ্গবাচক শব্দ)

ব্যবসা ও ব্যক্তিগত শব্দ

ব্যাসাতি, কুঁজরা, পাথরা, জিবনী, মেছ্যা, নাপিত বা নাউয়া, সোণার, কামার, কুম্ভার, মণ্ডল, সাহ, পোদ্দার, নাইয়া, পাইট, ম্যালান্, পসারি, মহলদার।

নাপিত, নাউয়া

নাউয়া

"নয়া নাউয়ারে ভাল কর্য্যা কামাইও হামার বাছারে।" (মালদহগীত)

"মালীপাড়া নাউয়াপাড়া রাঢ়িপাড়ার কাছে।"

(রঙ্গপুরের জাগের গান পরিষৎ-পত্রিকা)

স্ত্রীলিঙ্গবাচক

স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ

ব্যাসাতিনী, কুঁজরাণী, পাথরাণী, মেছ্যাণী, নাপিতান্ বা নাপ্তানী, সোণারণী, কামারণী, কুম্ভারণী, মণ্ডলাইন্, সাহন্, পোদ্দারণী, ম্যালানী, খবিয়াণী, মহলদারণী, গৌয়ালিনী।

অধিকাংশ পুংলিঙ্গবাচক শব্দে আনী বা নী সংযোগে স্ত্রীলিঙ্গপদের সিদ্ধ হয় কিন্তু—

মণ্ডল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মল্যান্ ও মণ্ডলাইন্

সাহ " " সাহন বা সহন্ পদসিদ্ধ হয়।

"গৌয়ালিনী বোলে সাধু তুমি খাহ দহি।" (চোরচক্রবর্ত্তী)

(শয্যা উপাদান)

কয়েকটী পল্লীভাষার শব্দপ্রয়োগের পদ্ধতি

শ্যাবা, তালাই, পস্করি।

শ্যাবা বিছাও=শয্যা বিস্তার কর।

বস্ত্র

খাঁড়ী, ভুনি, ধড়ী, ফোতা

হাম্‌রা পারি খাড়ী ভুনি, ধড়ী বুন্‌তে।

অলঙ্কার

ব্যাসর, হাঁসুলী, টিকোলী (টীপ)

লাকেতে ব্যাসর পিঁধেচো।

কপালে টিকোলী দিবো।

হুকা, তামাখুল, টিকিয়া, বোতা (নলিচা)

"পয়সা বিনে গিয়্যাছি হামি ভাকিয়্যা।

ক্যাম্‌নে কিনি হুকা তামাকুল টিকিয়া॥

ব্যঞ্জন বা বেস্‌তি

ভাজি, রসা, ভাজা, ঝাল।

মৃৎপাত্র

পাতিল, তোইলা, ঢাকন, চুকাই, কাতারি, ঝাজোর।

ঝুড়ি

চোক্‌না, ডালি, করপা, ঢাকী, খুলী, ঠুলী, বিজি।

মিষ্টান্ন

পুরী, আহুরশা, ঝুরী, ভুষারলাড়ু, উথরা (মুড়কী)

ঋষিআনী

ঋষির স্ত্রীলিঙ্গে ঋষিআনী পদ সিদ্ধ হয়।

ঋষিপত্নীস্থলে ঋষিআনী।

"মুনিঞা ঋষিআনি আনন্দিত হৈল।" (মাঃ দত্ত চণ্ডী)

মরদ স্ত্রীলিঙ্গে মাইঞা হইবে, মরদী বা মরদিনী হয় না, এখানে ইহা নিপাতনে সিদ্ধ বলিতে হয়।

"মাইঞা লোকের কথা শুন্যা মরদ কুথা চলে।"

সম্বোধনে

ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ও নিম্নত্ব বোধ-জ্ঞানসূচক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা,—'হে", "গে" "টে" "বে" এই চারিটি সম্বোধন-বাচক অব্যয়সংযুক্ত করিতে হয়।

পল্লীভাষায় সম্বোধন কালে পদপ্রয়োগ ও শব্দ-পদ্ধতি

যথা পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিতে হইলে "বাবা হে" এইরূপ পদসিদ্ধ হইবে। "হে" শব্দ পুংলিঙ্গবাচক।

পুত্র মাতাকে সম্বোধন করিলে "মাগে" এই প্রকার বলিতে হইবে। "গে" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক। পিসীগে, মাসিগে,দিদিগে ইত্যাদি।

মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিলে "বেটী টে" বলিবে।

"'টে' শব্দ নিম্নপদস্থ স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহিন্ টে, সঙ্গিনী টে, কামিনী টে ইত্যাদি।

'বে' শব্দ হীনতা-জ্ঞাপক সম্বোধনসূচক শব্দ যথা—

"হাঁবে শালা!" হাঁবে সরতা! হাঁবে বিপ্‌নে! 'বে' পুংলিঙ্গবাচক শব্দ।

সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবকে 'বে' সম্বোধনসূচক শব্দদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

"হাঁ" শব্দ সম্বোধনে হে, বে, গে, টে, শব্দের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষভাবে বিস্ময়সূচক সম্বোধন বুঝায় এবং তখন উক্ত সম্বোধন-সূচক পদটী সম্বোধক শব্দের পূর্ব্বে বসে যথা—

"হাঁহে বাবা," হাঁহে দাদা,।
হাঁবে শরৎ, হাঁবে যদু,।
হাঁ গে মা, হাঁ গে দিদি।
হাঁটে বহিন্, হাঁটে ভাউজ। ইত্যাদি।

সচরাচর সম্বোধনসূচক হে, বে, গে, টে শব্দচতুষ্টয় সম্বোধনের পরে বসিয়া থাকে। যথা—বাবা হে, মা গে, বহিন্ টে, শরতা বে ইত্যাদি।

হলন্ত ও স্বরন্ত পদ-প্রয়োগে উচ্চ ও নীচভাব-জ্ঞাপকতা

পদের অন্তস্থ অকার লুপ্ত করিয়া সম্বোধন করিলে অবজ্ঞাসূচক পদ সিদ্ধ হয় এবং 'অ' কার সংযুক্ত থাকিলে তাহা সম্মানসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। যথা—"সাহন্" অসম্মানসূচক। "সাহন" সম্মানসূচক, মোল্লাইন্ অসম্মানসূচক, "মোল্লাইন" সম্মানসূচক বোধ হইবে। মোড়ল্ মোড়ল, দালাল্ দালাল ইত্যাদি। ক্রিয়াপদেও এই প্রকার স্বরান্ত ও হসন্ত প্রয়োগবশতঃ সম্মাননার ইতর বিশেষ হইয়া পড়ে। ক্রিয়াপদ ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইবে।

"সোনা বহুটে, রথ দেখ্‌তে চলেক্ হামার সাথে তে।
নাকে তে নাক্‌মাছি দিব।
কপালে টিকোলী দিব॥
গায়েতে গোদানী দিলেকে?" (ঐ)

হে, বে, গে, টে, অব্যয় শব্দদ্বারা লিঙ্গজ্ঞান এবং সম্মান-অসম্মান-জ্ঞান

রথ দেখিবার জন্য সোনা বহু অর্থাৎ সুন্দরী বধূকে সঙ্গে যাইবার জন্য বলিতেছে এবং নাকে নাকমাছি, কপালে "টিপ" কিনিয়া দিবে "গোদানী অর্থাৎ উল্কী (Tattoo-marks) কে দিয়াছে। "চলেক্" চল, গমন কর ইহা একটী ক্রিয়াপদ, "চলেক্" 'ক' হলন্ত হইলে সঙ্গিনী বা নীচতা বা অবজ্ঞাসূচক হইয়া থাকে, কিন্তু "চলেক" স্বরান্ত হইলে সম্মানসূচক হইবে।

"চলেক না মা" "চলেক না দিদি" স্বরান্ত বলিয়া সম্মানসূচক। "চলেক্ না মা" বা "চলেক্ না দিদি" এ প্রকার হইতে পারে না। চলেক্ না বেটা বা চলেক মা বহিন্ হইতে পারে।

সোনাবহুকে "টে" সম্বোধন করাতে "চলেক্" ক্রিয়াপদটা হলন্ত হইয়াছে।

হে, বে, গে ও টে অব্যয় শব্দ ব্যতীত আর অন্ত কিছু নহে হাঁহে, হাঁবে, হাঁগে, হাঁটে অব্যয়পদ।

"সোবর্ণ নাদিঞা তবে আনিল গড়িঞা।
নাদিয়ার মধ্যে তবে ছাল্যা সোয়াইঞা॥" (মাণিকদত্ত—চণ্ডী)
"সমুদ্রে ভাসাঞাদিল ধর্ম্ম স্মঙরিঞা।" (ঐ)
"রূপায় ঢাকুনি তবে দিল ঘুচাইঞা।
ঙোহা চোহা করি ছাল্যা কান্দিছে বসিঞা॥" (ঐ)

ভাসাঞা, স্মঙরিঞা, ঘুচাইঞা, বসিঞা, গড়িঞা, সোয়াইঞা প্রভৃতি "ঞ" অন্ত ক্রিয়াবাচক পদগুলির ব্যবহার যথেষ্টছিল। প্রাচীন পুঁথিগুলিতে ইহারনিদর্শন বিরল নহে। "মাণিকদত্তের চণ্ডীকাব্য" মালদহের প্রাচীন কথিত ভাষার আদর্শ বলিতে হইবে।

"ঙোহা" "চোহা" এদেশের চলিত কথা এবং অব্যয়-পদবাচ্য।

সর্ব্বনাম

(আমি)

সর্ব্বনাম পদের পল্লীভাষায় রূপবর্ণন

আমি, হামি, হাম্মা, আম্বি, হাম্ভি।
আমার, হামার, হাম্মার, আম্ভার।

(তুমি)

তুমি, তুম্বি, তুম্ভি, তুঁই, তুঞি, তুঁহি, তো,
তোমার, তুমার, তুম্বার, তুম্ভর, তুঁহার, তুঞির, তুঁহির, তুহার, তোহার।

(তিনি)

তিনি, তেনার, তানার, তাঁহার, তাম্মার, তাম্ভার, তামর।

(বহুবচনে)

আমাদের, হামাদের, আমাদিগের, আম্মাঘেরে, মোরেঘেরে, তোমাদের, তোমাঘেরে, তোমাদিগের। তাহাদের, তেনাদের, তেনাঘেরে, তবহুঁ।

তিনি, তামর, তাম্মর।

"তুহুতি তৈয়ার ক'রতে তাম্‌রা বড় দড়॥"
(রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ ৪র্থ সংখ্যা)

তাম্‌রা = তাঁহারা।

রঙ্গপুরে যেমন তাঁহারা বোধক 'তাম্‌রা' শব্দের প্রচলন দেখিতে পাই তদ্রূপ মালদহেও তাম্বর বা তামর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"মোরে ঘেরে"

"বুঢ়া হিন্দু নাইকো ফলে, "মোরে ঘেরে" কোরাণে আদম বলে"

(গম্ভীরা গীত ৺ধনকৃষ্ণ অধি)

বাঁশের হয় ঘ্যারা ব্যাঢ়া আর ঢ্যারা চরখী।
তাঁতিঘেরে লাটা হয় আর দোঁয়ার টাঙা সড়কী॥
আর ছ্যালা ভুল্যা ফিড়কী॥
হিন্দুঘেরে ধ্বজা হয়, মুসলমানের তাজিয়া
এসে বস্যাছ বর সাজিয়া॥"

(গম্ভীরার গান)

"ঘেরে" শব্দাত্মক সর্ব্বনাম পদপ্রয়োগ

এস্থলে "তাঁতিঘেরে" "হিন্দুঘেরে" পদের প্রচলন দেখিতে পাইবেন। 'আমাঘেরে' "তেনাঘেরে" অনুরূপ।

কতিপয় পল্লীভাষায় ব্যবহৃত শব্দ

ঘ্যারা, ব্যাঢ়া, ঢ্যারা, চরখী, লাটা, সড়কী, ছ্যালা, ফিড়কী, ভুল্যা, ইত্যাদি পল্লীভাষা শব্দ যথেষ্ট শুনিতে পাই।

কতিপয় পল্লীভাষায় ব্যবহৃত শব্দ

বড়াপ্‌=পিতামহ। বোবো=পিতামহী।
ছোজ্‌মু=দেবর। বুবু=পিতামহী বা মাতামহী।
সম্বন্দী=বেহাই (মুঃ ভাষা)

ক্রিয়াপদ

সচরাচর ক্রিয়াপদগুলি অস্বাভাবিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ বর্ত্তমান অতীত প্রভৃতি কালবাচক হয়।

যাওয়া, খাওয়া, লওয়া, শয়ন, দেওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বর্ত্তমান ও অতীতে নিম্নলিখিত রূপ হইয়া থাকে।

কতিপয় ক্রিয়াপদের বর্ত্তমান ও অতীতাদির প্রয়োগরূপ

বর্ত্তমান	অতীত
যাওয়া	যেল্‌ছিলাম, গিলছিলাম্‌, গিলছিল।
খাওয়া	খেল্‌ছিলাম, খেলছিল।
লওয়া	নিল্‌ছিলাম্‌, নিল্‌ছিল।
শয়নকরা	শুৎছিলাম, শুৎছিল।
দেওয়া	দিল্‌ছিলাম, দিলছিল।

আমি গিয়াছিলাম—হামি গিল্ছিলাম্।
আমি খাইয়াছিলাম—হামি খেল্ছিলাম্।
আমি লইয়াছিলাম—হামি নিলছিলাম।
আমি শুইয়াছিলাম—হামি শুৎছিলাম।
আমি দিয়াছিলাম—হামি দিলছিলাম।

এবং

সে গিয়াছিল—সে গেল্ছিল।
সে খাইয়াছিল—সে খেল্ছিল।
সে দিয়াছিল—সে দিল্ছিল।

এবং

তাঁহারা গিয়াছিলেন--তেনারা গেল্ছিলেন।
তাহারা দিয়াছিলেন—তেনারা দিল্ছিলেন।

এই প্রকার অতীতকালের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

'বলা' শব্দের অতীতে বল্ছিলাম, 'কহা' শব্দের অতীতে কহেছিলাম, কহুছিলাম, কহুমু্।

আমি কহিতেছি—হামি কহুচি।

কহস্ত, বোলেস্ত, চলেস্ত, ফিরেস্ত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

'কহন্ত গুরুগোসাঞ সরস্বতীর বরে।" (গম্ভীরাবন্দনা)

সচরাচর নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার হয়।

('য' ফলাযুক্ত)

য (্য) ফলাযুক্ত পদের ব্যবহার ও বহুলতা

ফ্যাক্‌না, ভুল্যা, তুল্যা, গল্যা, চল্যা, বল্যা, দিল্যা, দিয়া, ঢ্যালা, গিল্যা, ত্যাড়া, চাঁড়্যা, পড়্যা, গড়্যা, দৌড়্যা ইত্যাদি।

ক্যাক্‌না

কতিপয় 'য'ফলান্তক্রিয়াপদের ব্যবহার নির্ণয়

"বুচ্যা ফ্যাক্‌না১" কোর্‌য়া রয়্যাছে বইস্যা।"

ভুল্যা (ভুইল্যা)

'ভুল্যা" গিয়াছিস্বাঁটা২, লাগিয়াদিয়াছিস্ল্যাট্টা।

তুল্যা (তুইল্যা)

'তুল্যা" রাখ্যাছি হাউস৩কর্‌য়া (সক করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি)

গল্যা (গইল্যা)

মাগীটে—? মিন্‌ষ্যার কথায় গিয়াছিস্ "গল্যা।"

১। ক্যাক্‌না=কাপ, সঙ।　২। বাঁটা=রাস্তা, পথ।　৩। হাউস=সক, কৌতুক।

চল্যা (চইল্যা)

হাঁবে বুড়্যা ! গেলি "চল্যা ঠোক্‌না৪ খাবার ডরে।

বল্যা (বইল্যা)

সাহন্ টে ! চল্‌লি গঙ্গাসিয়ানে৮, 'বল্যা" কহা গেল্যা ভাল হ'তোটে।

দিল্যা, দিয়্যা, চ্যালা।

"দিল্যানা" দুধের লোটা৫। "দিয়্যাছ" হাউস্‌রঙগে৬ গা"চ্যালা৭"।

গিল্যা

"গিল্যা" শব্দের উচ্চারণভেদে অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

১। গিল্যা—কর্দ্দমবৎ, গলগলে।

২। গি (ই) ল্যা—গিলিয়া, গলাধঃকরণ করিয়া।

১। লয়া চালের "গিল্যা" ভাত।

২। "গিল্যাছি" কেঁাৎকয়্যা।

ত্যাড়া বা তেড়্যা০

"ছেড়্যা৯" দিয়া ত্যাড়া১০ ধর‍্যাছো১১।

চ্যাঁড়া বা চাড়্যা

থুনি১২ দিয়্যা ধর‍্যাছি "চ্যাড়া১৩"

চ্যাড়া ধর্‌বে শালা গান।

পড়্যা

"পড়্যা১৪" পড়্যা গুতান্১৫ খাবি বে ?

পড়্যাছিস্ বাটুপারের পাল্লায়।

দৌড়া

দৌড়্যা পালাচ্ছিস্ কুন্‌১৬ঠে।

"ধাঁকার" ও "কোয়াকার" প্রভৃতি শব্দের প্রভূত ব্যবহার হইয়া থাকে।

"কড়্যা রাঁড়ী বলে হামার তুল্যাছিস্ "ধাঁকার"—অর্থাৎ' বালবিধবা বলিয়া আমার কুৎসা তুলিয়াছ।

'মড়ায়া, গাঙেরকুলে মর্‌তে বস্যাছিস্—এখ্‌নি কোয়বো "কোয়াকার।"

মৃতবৎ (মড়ার মত) নদীতীরে মরিতে বসিয়াছ—এখনি কুৎসিৎ গালি দিব।

৪। ঠোক্‌না—রমণীকর্ত্তৃক গণ্ডে আঘাত। ৫। লোটা=ঘটী। ৭। চ্যালা=ঢালিয়া।
৬। রঙগে=রঙ্গে। ৮। সিয়ানে=স্নানে। ৯। ছেড়্যা=ছাড়িয়া।
১০। ত্যাড়া=তাড়াকরিয়া। ১১। ধর‍্যাছো=ধরিয়াছ। ১২। থুনি=খুঁটী।
১৩। চ্যাঁড়া=চাঁড়ি করিয়া, উচ্চকরিয়া। ১৪। পড়্যা=পড়িয়া।
১৫। গুতান্=গুতো মারা। ১৬। কুন্‌ঠে=কোথায়।

"এ" অন্তক্রিয়াপদ

'এ' অন্তক্রিয়াপদের ব্যবহার

"এ" অন্ত শব্দগুলি একণে বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে বিদ্যমান। মালদহ জেলায় মৃতশব্দ রূপে প্রাচীন পুঁথির শোভা সম্পাদনার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"এ অন্ত ক্রিয়াপদ

করিঞা, রহিঞা, খসিঞা, জিনিঞা, লুকাঞা, ধরিঞা, দেখিঞা, পাঞা, হঞা, হৈঞা, বেড়িঞা, আসিঞা, লঞা, ভাবিঞা, হাসিঞা, ইত্যাদি।

চন্দ্রকলিকাগ্রন্থ* এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত, সুতরাং আমরা "এ" অন্ত ক্রিয়াপদের পরিচয় উক্ত গ্রন্থ হইতেই প্রদান করিলাম।

করিঞা

"যুগড়া "করিঞা" দাড়াইল সনাতন।" ১৬

দেখিঞা

"দেখিঞা" সঙ্গের অত খিজমত দায়।"

ধাইঞা

"ধাইঞা চলিলা দূত সোনাতন-ঘরে ॥" ১১

* "শ্রীরূপ সনাতন মুখাশ্রিত উক্তি শ্রীচন্দ্রকলিকাগ্রন্থ" আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বাউল দরবেশীগণের প্রিয় গ্রন্থ, মালদহে পূর্ব্বে অধিকাংশই শাক্তধর্ম্মাবলম্বি-জনগণে পূর্ণ ছিল। "নেড়ানেড়ী" এদেশে এক সময় প্রাধান্ত-স্থাপন করিয়াছিল। গয়েশপুরে ঐই সম্প্রদায়ের একটী বিখ্যাত আখড়া ছিল। বর্ত্তমান কালে সেই স্থানে গোলক নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকমতাবলম্বী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল ঐ নেড়া নেড়ীরূপে প্রধান্ত লাভ করিয়াছিল। তাহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায় বীরভদ্রের মতাবলম্বী সম্প্রদায় বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেও আমাদের উহা বিশ্বাস হয় না। সেই নেড়ানেড়ীর যথেচ্ছাচারিতাই রাসকেলী উৎসবে বৈষ্ণব-বিক্রয় প্রথার সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। সেই নেড়া নেড়ীর দল ভ্রষ্টাচারী ছিল, তাহারাই "বাউল" দলের মূল বলিয়া মনে হয়। এদেশে প্রবাদ আছে "ঈশান" গুরুত্যাগী হইয়া সনাতনের তদানীন্তন বেশ ভূষাদির অনুকরণ করিয়া বাউল দরবেশীদলের নেতা হইয়া এদেশে উক্ত "বাউল দরবেশী" মতের প্রবর্ত্তন করে। "চন্দ্রকলিকা" গ্রন্থ উক্ত দলের ভজনমার্গের সুন্দর ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থেই লিখিত আছে সনাতন—

"প্রেমে মত্ত হঞা ধারে বাহ্য নাহি জানে। ৪৭

এবং তিনি—

"বাউলের গতিমত চলে দরবেশ।"

এই বাউলের বা পাগলের গতির মত দাড়ী গোপ-বিশিষ্ট মোসলমানি-বেশ-পরিহিত সনাতন "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" বলিয়া চলিয়াছিলেন। ঈশান সেই অনুকরণে যে ধর্ম্মমতপ্রচার করিয়াছিল, সেই মতের নাম বাউল-সম্প্রদায় এবং মোসলমানগণ এই বাউলসম্প্রদায়কে "দরবেশী" সম্প্রদায় বলিত। দরবেশী বিবরণ "দিন কেতাব" বর্ণনাকালে বর্ণিত হইবে।

গিঞা

"সবে জানাইল "গিঞা" পাতসার কানে ॥" ৮

শুনিঞা

"শুনিঞা" উকিল মুখে হইলা বিস্মিত ।"

ছাড়িঞা

চন্দ্রকলিকাগ্রন্থে "ঞ" অন্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ

"শুনি তুমি পলাইবে উজিরি "ছারিঞা ॥"

পাঠাইঞা

"তে কারণে আনাইল দূত পাঠাইঞা ॥" ১৭

বোলাইঞা

"তাহাকে "বোলাইয়া" কহেন বার বার ।"

পাইঞা

"হুকুম "পাইঞা" হবু পড়ে দুই পায় ।"

তৎকালের বাউল-গ্রন্থে এই প্রকারের বহুল উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের নিকট এই বাউল সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের তালিকা-প্রকাশকালে তাহার বিবরণ লিখিত হইবে। অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ এবং শক্তি ও শিব-বিষয়ক গ্রন্থেও এই "ঞ" যুক্ত পদের ছড়াছড়ি দেখিয়া সাময়িক "ঞ" রুচির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

"স্ত" শব্দবিশিষ্ট ক্রিয়াপদের প্রয়োগবিধি

দিলেস্ত, কহেস্ত, বোলেস্ত, কসেস্ত, প্রভৃতি "স্ত" অন্তক্রিয়াপদের প্রচলন সেই বৈষ্ণব কবির সময়েই বিদ্যমান ছিল। মালদহে ইহার যথেষ্ট প্রচলন থাকিলেও অধুনা আর ঐ প্রকার পল্লীভাষায় নাই বলিলেই হয়। হস্তলিখিত গ্রন্থাদিতে ঐ প্রকারের পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"মায়া হৈল মুনিবরে : কন্যাকে 'দিলেস্ত' বরেঃ জোজনেক হইল সুগন্ধি ॥"

(মহাভারত-আদিপর্ব্ব—নিত্যানন্দ ঘোষ)

"নাচাহস্তি" সরচাপ না "চাহস্তি" টোন ॥"

(মহাঃ দ্রোণপর্ব্ব, শ্রীকরনন্দী)

"সর্ব্ব সৈন্য "দহস্তি" আচার্য্য একেশ্বর।" (ঐ)

"কহন্ত গুরু গোসাই সরস্বতীর বরে ॥" (গম্ভীরা মালদহ)

বিবিধ অপ্রকাশিত পুঁথি হইতে "স্ত" অন্তক্রিয়া-পদের উদাহরণ

"দেখিলেস্ত বিরসিং বাড়িতে সে গিয়া।" (বন-মহা শ্রীকরনন্দী)

"আপনার সাক্ষাতে রাজা দেখিলেস্ত তবে।" (বন-ঐ)

"তে" = "ৎ"

পল্লীভাষায় "তে" প্রয়োগ নিয়ম

পল্লীভাষায় "ঘোড়াতে, মোড়াতে, জুড়াতে (ছায়াতে) ছায়াতে, তফাতে, মুক্তেতে ইত্যাদি পদের অন্তস্থ "তে" শব্দ "ৎ" হইয়া যায়।

"তে" শব্দ "ৎ" হইয়া যায়
উদাহরণ

"সে ঘোড়াৎ' চড়্যা গ্যাল।"
"ঘোড়াৎ' চড়্যা আলি।"
"ভুড়াৎ' থা" "ছায়াৎ' থা।"
"ঘোড়াৎ' বইস্যা আছ।"
"তফাৎ যা।" (মালদহ)
'পাকাডালিম দিম কত কি করিম;
"মুখোৎ" ভাসাম্ চুমা খায়া।" (রঙ্গপুর-সা-প-প ১৩১৬ ২য়সং)

অনেক স্থলে 'ত' শব্দান্তে না থাকিলেও "ৎ" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

"চিরৎ" পদের ব্যবহার

"চিরৎ' কাল হইতে আলকা (আকলা) বনে বোসী।"
(হস্তলিখিত সূর্য্যের ব্রতকথা)
"চিরৎ" কাল পক্ষিরাজ তথায় বৈসে।" (জগন্নাথ-বিজয়)
"চিরৎ" শব্দ পল্লীভাষায় নিয়ত ব্যবহার হইয়া থাকে।

দিল্ কিতাব

গৌড় বাঙ্গালার রাজধানী বহুকাল মোসলমান বাদশাহী শাসনের অধীন থাকায় এবং দেশে বাদশাহীভাষায় লিখন পঠনের প্রচলন হওয়ায় দেশীয় কথিত এবং লিখিত ভাষায় বৈদেশিক ভাষা প্রবেশ করিয়াছিল, এজন্য পল্লীভাষা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সচরাচর নাগরিক বাক্যকথন ভাষার অনুকরণ সুদূর পল্লী-সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর প্রচলন তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর আদর্শ ছিল বলিলেও বলা চলে।

মালদহের হস্তলিখিত
দিল্ কিতাব

এদেশে মোসলমানী হাবভাব, আদব-কায়দা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং কথাবার্ত্তার অনুকরণ তীব্রবেগে চলিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালার ভাষা তৎকালে বাদশাহী ভাষায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। গৌড়ীয়ভাষা ক্রমশঃ নূতন নূতন মোসলমানী ভাষার শব্দে পূর্ণ হইয়া উঠে।

মোসলমানী ও পল্লীভাষার
মিশ্ররূপ

এমন দিনও বাঙ্গালার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, হিন্দুকে মোসলমানী কায়দা, বেশ ও ভাষা শিক্ষা না করিলে জীবন-সংগ্রামে স্থায়িত্বলাভের আদৌ ভরসা ছিল না। আত্মসমাজ-রক্ষার্থে বাধ্য হইয়া উর্দ্ধিত জাতীর অনুকরণ আবশ্যক হইয়াছিল। যাহা স্বভাবের শাসন-নিয়ম তাহা সদা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। কবিকঙ্কণ এই জীবনসংগ্রামোপযোগী কর্ত্তব্য পথের সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

"যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া, ঢেলায় মারে বাড়ি।" (কবিকঙ্কণ)

মোসলমানী বেশভূষার সহিত মোসলমানী ভাষা পল্লীভাষার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে

তাই বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীকে "চল্লিশ হাতের পা" এদেশীকে মস্তকে ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং ইজার চাপকান্ পরিতে হইয়াছিল। এপ্রকার করিলেও হিন্দুগণ বাদশাহী জাতির বেশভূষার অনুকরণ করিবার ও উদ্ধত জাতির সহিত পূর্ণমাত্রায় মিশিবার সুবিধা পান নাই। নিয়ত মোসলমান-সমাজের সম্পর্কে অবস্থান করিয়া, বিবিধ কারণে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ এবং রাজকীয় কর্ম্মচারিরূপে অবস্থান করিয়া ইঁহারা ধীরে ধীরে বাদশাহী জাতির সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিবার সুবিধা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে রাজার জাতি এবং রাজধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীর সহিত হিন্দুর মিশ্রণে একদিকে যেমন বাদশাহী জাতির বেশভূষাদির অনুকরণ খরবেগে চলিতেছিল, অন্যদিকে তেমন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গৌড়ীয় ভাষা-ভাণ্ডারে আরবী পারস্যাদি ভাষার অবাধ বিস্তার করিতেছিল।

মোসলমানী ধর্ম্মভাবের সহিত ভাষার ভাববৃদ্ধি

সেই সময়ের হিন্দুমুসলমানের "সত্যপীরের পাঁচালী" ও "সত্যপীরের সিন্নির" ব্যবস্থার প্রচলনে মণিকাঞ্চন-যোগের নিদর্শন দেখিতে পাই। মোসলমান ফকীর বা পীরগণের তখন প্রবল প্রতাপ বর্ত্তমান ছিল। নবধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশে তৎকালে হিন্দু মোসলমান বিদ্বেষের ভীষণ জ্বালামালার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই নূতন অথচ ভীষণ অনিষ্ট-সাধন কার্য্যের ভীষণ পরিণাম হইতে জাতীয় জীবন ও সমাজ-রক্ষার উপযোগী উপায় উদ্ভাবন আপনা আপনিই উত্থিত হইয়াছিল। সেইটী কি ? না নূতন ধর্ম্মপন্থী "বাউল দরবেশ"। ইঁহারা বাহ্য পোষাকপরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে ও শৌচাদি ক্রিয়াতে সম্পূর্ণ মোসলমান ফকীরের মত এবং ধর্ম্মমতে হিন্দুধর্ম্মের কতকটা অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। আমরা এদেশের বৃদ্ধগণের মুখে গল্পচ্ছলে শুনিয়াছি, এদেশের অনেক হিন্দুকে বলে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল এবং অনেকে উক্তধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়াও সংসর্গদোষে হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু হিন্দুগণের তাৎকালিক গোঁড়ামিবশতঃ তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও

মোসলমানগণের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ও তাহার বিকার

সমাজে গ্রহণ করা হয় নাই। যাঁহারা বেশভূষা আচার-ব্যবহারে মোসলমান থাকিয়াও ধর্ম্মমতে অনেকটা হিন্দুর মুখাপেক্ষী ছিলেন তাঁহারাই বাউল বা দরবেশী সম্প্রদায়। যাঁহারা মোসলমানধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা বাউল এবং যাঁহারা মোসলমান হইয়াও হিন্দুধর্ম্মে গোপনে আস্থাবান্ ছিলেন তাঁহারাই দরবেশীদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাই সেই সময়ে—

"কেয়া হিন্দু, কেয়া মুসলমান, মিলজুলকে করো সবে সাঁইজীকা কাম।"

জীবন-সংগ্রাম বজায় রাখিতে ভাষার পরিবর্ত্তন

এই মতের প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশের একটা বিবাদ হইতে মুক্তি পাইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আমরা এদেশের হস্তলিখিত "দিলকেতাবে" তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকি।

কবিকঙ্কণে হিন্দুমোসলমানে একত্র বসবাসের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং উক্ত চিত্র যে গৌড়ের চিত্র তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

"পুরের পশ্চিমপটী বোলায় হাসনহাটী।" (কবিকঙ্কণ)

এই "হাসনহাটী" হোসনাবাদ বা হোসেনহাট গৌড়ের অন্তর্গত মোসলমানপল্লী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।

হিন্দু-পল্লীমধ্যে মোসলমান-প্রাধান্য

পুরের পশ্চিমপটী, বোলায় হাসনহাটী,
এক সমুদায় গৃহবাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিতপাটী,
পাঁচবেরি কয়য়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীরপগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥

বাঙ্গালী কবির কাব্য বাদশাহী ভাষার ছটা

দশবিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শীরনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিসান।
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে,
ইজার পরয়ে দড় করি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টোপর লইয়া, বসিয়া গাঁয়ের মিয়া,
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত।
সুবলী যেহালি পানী, কুড়ানি বটুনি হনি
পাঠান বসিল নানাজাত॥
বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥" (কবিকঙ্কণ)

কবিকঙ্কণেও এদেশী গ্রাম্য ভাষার যথেষ্ট সন্নিবেশ দেখিতে পাই, অবশ্য "পল্লীভাষা" পরিচয়ে যে কেবল হিন্দুগণের কথিত ভাষাই বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধৃত করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। বহুকাল এদেশে আমরা মোসলমানের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি। তাঁহাদের জন্মভূমি ও আপন দেশ যখন এই বাঙ্গালা, তখন তাঁহাদের ও আমাদের "পল্লীভাষা" আমাদের ভাষার সঙ্গে একত্র সন্নিবেশ না করিলে ভেদজ্ঞান থাকিয়া যায়.; সুতরাং বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানিভাষাই প্রকৃত প্রস্তাবে 'পল্লীভাষা' বলিয়া সাধুসমাজে গৃহীত বিবেচনা করিতে পারি।

পল্লীভাষা বলিলে কেবল হিন্দুপল্লীভাষা না বুঝাইয়া মোসলমানপল্লীভাষাও বুঝাইবে

'কাজি, খয়রাত, বোলায়, ফজর, বিছ্যায়্যা, পাঁচবেরি, মোকাম, সাঁজ, বেরাদরে, কিতাব, দানিসবন্দ, ইজার, তরফ, নিকা, পড়ায়্যা, দোয়া' প্রভৃতি শব্দ মালদহের "পল্লীভাষা" মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে।

কতিপয় মোসলমানী শব্দ পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হয়

"দিল্-কিতাব" সম্বন্ধে এইস্থানে দুচারিটী কথা ও উদাহরণ প্রদত্ত হইল। আমরা তিন চারিখানি "দিল-কিতাব" নামক বাউল-দরবেশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। যত্নের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, প্রায়ই একরূপ এবং বাউল-সম্প্রদায়-সুলভ প্রেহেলিকা-পূর্ণ। রূপ ও সনাতনের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে।

দিলকিতাবী ভাষা

"ইহার কারণ কথা কহ সোনাতন।
সোনাতন বলে সাঞী কিছুই না জান॥" (দিল কিতাব)
"শ্রীরূপের কথা সুনি হেন কর খবরদার।
আরজগির হৈঞা পুছে আরবার॥" (ঐ)

মুরসিদের নিকট শিষ্য না হইলে তাহাদের ভজনমার্গের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিত না তাই—

"মুরসিদ বোলেন বাবা সিস্য হও তুমি।
এসব দিনের খবর বলি দিব আমি॥" (দিল কিতাব)

সাধক হইতে হইলে—

"মমিন মেয়া ভাই, মুরসিদের কদম চাই।" (ঐ)

রূপ সনাতনকে যে সমুদায় প্রহেলিকাবৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার দুচারিটী উদ্ধৃত করিলাম।

দিলকিতাবী প্রহেলিকা ভাষা

"প্রথম গৌড় বাপের মস্তক ওঁপরে।
দ্বিতিয় গৌড় হয় মায়ের উদরে॥
ত্রিতিয় গৌড় হয় সংসার পরিপাটি।
চতুর্থ গৌড় হয় থাকে পিণ্ডামাটি॥" (ঐ)

"মুখ মাকা কলবি হাত হজরত।
প্রাণাদি সঙ্গে মালিক কহে বাত্ত॥
খোদার খোদাই এক আছে তার সাত॥
অজনিসম্ভব সহজ বোসিধেক সাত॥" (ঐ)
"সত্যেতে হালাল বৈসে ক্রোধেতে হারাম।
খেজমতে পির বৈসে মুরসিদের মোকাম॥" (ঐ)
"জমুনার তিরে আছে এক পুরুস বর।
রাজহংস ক্রিড়া করে চরে কুলে তার॥" (ঐ)
"মোহিজিদের বাহিরে চোকীদার ফিরে॥" (ঐ)
"খোদার হুকুমে সেই ফুকারে ঘনে ঘন।
অহংকারে তার বোল না সুনে কোনজন॥" (ঐ)

এই প্রকার বহু কৌতুহলপূর্ণ প্রশ্নোত্তরে "দিল-কিতাব" পূর্ণ রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই গ্রন্থের আরম্ভ-বাক্যে "৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগতি" লিখিত আছে এবং এদেশীয় বহুলোকের গৃহে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক সময় ইহার বড়ই সম্মান ছিল বলিয়া প্রকাশ। সম্ভবতঃ সেই সময় বাউলদরবেশী প্রাধান্যের সময় বলিয়া বোধ হয়।

দিলকিতাব, হিন্দু ও মোসলমানীধর্ম্মের এবং হিন্দু ও মোসলমানী শব্দের মিশ্রণ আদর্শ

"সাঞ্জী, খবরদার, আরজগির, মমিন, মেরা, কদম, কলবি, হজরত, মালিক, বাত্ত, খোদার, খোদাই, হালাল, হারাম, খেজমতে, মুরসিদ, মোকাম, মোহিজিদের, হুকুমে, ফুকারে, বোল" ইত্যাদি শব্দগুলি মোসলমানী হইলেও হিন্দুসমাজে হিন্দু-কবির পুঁথিতে "পল্লীভাষায়" স্থান পাইয়াছে।

মোসলমানগণের ধর্ম্মবিষয়ক কেতাব বঙ্গভাষায় পুঁথির আকারে লিখিত। আমরা প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহব্যপদেশে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে একখানি পুঁথি পাইয়াছি। নিম্নে উহার দুচারিটী বাক্য নমুনা-স্বরূপ প্রদান করিলাম।

"মধুমন্দ কলমা"

হস্তলিখিত অপ্রকাশিত মধুমন্দ কলমার ভাষা ও শব্দ

"গরিব আতেম এখানা করহ ঘিনা।
অনেক পাইব তথা করস বিছানা॥
ইহা বুঝিয়া সাবধান হও সর্ব্বজন।
আরশে এক রোজ হইব সহি সব দিন॥
কিয়ামিতের দিন জেন নাহ এত কঠীন।
আখের হইবে ক্যামত একদিন॥"

* * *

"মাহামদ তোমার নাম ঃঃ তোমি সর্ব্বগুণধাম ঃঃ

মোসলমানীকেতাবে বাঙ্গলা ছন্দের অনুকরণ

তোমি নবি অগতির গতী।
হুর পরীজেনগণ :: পক্ষ্য পক্ষি জত জন ::
কে তোমাকে চীহ্নিবারে পারে॥
ভক্ষণ আনে মুক্ষে :: ধরে সাঞি আপন মুক্ষে ::
সাঞি হেন কুদরত নাহি আর।
সাঞি নাই করিহ রোশ :: খেম মোর গুন্না দোষ ::
হুকু* রাখিহ আমাএ॥"

গদ্যাভিমুখী গদ্যের নমুনা

"দুতিএ কুলি করি মুখ পাখালিবে ::
তিইআ নাশিকাতে পানি দিঞা ধুলাইবেন ::
গলালা করি ধলাইবেন জেন কর নিজ কর্ম্ম ::
দুই করয়ে পানি দিবো তদপরে দুই পাও ধলাইবে ::
ফরজ এই মসপ সাফ করিবেন ::"
"প্রথমে লইঞা আব দন্ত পাখালিবে ::
দুতএ গালালা করি নাশিকা ধুলাইবে :
মুখপাখালিঞা দুই কনে পানি দিবে :
ত্রিথিএ মসফ সাফ করি গছল করিবে :
করিতে গোছল জেন ভিজে সর্ব্ব রূম :
গোছলেতে ফরজ তিন তয়নে কএ :
কহিলাম এহিমতে জেবা জলগোছল করিএ :"
জে জে কর্ম্ম করিঞাছেন সংসারে।
অন্যশে হিসাব দিতে হবে দরবারে॥

* * *

ধন জন মন গর্ব্ব একতাল নএ।
জেই গর্ব্ব ভাল জাহাতে আল্লা রাজি রএ॥
বড় বড় জুদ্ধা এলা বাদশাহার ওজির।
গরাগড়ী জাইবে তারা ভূমৈ দিঞা শির॥"

কতিপয় মুসলমানী শব্দ

খিনা, করসবিছানা, আরশ, কিয়ামতের, আখের, নবি, সাঞি গুন্না, পাখালিঞা, ধুলাইবে, পাও, ফরজ, গছল, করিঞা, হিসাব, দরবারে, ওজির, আছল ইত্যাদি শব্দ হিন্দু ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

"আছল"

"অনেক 'আছল' কিতাব শ্রীষ্টীর মাঝারে।" (মধুমন্দ কলমা)

মোসলমানগণ গৌড়দেশে বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়া বাঙ্গালীর ভাবা

বাঙ্গালীমোসলমানের বাঙ্গালা ভাষা

শিখিয়া যেমন বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাদের ভাষাও বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মোসলমানগণের প্রাণের ভাষা এক্ষণে বঙ্গভাষা। বাঙ্গালাভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তাঁহাদেরও যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। মালদহের পল্লীভাষায় মোসলমানী ভাষা চিনিবার সহজ উপায় কেবল ধর্ম্মভাব ব্যতীত আর কিছুই নাই।

বাঙ্গালী হিন্দু কবির হাতে—

বাঙ্গালী কবির হাতে

"উজির ঠাকুর কান্দে নিত্য পরত্তেক॥" (চন্দ্রঃ কলি)
"তোমার ভাই শ্রীরূপ ছিলা পুর পাত্র।
হামেসা বৈঠক ছিল শয়ন একত্র॥"
"দরবেশ হঞা আমি মক্কা চলি যাব।" (ঐ)

এইপ্রকার রচনায় পারিপাট্য দেখিতে পাই।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে একখানি জীর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(প্রাচীন গদ্যের নমুনা)

প্রাচীন মালদহের গদ্যের নমুনা

"৭০ আঁদ্ধ জঁদ্ধ : সড়বন্ধ ছজগ : নাগারা নিসানা : পাওঁকি খড়ম : ফকিরি আদল : চলায়া ফকিরি : ফকিরমানে : রামরোহিমানকো॥ হারিকা কি টুকরা : অছুনন্দন কি জহরা : ভ্রগুনন্দন কি মোহঁরা : মৃগকি মৃগোছালা :। বাঘকি বাঘখালা : প্রহ্লাদকে ধাগাম্বরা : * সুরৎ সাহেব জি : রামজিক্যার্দ্ধজা: কানাঞিয়া জিকা মরারি :* শ্যামজিক্যা বেণু :। তিন নাম চালায়া : আড়বন্ধমজ্যাঃ † চূলকোপীন ভেক : মেগং কি মোরজাতা : ফুলমালা : পাওকি জিঞ্জিরী : হাতকি কড়া : কানকা বিররোলি : শিরকা বাবুরি : মুক্কা দাড়ি : লোহানিদ্ধা কিস্তি :। কোতোর্ক : ও স্বাতা * শানকি : কড়য়াঁ : তসরিঃ। ত্রিকণ্ঠমাল : বেৃকৎ কি কথঁ্যা : ধন্তীগুরু : সচিনন্দনকে বালা :। উদরকি কারন : মাঙ্গতভিছ্যা : ছোরদেশর ধাক্কাঃ উড়লে কার্থা : চড়লে ব্রন্দাবন মোকামঃ জাহাপ্যোরীজিকাধামঃ ১॥ (ফকীরি)

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম বাউল বা দরবেশী-সম্প্রদায় মধ্যে চেলা বা শিষ্য হইবার সময় মুরসিদের নিকট এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইত। প্রথম "আঁদ্ধ" "জঁদ্ধ" এই দুইটী উহাদের সম্প্রদায়গত বীজমন্ত্র বলিয়া সর্ব্বদা গুপ্ত রাখিবার নিয়ম আছে। উপরি উক্ত মন্ত্রমধ্যে প্রাচীন ফকীরিবেশ ধারণের নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে।

এই মন্ত্রলিখিত ভাষা তৎকালে উক্ত সম্প্রদায়-মধ্যে এতদ্দেশে বদ্ধমূল ছিল।

---

* ধাগা—সূত্র (বেষ্টি, কন্থা) সূতাদিয়া সেলাই করা বস্ত্র (কাঁথা)

† মর্য্যা—ইচ্ছা।

এইপ্রকারে এদেশে যেমন একপ্রকার ধর্ম্মমতাবলম্বীর পুষ্টি ও পল্লীভাষার বিকাশ সাধিত হইল তদ্রূপ "মাদারসাহেবের" ভজনমার্গাবলম্বী অন্য এক সম্প্রদায় গৌড়ে দেখা দিলেন। তাঁহাদের "মাদারসাহেব" বৃহৎ মাদারীধ্বজা ও "ডম্ফ" বাজাইয়া এদেশে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মাদার সাহেব

মাদারসাহেবের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা মালদহী প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(পদ্যছন্দমুখী গদ্য)

প্রাচীন গদ্যছন্দাভি-মুখীন পদ্য

কদক (১) চামপার ফুল : ঝলমোলকরি : গেল ঠাকুরের পাস :
ঠাকুর বোলেন বেটা : নরকনারায়ণঃ আইলা কি কারণ :
চিটিকরিঙ্গ : পোকামকর : তোমার সেবা নষ্ট করে :
তার কি আজ্ঞা হয়ে : জারে জারে বেটা নরক নারায়ণ : ।
তোমার দুই কর্ণে জপিআ : দিলাম ধর্ম্মনাম : ।
এই ব্রহ্মণার জায়া : করহ ওঁথ্যান : আজিকার চারিপ্রহর রাই :
কালিকার দুইপ্রহর দিনঃ থাকিল বন্ধ পড়িয়া :
ঘরবন্ধ চাতরবন্ধ : চৈতন্তর স্থলবন্ধ : মোরবন্ধ নড়েচরে :
দোহাই পির সাহা মাদার ১॥ ১ঃ ॥
বজ্যর বন্ধ ২ সাহামাদার কি : জোড় বজ্যর বন্ধ :
আকাশের কামিনি বন্ধ : পালের বাসকি বন্ধ : ঘরবন্ধ :
চাতরবন্ধ : চৈতন্তের স্থলবন্ধ : ।
চিটি করিঙ্গবন্ধ : থাকিল বন্ধ পরিয়া : মোরবন্ধ নরে চরে :
সাহামাদারের বন্ধ দুই চরণঃ ১ ॥" (সাহামাদার)

এইটী এদেশীয় প্রাচীন ভাষায় ও ছন্দে লিখিত মন্ত্রবিশেষ। শেষে "পীরসাহামাদারের" দোহাই আছে, কিন্তু মন্ত্রটীর প্রথমাংশ বৌদ্ধভাব-জ্ঞাপক। এই মন্ত্রটীর রহস্য ভেদ করিতে হইলে আমাদিগকে একটী গুপ্ত ঐতিহাসিক কাহিনীর সামান্ত আলোচনা করিতে হইবে। এদেশী বৌদ্ধপীর মাদারের * কাহিনী অতি সুন্দর। মাধাইপুর† নামে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিপ্রধান সমৃদ্ধিশালী উপনগর ছিল, তথায় লোকনাথ বুদ্ধমূর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান আছেন। এই বুদ্ধপূজক এক ঘর ধর্ম্মভাট (ব্রহ্মভাট বর্ত্তমানকালে) বা ধর্ম্মভট্ট উক্ত বুদ্ধদেবের পূজক আছেন। উক্ত ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে। এই ধর্ম্মরাজ-মন্দিরের অনতিদক্ষিণে এক পীরের আস্তানা

ধর্ম্মভট্ট ও পীর

---

(১) কনক।
* মালদহ পল্লীকথায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।
† সংক্ষিপ্ত বিবরণ "বাণী"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আজিও বর্ত্তমান। তাঁহার সমাধি-বেদিকার উপর হিন্দু-মোসলমান নরনারী আজিও দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে।

এই পীর সাহেবের বিবরণ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ইনি পূর্ব্বে ধর্ম্ম ভট্ট-বংশীয় বৌদ্ধযোগী ছিলেন। যোগশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতা ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। এই ধর্ম্মদীক্ষায় পাণ্ডুয়ার বাদশাহ অগ্রণী ছিলেন। শেষে বাদশাহের আদেশে ধর্ম্মরাজের সম্পত্তি দুই অংশে বিভাগ করিয়া এক অংশ ধর্ম্মরাজকে এবং অপরাংশ এই নবদীক্ষিত পীরকে প্রদত্ত হয়। অদ্যাপি ধর্ম্মরাজ ও পীরের সম্পত্তি বর্ত্তমান আছে। একটী পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক পীরের ও অর্দ্ধেক ধর্ম্মের—এই নিয়মে বিভাগ দৃষ্ট হয়। পীর সাহেব জীবহিংসায় বিরত থাকিয়া আস্তানায় সুবৃহৎ ধ্বজা বাঁধিয়া উদার ধর্ম্মমত, হিন্দু-মুসলমানে অভেদ জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দিতেন। অনেকে আবার তাঁহাকে মাদারপীরের চেলা বলিয়া থাকে, কেহ কেহ স্বয়ং মাদারপীর বলে। এই পীর অতিশয় বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং বুজরুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামের দোহাই দিলে বনের বাঘ, মহিষ ও সর্প হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে। একারণে অনেক এদেশী মন্ত্রতন্ত্রে তাঁহার দোহাই দেখিতে পাই। এই কারণে পীর সাহেবের চেলা বলিয়াছেন যে—

মাথাইপুরের পীর, বৌদ্ধভাব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত ভাষা

"চিটি করিঙ্গ পোকামাকর তোমার সেবা নষ্ট করে তার কি আজ্ঞা হয়।"

যাহাই হউক, এই প্রকারে এদেশে ধর্ম্মমতের বিধিশ্রমে নব নব ধর্ম্মমত বিকাশ পাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে "পল্লীভাষা"ও নব নব রূপ ধারণ করিতেছিল। এই মন্ত্রটী মালদহের প্রাচীন পল্লীভাষার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এদেশীয় একটি মন্ত্র-বিশেষের অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

"উকারে উকীরে পোকা রে পুঁকিরে মাকইরে দূরে পলায়।"

ইহাও অতি পুরাতন পল্লীভাষার আদর্শ। আমরা "মাদারের" মন্ত্রটী একটু মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা হইলে কথিত পল্লীভাষায় হিন্দু-মোসলমানী মিশ্রণের আদর্শ সুন্দরভাবে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

হিন্দুভাষা মোসলমানী কথিত ভাষার সহিত ক্রমশঃই যত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিল, ততই পল্লীভাষার মধ্যে আত্মবিস্তার করিয়া প্রাণের ভাষা হইয়া পড়িল। প্রাণের আদরের ভাষা গীতে আপনি উৎসের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। মালদহের একটী প্রাচীন গীত নিয়ে লিখিত হইল—

মালদহী প্রাচীন গীত

"রূপনগরে রসের মানুস আইসাছে
আরগ তোরা দেখিবিকে।
রূপে গুনে ডগমগী দেখিলে নয়ান জুড়াবে।
ওহার ভিক্ষাভাবে ভমুখিন রাধা বৈল্যা ড্যাকতেছে।
আনন্দ মদন জার নয়ানে ওদয় দিয়াছে।"

সে দেখিতে প্যারী মোনের মাহুস হিদয়ে জার বিরাজে।
জে দেখাছ, দেখা জাগ কুলে কি তার ভর আছে।
কত কুটমতি পাইয়া রতি স্বরূপে রূপ মিশাই আছে।
গোসাই কিজর চান্দে বোলে দেখিলে নয়ান ভুলিবে
লাল জরদ, সিহা, সফেদ চাইব রঙ্গেতে মাত্যাছে।"

লাল, জরদ, সিহা, সফেদ প্রভৃতি পদের ব্যবহার বৈদেশিক ভাষার প্রাধান্তবশতঃ হইয়াছে।

"ঙ" অন্ত শব্দ

"ঙ" অন্ত পদের ব্যবহার

আছিলাঙ, দেখিলাঙ, কহিলাঙ, সাধিলাঙ, মাখিলাঙ প্রভৃতি শব্দের অন্তস্থ "ঙ" ক্রমশ "ম" হইয়াছে। যথা।—আছিলাম, দেখিলাম ইত্যাদি। "ঙ' অন্ত শব্দ এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু মাঁঙ, পাঁঙ, গাঁঙ, শব্দগুলির অন্তস্থ "ঙ" লোপ হইয়া তৎস্থানে "ম' হয় না। বিশেষ্য পদ, ক্রিয়াপদের স্থায় নহে। কিন্তু "ঙ' স্থানে "ও" হইয়া থাকে যথা, মাঁও পাঁও ইত্যাদি। শব্দ মধ্যস্থ "ঙ" অক্ষরটী প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয় না। যথা।—"কোঙর" (কুমার) "নঙর" (নগর)

"এই মত ছিল জত সভার কোঙর।" (নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত)

"কোঙর"."নঙর" শব্দের "ঙ" যদিও "মা' "গ" তে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহা গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার্য্য নহে।

"নাগরা নিসান পাওঁকি খড়ম ফকিরি আদল" এস্থলে "পাওঁকি" র "ওঁ"টী "ঙ" রূপান্তর মাত্র।

"সত্যবন্দি 'হইলাঙ' তবে শুনহ বচন।"

(হস্তলিখিত মহাঃ, বনপর্ব্ব, শ্রীকরনন্দী)

"ভাঁঙুর" উপরে কক্ষা দিলেন নিষ্ঠুর।" (ঐ)

'হইলাঙ' 'ভাঙুর' প্রভৃতি পদের বিষয় বিবেচ্য।

কোন কোন শব্দের বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে অর্থভেদ।

একই শব্দ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হইলে পল্লীভাষায় অর্থের সম্পূর্ণ পার্থক্য হইয়া যায়। যথা—

কতিপয় পদের বিশেষ্য ও ক্রিয়াভেদে অর্থভেদ

'গাই' 'পাই' 'নাই' 'ছাই'

বিশেষ্যপদে 'গাই' অর্থে গাভী।

ক্রিয়াপদে 'গাই' অর্থে গান করি।

বিশেষ্য	অর্থ	ক্রিয়াপদ	অর্থ
পাই	পয়সা	পাই	পাইয়া থাকি, প্রাপ্ত হই।

বিশেষ্য	অর্থ	ক্রিয়াপদ	অর্থ
নাই	নাভী	নাই	স্নান করি, বা নেই।
ছাই	ভস্ম	ছাই	ছাওয়া (ঘর ছাই—আচ্ছাদন করা)

হাঠ্যা, হারুণ, হায়্যায় হাডাখ্ প্রভৃতি শব্দের প্রচলন আছে।

হাঠ্যাকথা = বেফাঁশকথা, বেতালাকথা। হাঠ্যালোক।

হারুণ = দুষ্ট, যথা "ছাইলাটা বড়ই হারুণ'।

হায়ায় = এখানে এস। হাদ্যাখ্ = এদিকে দেখ।

মালদহে যে সমুদায় 'ব্রত' বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে, তাহার কথা বা ব্রতকথাগুলি রমণীগণই বলিয়া থাকে। উহার ভাষায় প্রাচীন ভাষায় আদর্শ দৃষ্ট হয়। আমরা ঐ প্রকারের ব্রতকথা ও গীতাদির উল্লেখ করিয়া প্রাচীন ভাষার পরিচয় প্রদান করিলাম।

বালিকাগণের সাঁঝাব্রত কথা

পল্লীবালিকাগণের ব্রতগীত

"সাঞ্জা পূজ সাঞ্জতী, বুঢ়ার ঘরে ঘিয়ের বাত্তি।
ক্যান্ বুঢ়া এত রাত্তি, কাঞ্জির পিছে খোঁচার বন,
নল ভ্যাঙ্গা জলথা, খাগ্‌গর ভ্যাঙ্গা শাঁসখা,
অগ্‌গর রে, চন্দনরে, ভুরকুট যা।
কিয়ে সা দোলো দোলো, কিয়ে চাম্পারি ফুল।
সাতফুল নিঞা সাঞ্জা আনন্দকর।"

অন্তত্র এই ব্রতের নাম "সাঁজপূজানী" এদেশে 'সাঞ্জাপূজা' সাঁজ বা সন্ধ্যাকালে পূজা করিতে হয় বলিয়া এই বালিকা-ব্রতের নাম "সাঞ্জাপূজা"।

রমণীকুলকথিত ভাষার কয়েকটা শব্দ

সাঞ্জা, সাঞ্জতী, কাঞ্জির, অগ্‌গর, ভুরকুট প্রভৃতি শব্দ সুপ্রাচীন। এদেশে আজিও "সাঁজ" শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে।

যথা—সাঁজের ব্যালা, সাঁজের বাতী।

সাঞ্জতী = সাঞ্জাপূজা-পরায়ণা বালিকা।

অগ্‌গর = অগুরু

ভুরকুট শব্দ এখানে বিশেষণের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাইতেছি যথা "ভুরকুট আঁধার" ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ভুরকুট আঁধার বলিয়া থাকে।

'ভুরকুট আঁধার" বৎ কতিপয় শব্দ এদেশে প্রচলিত আছে। যথা—'অবল ট্যাঙ্গা",

বিশেষণের বিশেষণ শব্দ

'অবল খাট্যাম্', 'অবল চুক্', 'ধলো ফ্যাকাশ্' 'কালো চিঁহাট', 'মিট্টি পানিস্যা', ইত্যাদি শব্দ সমুদায় নিয়ত ব্যবহার্য্য—পল্লীভাষা।

পল্লী—বাঙ্গালা সংগীত

"থালি থালি কুমড়া জালি সমুখে থুয়্যা।
আমার সাঞ্জা ভাত খাবে কি কি বেস্তি দিয়া।
য়াঢ়ীর লকুচ্ শাকুব বায়্যা।" ইত্যাদি। (সাঞ্জাব্রত)

বেস্‌তি—তরকারি।

বেসাতি ও বেসাতিনী অর্থ-স্বতন্ত্র, যাহারা ডোর (ঘুনসী) মিসি, কৌটা ইত্যাদি বিক্রয়েত্রীর নাম "বেসাতিনী" উহাদের বিক্রেয় দ্রব্যের নাম "বেসাতি"।

এই প্রকার শব্দের বিভিন্ন অর্থ

এদেশে এই প্রকার সামান্য উচ্চারণ ভেদে অর্থের বহু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—বিররি, বিহ্নী, বাহ্নী, বির্না।

বিররি—এক প্রকার চাউল ভাজিলে খৈ মত হয়, সেই খৈ।

বির্হন—বোল্‌তা (waep)

বার্হন—ঝাঁটা

বির্না—বেনা-ঘাস, খস্‌খস্‌।

"চাঁদ স্বরুজ পুজ, সোনার থালে ভুজ।
সোনার থালে খিরসার লাড়ু।
শংখের ওপর সোবন্তের খাড়ু।"

কৌতুকাবহ শব্দার্থ

ভুজ শব্দ ভুঞ্জ হইতে উৎপন্ন। এখানে ভুজ অর্থে খাও।
ভুজ অর্থে ভাজ। ভুজা অর্থে চাউল ভাজা বুঝায়।

ভুজ অর্থে হস্ত। কিন্তু দশভুজা বলিলে দুর্গাও বুঝাইবে এবং দশ রকমের চাউল ইত্যাদি ভাজাও বুঝাইতে পারে। কিন্তু তখন "দশ্‌ভুঁজা" উচ্চারিত হইবে।

কতিপয় পল্লীভাষা কথিত শব্দ

"আধেক ঘাঁটা যাতে সাঞ্জা সিঁস দেখ্যাল্য।
তাই দেখএ রাজার বেটা সিঁদুর বসাল্য।
আধেক ঘাঁটা যেতে সাঞ্জা নাক দেখাল্য।
তাই দেখ এ রাজার বেটা ব্যাসর বসাল্য।

* * *

সেই সিঁদুরের মধ্যে আছে, বিনদ ভ্রমর ই ভ্রমরা,
মাও লালে কে—।" (সাঞ্জা)

(বালিকাগণের ব্রতকালে, গীত শ্রবণ করিয়া লিখিত।)

"এ" ব্যবহার।

ক্রিয়াপদান্তে 'দেখিয়া' বা 'দেখিয়ে' পদগুলি 'দেখএ,' 'দেখিএ' এই প্রকার পদগুলির ক্রমশঃ 'দেখিআ' মত কথিত হইত।

'এ' অন্ত পদের ব্যবহার

"ভারতের পুণ্যকথা অমৃতলহরী।
ইহোলোক "সুখহএ" পরলোক তরি॥"

(কবীন্দ্র, আদিপর্ব্ব, নিত্যানন্দ ঘোষ)

এস্থলে "সুখ হয়" প্রয়োগের পূর্ব্বে "সুখহএ" প্রচলিত ছিল।

"মাএ' পোএ' বনবাস দেহ দুই জনে॥"

(হস্তলিখিত সূর্য্যব্রত-কথা)

"ক্ষিদাএ, তৃষ্ণাএ সাস্ত হৈল দুই জন॥" (ঐ)

মাএ, পোএ, ক্ষিদাএ, তৃষ্ণাএ প্রভৃতি পদগুলির যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"জপিআ"

"আ" অন্তপদের প্রয়োগ

"তোমার দুই কন্তে জপিআ : দিলাম ধর্ম্ম নাম :।" (মাদার)

এই "আ" "এ" হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

করণ-কারকের সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার এই প্রকার পল্লীভাষায় সূচিত হইয়া থাকে।

'মাকে', 'পোকে'র স্থলে 'পোএ' হইয়াছে।

"সাঞি নাই করিহ রোশ : : খেম মোর গুন্না দোষ : :

হকু* (মে) রাখিহ "আমাএ॥"

(হস্তলিখিত মধুমন্দ কলমা)

"ছুতিএ' কুলি করি মুখ পাখালিবে : :"

"তিইআ' নাশিকাতে পানি দিঞা ধুলাইবেন : :"

"তিথিএ মসফ শাফ করি গছল করিবে : :

"গোছলেতে ফরজ তিন তয়নে কএ :"

"কহিলাম এহি মতে জেবা জল গোছল করিএ :"

"ধন জন মন গর্ব্ব একতা লনএ।

জেই গর্ব্ব ভাল জাহাতে আল্লারাজি রএ॥" (ঐ)

'ছুতিএ', 'তিইআ', তিথিএ, কএ, করিএ, লনএ, রএ" প্রভৃতি পদ পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হইত।

লাথাল পদের বিবিধ অর্থ

"আলতায় ডুবু ডুবু দুখানি পাও,

যে ঠে ম্যালানীর লাথাল্ পাই

লাক পহ্যা ব্যাসর দেই।

ম্যালানিটে—মালঞ্চালা দে।" (সাজা)

"লাথাল্" * লাগ (লাগাল্) আজিও এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। উপরি উক্ত কবিতাটী বর্ত্তমান কথিত পল্লীভাষায় আদর্শরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

---

* লা—থাল্, লা শব্দের পর একটু অবকাশ দিয়া 'থাল্' শব্দটী উচ্চারিত হইলে, অর্থের বিস্তর পার্থক্য হইয়া পড়ে। তাহাহইলে লা—নৌকা; থাল—(থাইল) নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ। অর্থাৎ নৌকাখানি ডুবিয়া গিয়াছে বুঝাইবে,—লা থাল হইয়া গিয়াছে।

মালদহে পল্লীগ্রামে হিন্দুসমাজে বিবাহ উৎসবে স্ত্রীগণ যে গীত গাইয়া থাকেন তাহা মালদহের পল্লীভাষার পরিমার্জ্জিত আদর্শ বলিতে হইবে। নিম্নে বিবাহের গীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

যুবতীগণের পল্লী-সংগীত

"শিতল দ্যাও রে। (ধ্রু)
উত্তর দিক্ কার ম্যাম, ঝ্যামরে—
পশ্চিম দিক্ কার হর, শিতল দ্যাও রে।
ভিজুক্ ভিজুক্, ভিজ্যা গ্যেলয়ে রাইহোর দণ্ডের সিঁদুর,
ভিজ্যা গ্যেলরে।
কালি বিহান হত্তেরে, হাম্‌রা হাতির পিঠে
শুকাব কাঁচলী রে।
কালি বিহান হত্তেরে, হামরা হাতির পিঠে
শুকাম সিঁদুর রে।
(জল সাজা গান)"

কতিপয় রমণীকুল ব্যবহার্য্য শব্দ

"রাইহোর" "দণ্ডের" "বিহান" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। রাইহোর—এয়ো, আয়ত। দণ্ডের—সীমন্তের। বিহান—প্রাতঃকাল। রাইহো, রাহেলী একই অর্থবোধক। "রাহেলীগণ জজ্‌কা দিচ্ছে।" এস্থলে জজ্‌কা অর্থে উলু বা হুলুধ্বনি বুঝায়।

"দণ্ড" অর্থে সীমন্ত, সীঁথি বুঝাইলেও নাসাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় ললাট দেশ হইতে সীমন্তোর্দ্ধ পর্য্যন্ত রাহেলীগণ সিঁদুর লিপ্ত করিয়া থাকেন বলিয়া উক্ত সমুদয় দেহাংশের নাম "দণ্ড"।

বিহান—প্রাতঃকাল বুঝাইলেও অধিকাংশ স্থলে "বিহান ভোর" পদ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

অপর গীত যথা—

"বর সাজিল রে (ধ্রু)
আঙলাক (আঙিনা) শোভা করে তুলসী বিন্দাবন
ছ্যাইলা বর বিতাতে সাজ্যাছে চন্দবরণ॥
উজানী নগর হ'তে বর চাম্পাই নগর যারে।
যত যে কায়েতের যাইয়্যা চন্দন ছিটারে॥
উজানী নগর হ'তে বর ভাটানী নগর যারে।
যতেক বাভুনের যাইয়্যা আশীর্ব্বাদ ছিটারে॥
ফকীর কাঙাল লয়রে লখ্‌বের সদাগর।
কড়ির বদলে দিব লাগে আই-কল॥ (বরসাজা গীত)

আঙনাতে, হ্যাইলা, বিভাতে, সাজ্যাছে, মাইয়্যা, ভাটানী, বাভুনের, কাঙাল ইত্যাদি পদের প্রয়োগ নিত্যনৈমিত্তিক।

অতি প্রাচীন সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য পল্লীভাষার শব্দ

আঙনাতে—আঙ্গিনাতে, অঙ্গনে, উঠানে।
হ্যাইলা—ছেলে।
বিভাতে—বিবাহে।
সাজ্যাছে—সাজিয়াছে, সজ্জিত হইয়াছে।
ভাটানী—ভাটী।
বাভুনের—বামুনের, ব্রাহ্মণের।
কাঙাল—কাঙ্গাল, দরিদ্র।

কোন কোন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-গীতগুলি বড়ই অপরিমার্জ্জিত ভাবে গীত হইয়া থাকে।

বরের রূপবর্ণনা সম্বন্ধের গীত অতীব আদিমভাবাপন্ন। যথা—

অতিশয় গ্রাম্যদোষে-দুষ্ট ভাষার আদর্শ

"বরেরি মাইথাটা, ধানসিদ্ধা তৈলাটা।
বরেরি পিঠটা, খার-কাচা পিঢ্যাখান।
বরেরি হাত দুখান্ ডাইল ঘোঁটা খড়ি দুখান.
এ বর ভাল নয় টে—, বরকে দেইখ্যা ধন্দ লাগিছে॥"
পদীম জ্যাইলা ভাখ্‌টে কন্যার মা (এ বর ভাল নয় টে,—ঞ্র)
(বর-রূপ-বর্ণন)

তৈলাটা—বড় হাঁড়ী।
খার-কাচা পিঢ্যা—খারসিদ্ধ বস্ত্রধৌত পিঠ।
খড়ি—কাটি। ধন্দ—ধাঁধা।

"নয়ারে লাউয়ারে, ভাল করে কামাইও হামার বাছারে॥" ইত্যাদি।
(বর-কামান গীত)

এস্থলে "নয়ারে লাউয়ারে" পদটীর 'নয়ারে' পদ 'লাউয়ার' বিশেষণ নহে, ইহা অনুরূপ অব্যয় শব্দ। যথা—কাউয়া কাঁকই, চি(হ)ল চিহ্‌লোই, উকারে উকিরে, পোঁকারে পোঁকিরে, চাউয়া চাক্‌না, ইত্যাদি।

গ্রাম্য অনুরূপ অব্যয়

নয়া—নূতনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—নয়া চাউল, নয়া কোতা, নয়া মানুষ ইত্যাদি।

সাত পাকের গীত

পল্লীভাষার আদিম সঙ্গীতাদর্শ

কন্যা ঘিরে বইসরে। (ঞ্র)
বরের মটুক হ'ল সোবর্ণের পদ্মফুল।
মধুরা আশে ভ্রমরা হ'য়্যে বিয়াকুল॥ (কন্যা—)

ধরিয়্যা তু(ই)ল্যা, ধরিয়া তু(ই)ল্যা গৌরীর সিংহাসন।
দুই মুখেতার চোখ্যে হ'বে দরশন॥ (কন্তা—)
ঘৃতবার পঞ্চ প্রদীপ সমুখে জ্বালাইয়্যা।
মুষ্টি মুষ্টি ফ্যালে ফুল বরের বদন চায়্যা॥ (কন্তা—)
একো পাকো হোলো, আরে—দুইরো পাকো হোলো,
তিনো পাকের ব্যালায় গৌরী সম্মুখে দাঁড়াল। (কন্তা—)
তুমি কি জানহে ক(ই)ন্তা বিভার বেভার,
সাতো পাকের ব্যালা ক(ই)ন্তা কল্লে নমস্কার। (কন্তা—)"

এই প্রকার রমণীর রমণী মুখোচ্চারিত ভাষায় গীত বিরল নহে। হয় ত কোন কোন সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রকার ভাষার কথা তুলিয়া বলিবেন এ প্রকার নারীভাষা মৃতভাষা। বাস্তবিক মৃত, কিন্তু বিবাহবাসরে সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি।

রমণীকুলপ্রিয় পল্লীভাষার কথা যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল এক্ষণে পুরুষপুঙ্গবের পল্লীভাষায় রচিত দুইটী গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পুরুষগণের পল্লীভাষার প্রাচীন আদর্শ

"শালার শিং কি চোখ্যা[১], ঠিক্ করে দেখ্ রে ওটা, হুঁকরে কিরে হোঁকা[২]। (ধ্রু)
তার পিঠে কেটারে, জগৎ শেঠ কি? ছুয়ার[৩] মাটকি[৪] কত্যে প্যাট্কি ফোঁকা[৫]!
দুদিক্ আচ্কা[৬] ছুটা, বোচ্কা কাঁধে, ফুলিয়ে গাল্টা,
ঝুলিয়ে কোমর মার্চে ধাক্কা*।
এদিকে বস্তা কেটারে সেটি, আস্ত য্যান গীর্য্যার[৭] বেটী,
বুড়া ভালত মজা লুটে, আবার ববম্ করে উঠে।
বুড়াটা দামরু[৮] পিঠে, ঠুংরু গাইছে, ডম্রুর তালে মারছে ছক্কা[৯]॥
বুড়াকে চিনেছি বান্দা, বিসম ধান্দা, খুব নাখান্দা কামে পাক্কা।
পরে রাজবংশী পট্টি+, টাট্টির[১০] আড়ে, চট্টির[১১] তলে আছিল লুক্কা[১২]॥
বুড়ার জ্যাতের দফা গিয়েছে খাটি, খেয়েছিল ফুদ্নী কুচ্নীর রুটী।
বুড়া হাঁছু নাইখো ফলে, মোরঘেরে কোয়াণে আদম বলে;

১ চোখা, ছুঁচাল। ২ হোকারবকারী বৃষ। ৩ কোতরা গুড় (তামাকমাখা গুড়)।
৪ জ্বালা, বৃহৎ কলসবিশেষ। ৫ ফাঁপা, শূন্যগর্ভ। ৬ আশ্চর্য্য বা নূতন ধরণের।

* "ঝুলিয়ে কোমর মারচে ধাকা"—(দুদিক্ হইতে ধাকা) দুই দিকে নন্দীভৃঙ্গী পৃষ্ঠে পুটুলী লইয়া, একজন গাল ফুলাইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ সিঙ্গা বাজাইতেছে) একজন ("ঝুলিয়ে ইত্যাদি") গাঁজা টিপিতেছে এবং প্রত্যেক টিপে কোমর ঝুঁকাইতেছে।

৭ গিরিরাজকন্তা। ৮ দামরু পিঠে—দামড়ার পৃষ্ঠে (অনুপ্রাসের জন্ত দামরু লিখিত হইয়াছে, দামরু বৃষার্থে এস্থলে প্রয়োগ হইয়াছে।) ৯ সোম, বাদ্যের তালবিশেষ। + রাজবংশীপাট্টি—কৌপীনবৎ বস্ত্র।
১০ বেড়া। ১১ বসিবার জন্ত চট। ১২ লুকান, গুপ্ত।

অাঁইড়ার[১৩] হাওদার বস্তা, ওয়াদা বুঝে, কায়দা করে পাগার মাকা ॥
বুড্যার গুজাছি লহর, বিসম বিহর, খেয়্যাছে জহর, দু তিন কাকা ॥
কি যাদু খাটালো, বিষের মিচুল জালা, ফুটুলো গলায় কাল-চাকা ‡ ॥
বুড়া খাচ্চে গাঁজা, ভাংগের ফঁাকি, আদতে কেবল মদতে[১৪] বাকি।
নিশায় বেদিশা, ভ্যাণ্ড্টা কাচা, বুড্যা অচ্ছা গুণী চাচাহে।
বুড্যার কপালের চাঁদটা, আস্ত আইকা[১৫], চোক্‌টা ঈশ্‌কাপনের টেকা ॥"

(§গম্ভীরার গান)

চোখ্যা, হুঁকরে, হোঁকা, ছুয়ারমাটকি, কেঁাকা, আচ্‌কা, গীয়্যার বেটী, দামুক, বান্দা, ধান্দা, নাধান্দা, পট্টি, টাট্টির, চট্টির, সুকা, লহর, বিহর, জহর, চাকা, মদতে, নিশায়, বেদিশা, ভ্যাণ্ডটা, আইকা ইত্যাদি এদেশ প্রচলিত নিয়ত ব্যবহৃত শব্দ।

কতিপয় পল্লীভাষার নিত্যব্যবহৃত শব্দ

নিম্নে অন্য একটী গম্ভীরার গীত লিপিবদ্ধ করিলাম। এই গীতটীতে প্রভূত পরিমাণে পল্লীভাষার ছটা ও ঘটা দেখিতে পাইবেন। এদেশে গুলিখোরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। গুলিকে এদেশে "মদৎ" বলিয়া থাকে, নিম্নের গীতটীতে মদৎ প্রস্তুতের উপকরণ ও মদৎ সেবার বিষময় ফলের উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা সমাজ-সংস্কার পক্ষে উত্তম হইয়াছে। ৺ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয় গম্ভীরা গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার তুলিকায় রচিত "মদতের গান"টাই নিম্নে লিখিত হইল।

(২য় গীত)

"আমি প্রনাম করি মদৎ প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
তোমাকে ভজে মুকুটি বাঁদর পুঁকৃটী[১] হল সরু ॥
প্রভুর সিংহাসনটি আন্‌থাহাঁড়ী-কাঁন্‌থা-ভাজা গলা[২]।

নিত্যব্যবহৃত-শব্দবিশিষ্ট গীত

---

১৩ এঁড়ে, বৃষ। ১৪ গুলি। ১৫ আস্‌কে, পিষ্টকবিশেষ।

‡ ফুটলো গলায় কাল চাকা—বিষপানহেতু শিব-নীলকণ্ঠ হইলেন।

§ গম্ভীরার গানটীর প্রথমেই "তালকের" স্থূল সংস্করণ বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া হয়ত পাঠকমহোদয়গণ 'রুচিবিকার" মনে করিবেন কিন্তু ইহা মনে রাখিবেন 'পল্লীভাষা' অতিমার্জিত নহে। যাহাই হউক গানটীর মধ্যে মালদহ পল্লীভাষার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

১। পুঁকৃটী—(দেশীভাষায় 'ল্যেচা') নিতম্ব, পাছা।
"পুঁকৃটী হল সরু"—(গুলিখোরদের) নিতম্বদেশ শুষ্ক হইয়া যায়।"

২। আন্‌থা-হাঁড়ী-কাঁন্‌থা-ভাজা-গলা।
আন্‌থা—আশ্চর্য্য, অদ্ভুত।
কাঁন্‌থা-ভাজা-গলা—গলায় কানা ভাঙ্গা।
অর্থাৎ আশ্চর্য্য গোছের হাঁড়িটির গলার কানা ভাঙ্গা।

তাতেই হরণা৩ হুকা কেমন শোভা যেমন ব্রজের বলায়ে।
ভোগ দিতে আয়োজন ভারি ভোগের হাঁড়ী বোকা-কাতারি৪।
তুলনা তাতে জানি য্যামন মুড়কি-মারা ঘানি৫।
ঘানি নাড়তে পিয়ারা-পাতার-ঝাঁমু৬ বাতা-ছিলা-কাড়্॥৭
প্রভুর রঙ্গভারি অঙ্গসেবায়, শিক লাগে ঠিক লম্বা।৮
গলিয়ে মাল, চুলিয়ে৯ নিতে, জিভ্যা ১০ য্যামন, এল মা জগদম্বা১১।
বার্ষিকী-পাঁচ-পয়সা-চুকান১২ প্রভুর শ্রীপাট সেখজীর দোকান।১৩

৩। হরণা হুকা—যে হুঁকার খোলটী কাল না হইয়া শাদা গোছের। এই প্রকারের হুঁকার মূল্য কম বলিয়া গুলিখোরেরা পছন্দ করে এবং গুলিখোরেরা প্রায়ই স্নান করে না বলিয়া হুঁকায় তেল দেয় না। সুতরাং বলরামের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বর্ণ বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে।

৪। বোকা কাতারি—যে হাঁড়ি বাজাইলে বাজে না তাহাকে বোকা বলে। এস্থলে ফাটা ক্ষুদ্র হাঁড়ী যাহা অন্য কার্য্যে অব্যবহার্য্য।

৫। মুড়কী-মারা-ঘানি—মুড়কী প্রস্তুত করিবার সময় মোদকগণ খোলার সাহায্যে মুড়কী প্রস্তুত করে। এদেশে এক এক খোলা মুড়কী প্রস্তুত করার নাম "একঘানি মুড়কীমারা" হইল বা "একখানি মুড়কী" বলিয়া থাকে।

৬। ঝাঁমু—গুলিপ্রস্তুতকালে পিয়ারাপাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অগ্নিতে উপরি উক্ত "আনখাহাঁড়ী-কানখা-ভাঙ্গা গলা" বিশিষ্ট হাঁড়িতে করিয়া ভাজিতে হয় এবং সেই ভর্জ্জিত পিয়ারাপাতা দেখিতে "চা"র মত হইলে তাহার নাম "ঝাঁমু" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে পান হইতে ঝাঁমু করিত এক্ষণে পিয়ারা-পাতা হইতে ঝাঁমু করিয়া থাকে।

৭। বাতা ছিলা-কাড়্—মুড়কীপ্রস্তুতকালে "কাঠময় হাতার" প্রয়োজন হয়, কিন্তু গুলিপ্রস্তুতকালে বংশ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দণ্ড আবশ্যক হয়, উহার নাম "কাড়্"। বাতা ছিলা অর্থাৎ বাঁশের বাকারি চাঁচিয়া কাড়্ প্রস্তুত হয়।

৮। শিক লাগে ঠিক লম্বা—গুলিপ্রস্তুতকালে উত্তপ্ত গুলি নাড়িবার জন্য লম্বা শিকের আবশ্যক হয়।

৯। চুলিয়ে—চোলাই করিতে (distillation)

১০। জিভ্যা—আফিং জলমিশ্রিত করিয়া অগ্নিতাপে "বোকা কাতারি"তে ফুটাইতে হয় এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড জিহ্বার ন্যায় করিয়া কাতারির গাত্রে গলিত আফিংএর সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয় এবং কৌশিক আকর্ষণে বিশুদ্ধ অহিফেন চোলাই হইয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রক্ষিত হয়। ঐ বস্ত্রখণ্ডের নাম "জিভ্যা"।

১১। জগদম্বা—কালিকা; অর্থাৎ কাতারির উপর "জিভ্যা" বর্ত্তমান থাকিলে, দেখিতে লোলজিহ্বা কালিকার ন্যায় দেখায়।

১২। বার্ষিকী পাঁচপয়সা চুকান—অর্থাৎ সেই সময়ে পাঁচ পয়সার একসিকি ওজনের আফিং পাইত। গীতরচক একজন গুলিখোর (মদন্তি) ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এক এক বারে একসিকি অহিফেনের 'মদত' সেবন করিতেন।

১৩। "প্রভুর শ্রীপাঠ সেখজীর দোকান"—গীতরচক বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন সেই কারণে "প্রভু" অহিফেনকে বলিয়াছেন এবং অহিফেনের স্থান "শ্রীপাঠ" নামে উক্ত হইয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোসলমানগণই অহিফেনের দোকান করিয়া থাকে, সেই কারণে আফিংএর অবস্থান সেখজির দোকান বলা হইয়াছে।

শিষ্য জুটে ম্যালা, প্রভুর ভেট লাগে ছুই ব্যালা[১৪],
তাতে কল্‌কী, আজব-কল্‌কী-ভাঙ্গা মেরু ॥[১৫]
প্রভুর রূপটি ভাল, দেখতে আলো, যেমন ব্রজের কালকানু ।[১৬]
ভজিলে জয়-ডঙ্কা বাজে[১৭], শঙ্কা যায়, হয় লঙ্কাপোড়া হনু ॥[১৮]
নলে মুখে যখন চুষি, কখন হাঁসি, কখন কাশি, যথ ধোঁয়া থাসি[১৯]
ভাবি কাজ্‌ কি গয়া কাশী,দীন দয়াময় গুলিঠাকুর সাতপুরুষের[২০] গুরু ॥"

যাহাই হউক গীতোক্ত শব্দগুলির ব্যবহার এতদ্দেশে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। আমরা অন্ত প্রকার মালদহের পল্লীভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এদেশে নাগর, ধানুক ও চাঁই নামক জাতি যথেষ্ট বাস করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষার পার্থক্য আছে। নিম্নে উক্ত ভাষার আলোচনা করিলাম।

নাগর, ধানুক ও চাঁইগণের ভাষা

নাগর, ধানুকেরা বিহার ও মিথিলাদি জনপদবাসী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বর্ত্তমান কালে তাহাদের ভাষায় ইহা পরিস্ফুট রহিয়াছে। আমরা বিস্তীর্ণ ভাবে নাগরাদি ভাষার আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবল আদর্শ মাত্র প্রদত্ত হইল।

নাগর, ধাঁনুক ও চাঁইগণের পল্লীভাষার আদর্শ

বিশেষ্য পদ

টোক্‌রি, থালিয়া, মুঙগা, হাঁড়ীয়া, বোর্‌ণী, সাহায, পোৎনা, মচ্ছি, লদিয়া ইত্যাদি।

টোক্‌রি (ঝুড়ি)

টোক্‌রি ম্যা চাউল ছিলিয়ান্‌ রে ?

১৪। "ভেট লাগে ছুই ব্যালা" অর্থাৎ গুলিখোরেরা দলবলে একত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলি খাইয়া থাকে।

১৫। "কলকী-ভাঙ্গা মেরু"—অর্থাৎ ভাঙ্গা কলিকার গোড়াটী উল্টা করিয়া বসাইলে যে প্রকার দেখায়, সেই প্রকারের ক্ষুদ্র গোলাকার কলিকাকে "মেরু" বলিয়া থাকে। উহাতেই ছোট ছোট মটরপ্রমাণ গুলি পাকাইয়া দিয়া অগ্নিসংযোগে ধূমপান করে।

১৬। "কাল কানু"—গুলির বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কানু নাম দিয়াছে। পূর্ব্বে "হয়ণাহুকা"কে "ব্রজের বলা" বলা হইয়াছে বলিয়া বলরাম ভ্রাতা ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছে।

১৭। "ভজিলে জয়ডঙ্কা বাজে"—সচরাচর গুলিখোরেরা কোন কাজ করে না বলিয়া গুলির খরচে শীঘ্র নিঃস্ব হইয়া যায়। জমিজমা মহাজন নিলাম করিয়া লইবার কালে "ঢোলসহরৎ" করে বলিয়া "জয়ডঙ্কা বাজে" বলা হইয়াছে।

১৮। "শঙ্কা যায়, হয় লঙ্কাপোড়া হনু"—মহাজনের ভয় যায়, কারণ তাহার কিছুই সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। গুলিখোরের চেহারা বিকৃত ও কাল হইয়া যায় কোথাও আশ্রয় পায় না, সুতরাং মুখপোড়া বাঁদরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৯। ধোঁয়া থাসি—গুলিখোরেরা গুলির ধোঁয়া শীঘ্র ছাড়িয়া দেয় না। জোর করিয়া দমবন্ধ করিয়া রাখে।

২০। সাত পুরুষের গুরু—গুলিখোরের বংশধরগণ প্রায়ই গুলিখোর হইয়া উঠে।

খালিয়া (থাল)

খালিয়া ভরিকে খা লে ?

মুগুগা (কাপড়)

মুগু গা পিন্‌হিকে যো।

হাঁড়ীয়া (হাঁড়ী)

হাঁড়ীয়া ভ্যরিকে রান্‌ক্যাছি।

বোরণী (ঝাঁটা)

আগুনামে বোরণী দে দিহিন্।

সাহার (স্থূল ঝাঁটা)

গোহালিমে সাহার দে।

পোৎনা (ছাতা)

ভান্‌শা ঘ্যরক পোৎনা পর্‌লছিনি।

(ভান্‌শা—ভাতশালা। রান্নাঘরে ছাতা দেওয়া হয় নাই।)

মচ্ছি (মৎস্য)

হাট্‌স মচ্ছি আন্‌হিন্।

লাদিয়া (কাতারি)

লদিয়া মে দহি ছ্যাই।

বাবু, (পিতা), বেটা, বেটী, বহু বা কনিঞা, নন্ প্রভৃতি পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হয়।

পল্লীভাষায় কতিপয় শব্দের সম্বোধনপদের প্রকৃতি — সম্বোধনে সামান্ত প্রভেদমাত্র দৃষ্ট হয়। যথা—
বাবুহো, বাহো, মাগে, বেটীগে ইত্যাদি।

*ক্রিয়াপদ

কতিপয় ক্রিয়াপদের রূপ

শব্দ	বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
করই	করইছিন্	করইছলিহিন্	করবেই
যাই	যাইছি	গেলছেলিএ	যাবে
খাই	খাইছি	খাল্‌ছি	খাবৈ
দেই	দেইছি	দেল্‌ছি	দেদেতিহিন্।

কতিপয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার

করইছিন্ (বর্ত্তমানে)

তুঁ কোন্ কাম্ 'ক্যরই-ছিন্'।

খালছি (অতীতে)

কাল মচ্ছি দে করিয়ে ভাত 'খালছি' (বা খালছিলিয়ে)

* ক্রিয়াপদের অগ্রে সর্ব্বনামপদ লিখিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভ্রমবশতঃ ক্রিয়াপদের পরে সর্ব্বনাম লিখিত হইল।

খাবৈ (ভবিষ্যতে)

হাম্মার অর হোল্‌ছি (বর্ত্তমানে), কাল তাত 'খাবৈ'।

দেদেত্তিহিন্‌ (ভবিষ্যতে)

ওকার্‌ টাকা কাল দেদেতেহিন্‌।

সর্ব্বনাম

(আমি)

নাগরাদি জাতির পল্লীভাষার সর্ব্বনাম পদের আদর্শ

আমি	হাম্মা।
আমার	হম্‌রে।
আমাদের	হাম্‌রেকেরা।

(তুমি)

তুমি	তুঁ, তুঁই।
তোমার	তোরা।
তোমাদের	তোরাকেরা।

(তিনি)

তিনি	উ।
তাহার	ওক্‌রেল
তাহাদের	ওকরাকেরা

এই প্রকার রূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

সচরাচর নাগর, ধানুক ও চাঁইগণের বিবাহকালে স্ত্রীগণ যে গান গাইয়া থাকে তাহাতে তাহাদের পল্লীভাষা সুন্দর সজ্জিত দেখিতে পাই। স্ত্রীগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে বসে, কাহার সাধ্য হঠাৎ তাহাদের গানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। উহারা তাহাদের গীতগুলি অন্যকেও প্রদান করিতে চাহে না। অতিকষ্টে নিম্নলিখিত গীতকয়েকটি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

(১ম)

বাস্তুপূজার গান

নাগরাদি জাতীর রমণীদিগের গ্রাম্যসঙ্গীত

১। বৈত বাঁধল উলুয়া ছারল হে।
গোসাঞ পরমেশ্বরী ঘড় কোইলি রাবএ॥

২। দহি বাহি লেঁও তলুঁ শশুরা,
গোঁসাঞ লেঁও তলুঁ কুল পরিবাড়, পরমেশ্বরী ইত্যাদি।

৩। নাহে নাহে ওয়ারা বেসাওয়াল,
গোসাঞ দেশ দেশ দেওতা ছিটাওয়াল,
পরমেশ্বরী ঘর কোইলি রাবএ॥ ঞ।

৪। "লহিরাস" * নহি আওল ভাইয়া মোর,
শশুরাশ নহি আওল ছোট দেওয়া,
জিয়ে মোর গভরাইছে হে॥

৫। "লহিরাস" আগল ভাইয়া মোর,
শশুরাশ আওল ছোট দেওরা মোর,
জিয়ে মোর "হলসইছ" হে॥

৬। ঘিঅ ঘিঅ সাঁচ দাদি মেয়োগে,
তোঁহড় ঘিঅ হৈত ঘিয় ঢাড়.
পরমেশ্বরী ইত্যাদি।

কতিপয় ব্যবহার্য্য শব্দ

বাঁধল, ছারল, কোইলিয়াবএ, বেসাওয়াল, ছিটাওয়াল, কোইলি, আওল, গভরাইছে, হলসইছ, সাঁচ, ঢাড়, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

নাহে = ক্ষুদ্র, নেওতা = নিমএল, গভরাইছে-(ঘাবড়েযাইল) ব্যাকুলিত হইতেছে, হলসইছ = সুস্থ হইলে।

(২য়)

সিন্দূর-দানের গান

১। কউনা গগরিয়াগে বেটি সোনারা সোনাগড়এ,
কউনা নগরিয়াগে বেটি বাভানা বেদ পড়এ॥

২। কিএ তোর খালিও হে বাবা কিএ তোর পিন্হলুঁ,
সিন্দুরকে লোহ্বা হে বাবা করলে পর ঘরিয়া॥

৩। ভাত মোর খাইলে গে বেটি, কাপড় মোর পিন্হলে,
কটুমক লোহ্বগে বেটি করলুঁ পর ঘরিয়া॥

৪। হাত তোর খসিওয়ে বাভানা, সুয়ামি ঘুনায়েলগিও,
বাবাস ছোড়াওয়ালে রে বাভানা সামীস মিলাওলে॥

৫। পথি তোর জড়িওয়ে বাভানা যুয়ানীঘুনয়ে লগিও।
ভাইয়াস ছোড়াওয়াল রে বাভনা শশুরস মিলাওলে॥"

নব পরিণীতা কন্যা পিতৃভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্য দুঃখ করিতেছে। কুটুম্ব ও সিন্দূরলোভে

---

* "ন্যাইহোর" শব্দ সাধারণতঃ বধূর পিতৃগৃহ বুঝায়, সাধারণতঃ এই দেশের স্ত্রীগণই 'ন্যাইহোর' শব্দের প্রয়োগ করিয়া অপরিসীম সুখানুভব করিয়া থাকে।

আমরাই তাহার "নহির" বলিয়া থাকে 'লহিরাস' অর্থে 'নহির' হইতে অর্থাৎ পিতৃগৃহ হইতে। ("বহু ন্যাইহোর্ কত্তে গেছে" বলিলে বধূ পিত্রালয়ে আছে বুঝায়।)

তাহাকে পরগৃহে দিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত করিয়া দিল তাহাকে "হাত খসিয়া যাউক", "তোর পথি (পুঁথি) জলিয়া যাউক", তোর "যুয়ানী ঘুনরে লগিও" অর্থাৎ "তোর যৌবন দেহে ঘুন লাগিয়া যাউক" বলিয়া গালি দিতেছে।

পল্লীভাষার শব্দ — খালিও পিনুহলুঁ, করলুঁ, ছোড়াওয়ালে, সিলাওলে, জড়িওরে, খসিওরে, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অতি সুন্দর এবং নিয়ত ব্যবহৃত হয়।

অর্থ — কউনা = কনে, বাভানা = ব্রাহ্মণ, পরঘরিয়া = পরের ঘর, কটুমক = কুটুম্বের, পথি = পুঁথি, পুস্তক, যুয়ানী = যৌবন।

বিবাহ উৎসবাদিতে রমণীগণ এক প্রকার লম্ফ দিয়া তালে-তালে নৃত্য করে। নৃত্যভঙ্গিটী সাঁওতালীধরণের। নৃত্যকালে গান গাইতে থাকে এবং তালে তালে পা ফেলে। এই নৃত্যকালে যে গান গাইয়া থাকে উহাকে তাহারা "নাচারি" বলিয়া থাকে। বাঙ্গালায় এই প্রকার গীতের নাম "নাচাড়ী" হইয়াছে।

(৩য়)

নাচারি

নৃত্যসহযোগে গীত ও ভাষাকৌতুক—

১। বাড়ী পিছুয়ার পিপর গাছরে, পিপর বহি যায় ॥
তঁহি তল উতরে বরেছিয়া মিতা খেলহুঁ সীকার ॥
তাঁহি তল উতরে বরেছিয়া। ধ্রু।

২। কউনক হাত্ত ধনুকিয়ারে, কউনক হার তরওয়ার ॥
কউনক হাত গুলেল্‌ওয়া, কেউনক হাত বরেছিয়া
মিতা খেলহুঁ সীকার ইত্যাদি।

৩। কউনক টুটল ধনুকিয়ারে, কউনক টুটলে তরোওয়ার।
কউনক টুটল গুলেলওয়া, কউনক টুটল বরেছিয়া ॥
মিতা খেলহুঁ ইত্যাদি।

৪। দেওরক টুটল বরেছিয়া, ভঁইসুরয়া তরোওয়ার।
মিতওয়াকো টুটল ধনুকিয়া, মিতা খেলহুঁ সীকার ॥
মিতা ইত্যাদি।

৫। কঙ্কিও বাসকের বাঙালা মিতা ছাপকি ছয়াড়।
আটকি রহল শির পাগিয়া মিতা রহল লজাই।
মিতা ইত্যাদি।

৬। আবহো মিতাঘর আঙিনা ঘড় আঙিনা তোহাড়।
বইসক লেব দোনজাজিয়া, মিতা যৌবন তোহাড়।
মিতা ইত্যাদি।

(৪র্থ)

লাচারি

১। হুগলি সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি ॥

নৃত্যসহযোগে গীত, ভাষা এবং শব্দ

২। ঘড় পিছুয়াড় বৈসল চুড়ি হাড়ওয়া।
অহো, রাণিক খোগড় চুড়িয়া গড়ায় মুরলি ॥
৩। অইছন চুড়িয়া গঢ়াবে চুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, বঁহিয়া মোড়েড়ি ঘর যায় মুরলি ॥
৪। বাটয়ে বাটোহিয়ারে তুঁহি মোর ভইয়া।
আঁহো, হামারে সমবাদ্ লেল যায় মুরলি ॥
৫। তুঁহয়ে সমবাদ্ বহিনো চিনিওনা জানিও
আহো, কইছন করি কহব সম্বাদ্ মুরলি ॥
৬। হামার বল-মুয়াকে টেঁয়ে টেঁয়ে পাগিয়া।
আহো, যইছন মোগল, পইঠান মুরলি ॥

আবশ্যকীয় নূতন শব্দ

বাট ও বাটোহিয়া, বল-মুয়াকে, প্রভৃতি শব্দ প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। বাট = পথ, বাটোহিয়া = পথিক, বলমুয়াকে = পতিকে, স্বামিকে।

(৪) অর্থ—পথের পথিক তুমি আমার ভাই
আমার সমাচার লইয়া যাও,
'মুরলি' সম্রান্তবাচক এক্ষণে ধুয়া।
(৬) অর্থ—আমার স্বামির মাথার পাগড়ীটী বাঁকা বাঁকা
যেমন মোগল, পাঠানের।

এই গীতটী অতি মধুর রমণীকণ্ঠে গীত হয়, "আহো" পদটী গীত মধ্যে অতি দ্রুতভাবে গাইতে হয়। তালে তালে নৃত্যসহকারে এই গীতটী গাইলে যমুনা, গোপী ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রকার পল্লীভাষার ক্রিয়াপদগুলির কালবিভাগসূচক বিভক্তির প্রয়োগ বড়ই জটিল। উচ্চারণের সামান্য প্রভেদে বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া যায়।

বর্ত্তমানে

ক্রিয়াপদের বর্ত্তমানের রূপ

	(১ম পীঃ)	পড়এ	(২য় পী)
পতরাইছে	(ঐ)	পড়এ	(ঐ)
হয়সইছ	(ঐ)	অলহুঁ	(৩য় পী)

ইছে, ইছ, অএ, অহুঁ প্রভৃতি বিভক্তিসংযোগে বর্ত্তমান পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

আঁইড়ার[১৩] হাওদার বস্তা, ওয়াদা বুঝে, কায়দা করে গালায় মাক্কা ॥
বুড়্যার শুস্তাছি লহর, বিসম বিহর, খেয়্যাছে জহর, দু তিন কাক্কা ॥
কি বাহু খাটালো, বিষের মিটুল জ্বালা, ফুটুলো গলায় কাল-চাকা ‡ ॥
বুড়া খাচ্চে গাঁজা, ভাংগের ফাঁকি, আদন্তে কেবল মদতে[১৪] বাকি।
নিশায় বেদিশা, ক্ষ্যাঙ্‌টা কাচা, বুড়্যা অচ্ছা গুণী চাচাহে।
বুড়্যার কপালের চাঁদটা, আস্ত আইক্কা[১৫], চোক্‌টা ঈশ্‌কাপনের টেক্কা ॥"

(§গম্ভীরার গান)

চোখ্যা, হুঁকরে, হোঁকা, ছুয়ারমাটকি, ফোঁক্কা, আচ্‌কা, গীয়্যার বেটা, দাম্রু, বান্দা, ধান্দা, নাথান্দা, পট্টি, টাট্টির, চট্টির, লুক্কা, লহর, বিহর, জহর, চাকা, মদতে, নিশায়, বেদিশা, ক্ষ্যাঙটা, আইক্কা ইত্যাদি এদেশে প্রচলিত নিরত ব্যবহৃত শব্দ।

কতিপয় পল্লীভাষার নিত্যব্যবহৃত শব্দ

নিম্নে অন্য একটী গম্ভীরার গীত লিপিবদ্ধ করিলাম। এই গীতটীতে প্রভূত পরিমাণে পল্লীভাষার ছটা ও ঘটা দেখিতে পাইবেন। এদেশে গুলিখোরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। গুলিকে এদেশে "মদৎ" বলিয়া থাকে, নিম্নের গীতটীতে মদৎ প্রস্তুতের উপকরণ ও মদৎ সেবার বিষময় ফলের উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা সমাজ-সংস্কার পক্ষে উত্তম হইয়াছে। ৺ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয় গম্ভীরা গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার তুলিকায় রচিত "মদতের গান"টাই নিম্নে লিখিত হইল।

(২য় গীত)

নিত্যব্যবহৃত-শব্দবিশিষ্ট গীত

"আমি প্রনাম করি মদৎ প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
তোমাকে ভজে মুক্‌টি বাঁদর পুঁকুটী[১] হল সরু ॥
প্রভুর সিংহাসনটি আন্‌থাহাঁড়ী-কাঁন্‌থা-ভাজা গলা[২]।

১৩ এঁড়ে, বৃষ। ১৪ গুলি। ১৫ আস্‌কে, পিষ্টকবিশেষ।

‡ ফুটলো গলায় কাল চাকা—বিষপানহেতু শিব নীলকণ্ঠ হইলেন।

§ গম্ভীরার গানটীর প্রথমেই "ভালকের" স্থূল সংস্করণ বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া হয়ত পাঠকমহোদয়গণ 'রুচিবিকার" মনে করিবেন কিন্তু ইহা মনে রাখিবেন 'পল্লীভাষা' অতিমার্জ্জিত নহে। যাহাই হউক গানটীর মধ্যে মালদহ পল্লীভাষার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

১। পুঁকুটী—(দেশীভাষার 'ল্যোড়া') নিতম্ব, পাছা।
"পুঁকুটী হল সরু"—(গুলিখোরদের) "নিতম্বদেশ শুষ্ক হইয়া যায়।"

২। আন্‌থা-হাঁড়ী-কান্‌থা-ভাজা-গলা।
আন্‌থা—আশ্চর্য্য, অদ্ভুত।
কান্‌থা-ভাজা-গলা—গলার কানা ভাঙ্গা।
অর্থাৎ আশ্চর্য্য গোছের হাঁড়িটীর গলার কানা ভাঙ্গা।

তাতেই হরণা৩ হুকা কেমন শোভা যেমন ব্রজের বলায়ে।
ভোগ দিতে আয়োজন ভারি ভোগের হাঁড়ী বোকা-কাতারি৪ !
তুলনা তাতে জানি য্যামন মুড়কি-মারা খানি৫।
খানি নাড়তে পিয়ারা-পাত্তার-ঝাঁমু৬ বাত্তা-ছিলা-কাড়ু ॥৭
প্রভুর রঙ্গভারি অঙ্গসেবায়, শিক লাগে ঠিক লম্বা।৮
গলিয়ে মাল, চুলিয়ে৯ নিতে, জিভ্যা ১০ য্যামন, এল মা জগদম্বা।১১।
বার্ষিকী-পাঁচ-পয়সা-চুকান১২ প্রভুর শ্রীপাট সেখজীর দোকান।১৩

৩। হরণা হুকা—যে হুঁকার খোলটী কাল না হইয়া শাদা গোছের। এই প্রকারের হুঁকার মূল্য কম বলিয়া গুলিখোরেরা পছন্দ করে এবং গুলিখোরেরা প্রায়ই স্নান করে না বলিয়া হুঁকায় তেল দেয় না। সুতরাং বলরামের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বর্ণ বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে।

৪। বোকা কাতারি—যে হাঁড়ি বাজাইলে বাজে না তাহাকে বোকা বলে। এস্থলে ফাটা ক্ষুদ্র হাঁড়ী যাহা অন্য কার্য্যে অব্যবহার্য্য।

৫। মুড়কী-মারা-খানি—মুড়কী প্রস্তুত করিবার সময় মোদকগণ খোলার সাহায্যে মুড়কী প্রস্তুত করে। এদেশে এক এক খোলা মুড়কী প্রস্তুত করার নাম 'একখানি মুড়কীমারা'' হইল বা "একখানি মুড়কী" বলিয়া থাকে।

৬। ঝাঁমু—গুলিপ্রস্তুতকালে পিয়ারাপাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অগ্নিতে উপরি উক্ত "আনখাহাঁড়ী-কানখা-ভাঙ্গা গলা" বিশিষ্ট হাঁড়িতে করিয়া ভাজিতে হয় এবং সেই ভর্জ্জিত পিয়ারাপাতা দেখিতে "চা"র মত হইলে তাহার নাম "ঝাঁমু" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে পান হইতে ঝাঁমু করিত একণে পিয়ারা-পাতা হইতে ঝাঁমু করিয়া থাকে।

৭। বাত্তা ছিলা-কাড়ু—মুড়কীপ্রস্তুতকালে "কাষ্ঠময় হাতার" প্রয়োজন হয়, কিন্তু গুলিপ্রস্তুতকালে বংশ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দণ্ড আবশ্যক হয়, উহার নাম "কাড়ু"। বাত্তা ছিলা অর্থাৎ বাঁশের বাকারি চাঁচিয়া কাড়ু প্রস্তুত হয়।

৮। শিক লাগে ঠিক লম্বা—গুলিপ্রস্তুতকালে উত্তপ্ত গুলি নাড়িবার জন্য লম্বা শিকের আবশ্যক হয়।

৯। চুলিয়ে—চোলাই করিতে (distillation)

১০। জিভ্যা—আফিং জলমিশ্রিত করিয়া অগ্নিতাপে "বোকা কাতারি"তে ফুটাইতে হয় এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড জিহ্বার ন্যায় করিয়া কাতারির গাত্রে গলিত আফিংএর সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয় এবং কৌশীক আকর্ষণে বিশুদ্ধ অহিফেন চোলাই হইয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রক্ষিত হয়। ঐ বস্ত্রখণ্ডের নাম "জিভ্যা"।

১১। জগদম্বা—কালিকা; অর্থাৎ কাতারির উপর "জিভ্যা" বর্ত্তমান থাকিলে, দেখিতে লোলজিহ্বা কালিকার ন্যায় দেখায়।

১২। বার্ষিকী পাঁচপয়সা চুকান—অর্থাৎ সেই সময়ে পাঁচ পয়সায় একসিকি ওজনের আফিং পাইত। গীতরচক একজন গুলিখোর (মদভি) ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এক এক বারে একসিকি অহিফেনের 'মাত' সেবন করিতেন।

১৩। "প্রভুর শ্রীপাঠ সেখজীর দোকান"—গীতরচক বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন যেই কারণে "প্রভু" অহিফেনকে বলিয়াছেন এবং অহিফেনের স্থান "শ্রীপাঠ" নামে উক্ত হইয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোসলমানগণই অহিফেনের দোকান করিয়া থাকে, সেই কারণে আফিংএর অবস্থান সেখজির দোকান বলা হইয়াছে।

শিষ্য জুটে ম্যালা, প্রভুর ভেট লাগে দুই ব্যালা[১৪],
তাতে কল্‌কী, আজব-কল্‌কী-ভাঙ্গা মেরু ॥[১৫]
প্রভুর রূপটি ভাল, দেখতে আলো, যেমন ব্রজের কালকানু ।[১৬]
ভজিলে জয়-ডঙ্কা বাজে[১৭], শঙ্কা যায়, হয় লঙ্কাপোড়া হনু ॥[১৮]
নলে মুখে যখন চুমি, কখন হাঁসি, কখন কাশি, যথ ধোঁয়া থাসি[১৯]
ভাবি কাজ কি গয়া কাশী,দীন দয়াময় গুলিঠাকুর সাতপুরুষের[২০] গুরু ॥"

যাহাই হউক গীতোক্ত শব্দগুলির ব্যবহার এতদ্দেশে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। আমরা অন্য প্রকার মালদহের পল্লীভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এদেশে নাগর, ধানুক ও চাঁই নামক জাতি যথেষ্ট বাস করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষার পার্থক্য আছে। নিম্নে উক্ত ভাষার আলোচনা করিলাম।

নাগর, ধানুক ও চাঁইগণের ভাষা

নাগর, ধানুক ও চাঁইগণের পল্লীভাষার আদর্শ

নাগর, ধানুকেরা বিহার ও মিথিলাদি জনপদবাসী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বর্ত্তমান কালে তাহাদের ভাষায় ইহা পরিস্ফুট রহিয়াছে। আমরা বিস্তীর্ণ ভাবে নাগরাদি ভাষার আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবল আদর্শ মাত্র প্রদত্ত হইল।

বিশেষ্য পদ

টোক্‌রি, থালিয়া, মুণ্ডগা, হাঁড়ীয়া, বোর্‌ণী, সাহার, পোৎনা, মচ্ছি, নদিয়া ইত্যাদি।

টোক্‌রি (ঝুড়ি)

টোক্‌রি ম্যা চাউল ছিলিয়ান্ রে ?

১৪। "ভেট লাগে দুই ব্যালা" অর্থাৎ গুলিখোরেরা দলবলে একত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলি খাইয়া থাকে।

১৫। "কলকী-ভাঙ্গা মেরু"—অর্থাৎ ভাঙ্গা কলিকার গোড়াটী উল্টা করিয়া বসাইলে যে প্রকার দেখায়, সেই প্রকারের ক্ষুদ্র গোলাকার কলিকাকে "মেরু" বলিয়া থাকে। উহাতেই ছোট ছোট মটরপ্রমাণ গুলি পাকাইয়া দিয়া অগ্নিসংযোগে ধূমপান করে।

১৬। "কাল কানু"—গুলির বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কানু নাম দিয়াছে। পূর্ব্বে "হয়গাহুকা"কে "ব্রজের বলা" বলা হইয়াছে বলিয়া বলরাম ভ্রাতা ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছে।

১৭। "ভজিলে জয়ডঙ্কা বাজে"—সচরাচর গুলিখোরেরা কোন কাজ করে না বলিয়া গুলির খরচে শীঘ্র নিঃস্ব হইয়া যায়। জমিজমা মহাজন নিলাম করিয়া লইবার কালে "ঢোলসহরৎ" করে বলিয়া "জয়ডঙ্কা বাজে" বলা হইয়াছে।

১৮। "শঙ্কা যায়, হয় লঙ্কাপোড়া হনু"—মহাজনের ভয় যায়, কারণ তাহার কিছুই সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। গুলিখোরের চেহারা বিকৃত ও কাল হইয়া যায় কোথাও আশ্রয় পায় না, সুতরাং মুখপোড়া বাঁদরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৯। ধোঁয়া থাসি—গুলিখোরেরা গুলির ধোঁয়া শীঘ্র ছাড়িয়া দেয় না। জোর করিয়া দমবন্ধ করিয়া রাখে।

২০। সাত পুরুষের গুরু—গুলিখোরের বংশধরগণ প্রায়ই গুলিখোর হইয়া উঠে।

থালিয়া (থাল)

থালিয়া ভরিকে খা লে ?

মুগুগা (কাপড়)

মুগুগা পিন্হিকে যো।

হাঁড়ীয়া (হাঁড়ী)

হাঁড়ীয়া ভ্যরিকে রান্ক্যাছি।

বোরণী (ঝাঁটা)

আঙ্নামে বোরণী দে দিহিন্।

সাহার (স্থূল ঝাঁটা)

গোহালিমে সাহার দে।

পোৎনা (ছাতা)

তান্শা ঘ্যরক পোৎনা পর্ল্ছিনি।

(তান্শা—ভাতশালা। রান্নাঘরে ছাতা দেওয়া হয় নাই।)

মচ্ছি (মৎস্য)

হাট্স মচ্ছি আন্হিন্।

লাদিয়া (কাণ্ডারি)

লদিয়া মে দহি ছ্যাই।

বাবু, (পিতা), বেটা, বেটী, বহ বা কনিঞা, নন্ প্রভৃতি পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হয়। সম্বোধনে সামান্য প্রভেদমাত্র দৃষ্ট হয়। যথা—

পল্লীভাষায় কতিপয় শব্দের সম্বোধনপদের প্রকৃতি

বাবুহো, বাহো, মাগে, বেটীগে ইত্যাদি।

*ক্রিয়াপদ

কতিপয় ক্রিয়াপদের রূপ

শব্দ	বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
করই	করইছিন্	করইছলিহিন্	করবেই
যাই	যাইছি	গেল্ছেলিএ	যাবে
খাই	খাইছি	খাল্ছি	খাবৈ
দেই	দেইছি	দেল্ছি	দেদেতিহিন্।

কতিপয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার

করইছিন্ (বর্ত্তমানে)

তুঁ কোন্ কাম্ 'ক্যরই-ছিন্'।

খালছি (অতীতে)

কাল মচ্ছি দে করিয়ে ভাত 'খালছি' (বা খালছিলিয়ে)

* ক্রিয়াপদের অগ্রে সর্ব্বনামপদ লিখিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভ্রমবশতঃ ক্রিয়াপদের পরে সর্ব্বনাম লিখিত হইল।

খাবৈ (ভবিষ্যতে)

হাম্মার জর হোল্ছি (বর্ত্তমানে), কাল ভাত 'খাবৈ'।

দেদেতিহিন্ (ভবিষ্যতে)

ওকার্ টাকা কাল দেদেতেহিন্।

সর্ব্বনাম

(আমি)

নাগরাদি জাতির পল্লীভাষার সর্ব্বনাম পদের আদর্শ

আমি	হাম্মা।
আমার	হম্রে।
আমাদের	হাম্রেকেরা।

(তুমি)

তুমি	তুঁ, তুঁই।
তোমার	তোরা।
তোমাদের	তোরাকেরা।

(তিনি)

তিনি	উ।
তাহার	ওক্রে।
তাহাদের	ওকরাকেরা

এই প্রকার রূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

সচরাচর নাগর, ধানুক ও চাঁইগণের বিবাহকালে স্ত্রীগণ যে গান গাইয়া থাকে তাহাতে তাহাদের পল্লীভাষা সুন্দর সজ্জিত দেখিতে পাই। স্ত্রীগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে বসে, কাহার সাধ্য হঠাৎ তাহাদের গানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। উহারা তাহাদের গীতগুলি অন্যকেও প্রদান করিতে চাহে না। অতিকষ্টে নিম্নলিখিত গীতকয়েকটি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

(১ম)

বাস্তুপূজার গান

নাগরাদি জাতীয় রমণীদিগের গ্রাম্যসঙ্গীত

১। বেঁত বাঁধল উলুয়া ছারল হে।
গোসাঞ পরমেশ্বরী বড় কোইলি রাবএ॥
২। লহি বাহি লেঁও তসুঁ শগুরা,
গোঁসাঞ লেঁও তসুঁ কুল পরিবাড়, পরমেশ্বরী ইত্যাদি।
৩। নাহে নাহে গুরারা বেসাতয়াল,
গোসাঞ দেশ দেশ নেওতা ছিটাওয়াল,
পরমেশ্বরী ঘর কোইলি রাবএ॥ ধ্রু।

৪। "লহিরাস" * নহি আওল ভাইয়া মোর,
শশুরাশ নহি আওল ছোট দেওরা,
জিয়ে মোর গভরাইছে হে ॥

৫। "লহিয়াস" আপল ভাইয়া মোর,
শশুরাশ আওল ছোট দেওরা মোর,
জিয়ে মোর "হলসইছ" হে ॥

৬। ঘিঅ ঘিঅ সাঁচ দাদি মেরোগে,
তোঁহড় রিঅ হৈত ঘির ঢাড়.
পরমেশ্বরী ইত্যাদি।

কতিপয় ব্যবহার্য্য শব্দ

বাঁধল, ছারল, কোইলিয়াবএ, বেসাওয়াল, ছিটাওয়াল, কোইলি, আওল, গভরাইছে, হলসইছ, সাঁচ, ঢাড়, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

নাহে=ক্ষুদ্র, নেওতা=নিমএল, গভরাইছে-(ঘাবড়েযাইল) ব্যাকুলিত হইতেছে, হলসইছ=সুস্থ হইলে।

(২য়)

সিন্দূর-দানের গান

১। কউনা গগরিয়াগে বেটি সোনারা সোনাগড়এ,
কউনা নগরিয়াগে বেটি বাভানা বেদ পড়এ ॥

২। কিএ তোর খালিও হে বাবা কিএ তোর পিন্হলুঁ,
সিন্থরকে লোহবা হে বাবা করলে পর ঘরিয়া ॥

৩। ভাত মোর খাইলে গে বেটি, কাপড় মোর পিন্ধলে,
কটুমক লোহবগে বেটি করলুঁ পর ঘরিয়া ॥

৪। হাত তোর খসিওয়ে বাভানা, স্বয়ামি ঘুনায়েলগিও,
বাবাস ছোড়াওয়ালে রে বাভানা সামীস মিলাওলে ॥

৫। পথি তোর জড়িওয়ে বাভানা ঘুয়ানীঘুমরে লগিও।
ভাইয়াস ছোড়াওয়াল রে বাভনা শশুরস মিলাওলে ॥"

নব পরিণীতা কন্যা পিতৃভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্য দুঃখ করিতেছে। কুটুম্ব ও সিন্দুরলোভে

---

* "ল্যাইহোর" শব্দ সাধারণতঃ বধূর পিতৃগৃহ বুঝায়, সাধারণতঃ এই দেশের স্ত্রীগণই 'ল্যাইহোর' শব্দের প্রয়োগ করিয়া অপরিসীম সুখানুভব করিয়া থাকে।

নাগরাই তাবার "লহির" বলিয়া থাকে 'লহিরাস' অর্থে 'লহির' হইতে অর্থাৎ পিতৃগৃহ হইতে। ("বহু ল্যাইহোর কত্তে গেছে" বলিলে বধূ পিত্রালয়ে আছে বুঝায়।)

তাহাকে পরগৃহে দিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত করিয়া দিল তাহাকে "হাত খসিয়া যাউক", "তোর পথি (পুঁথি) জলিয়া যাউক", তোর "যুয়ানী ঘুনরে লগিও" অর্থাৎ "তোর যৌবন দেহে ঘুন লাগিয়া যাউক" বলিয়া গালি দিতেছে।

পল্লীভাষার শব্দ — খালিও পিন্হলুঁ, করলুঁ, ছোড়াওয়ালে, সিলাওলে, জড়িওরে, খসিওরে, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অতি সুন্দর এবং নিয়ত ব্যবহৃত হয়।

অর্থ — কউনা = কনে, বাভানা = ব্রাহ্মণ, পরঘরিয়া = পরের ঘর, কটুমক = কুটুম্বের, পথি = পুঁথি, পুস্তক, যুয়ানী = যৌবন।

বিবাহ উৎসবাদিতে রমণীগণ এক প্রকার লম্ফ দিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যভঙ্গিটী সাঁওতালীধরণের। নৃত্যকালে গান গাইতে থাকে এবং তালে তালে পা ফেলে। এই নৃত্যকালে যে গান গাইয়া থাকে উহাকে তাহারা "নাচারি" বলিয়া থাকে। বাঙ্গালার এই প্রকার গীতের নাম "নাচাড়ী" হইয়াছে।

(৩য়)

নাচারি

নৃত্যসহযোগে গীত ও ভাষাকৌতুক

১। বাড়ী পিছুয়ার পিপর গাছরে, পিপর বহি যায়।
তঁহি তল উতরে বরেছিয়া মিতা খেলহুঁ সীকার॥
তাঁহি তল উতরে বরেছিয়া। ধ্রু।

২। কউনক হাত ধনুকিয়ারে, কউনক হার তরওয়ার॥
কউনক হাত গুলেল্ওয়া, কেউনক হাত বরেছিয়া
মিতা খেলহুঁ সীকার ইত্যাদি।

৩। কউনক টুটল ধনুকিয়ারে, কউনক টুটলে তরোওয়ার।
কউনক টুটল গুলেলওয়া, কউনক টুটল বরেছিয়া॥
মিতা খেলহুঁ ইত্যাদি।

৪। দেওরক টুটল বরেছিয়া, ভঁইসুরয়া তরোওয়ার।
মিতওয়াকো টুটল ধনুকিয়া, মিতা খেলহুঁ সীকার॥
মিতা ইত্যাদি।

৫। কহিও বাসকের বাঙালা মিতা ছাপকি ছুয়াড়।
আটকি রহল শির পাগিয়া মিতা রহল লজাই।
মিতা ইত্যাদি।

৬। আবহো মিতাঘর আঙিনা ঘড় আঙিনা তোহাড়।
বইলক দেব দোন জাজিয়া, মিতা যৌবন তোহাড়।
মিতা ইত্যাদি।

(৪র্থ)

লাচারি

নৃত্যসহযোগে গীত, ভাষা এবং শব্দ

১। হুগলি সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি ॥

২। ঘড় পিছুয়াড় বৈসল চুড়ি হাড়ওয়া।
অহো, রাণিক খোগড় চুড়িয়া গড়ায় মুরলি ॥

৩। অইছন চুড়িয়া গড়াবে চুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, বঁহিয়া মোড়েড়ি ঘর যায় মুরলি ॥

৪। বাটয়ে বাটোহিয়ারে তুঁহি মোর ভইয়া।
আহো, হামারে সমবাদ্ লেল যায় মুরলি ॥

৫। তুঁহরে সমবাদ্ বহিনো চিনিওনা জানিও
আহো, কইছন করি কহব সম্বাদ্ মুরলি ॥

৬। হামার বল-মুয়াকে টেঁরে টেঁরে পাগিয়া।
আহো, যইছন মোগল, পইঠান মুরলি ॥

আবশ্যকীয় নূতন শব্দ

বাট ও বাটোহিয়া, বল-মুয়্যকে, প্রভৃতি শব্দ প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। বাট = পথ, বাটোহিয়া = পথিক, বলমুয়াকে = পতিকে, স্বামিকে।

(৪) অর্থ—পথের পথিক তুমি আমার ভাই
আমার সমাচার লইয়া যাও,
'মুরলি' সম্রান্তবাচক এক্ষণে ধুয়া।

(৬) অর্থ—আমার স্বামির মাথার পাগড়ীটা বাঁকা বাঁকা
যেমন মোগল, পাঠানের।

এই গীতটী অতি মধুর রমণীকণ্ঠে গীত হয়, "আহো" পদটী গীত মধ্যে অতি দ্রুতভাবে গাইতে হয়। তালে তালে নৃত্যসহকারে এই গীতটী গাইলে যমুনা, গোপী ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রকার পল্লীভাষার ক্রিয়াপদগুলির কালবিভাগসূচক বিভক্তির প্রয়োগ বড়ই জটিল। উচ্চারণের সামান্য প্রভেদে বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া যায়।

বর্ত্তমানে

ক্রিয়াপদের বর্ত্তমানের রূপ

	(১ম পুঃ)	পড়এ	(২য় পুঃ)
গতরাইছে	(ঐ)	পড়এ	(ঐ)
হলরাইছ	(ঐ)	অলহঁ	(৩য় পুঃ)

ইছে, ইছ, অ-এ, অহঁ প্রভৃতি বিভক্তিসংযোগে বর্ত্তমান পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

অতীতে

ক্রিয়াপদের অতীতের রূপ	ছিটাওয়াল	(১ম গী)	পিন্ধলে	(২ গী)
	বাঁধল	(ঐ)		
	খালিও	(২য় গী)	বয়লুঁ	(ঐ)
	খাইলে	(ঐ)	পিনহলুঁ	(ঐ)

করলে (২য় গী)
ছোড়াওয়ালে (ঐ)
সিলাওলো (ঐ)
টুটল (৩য় গী)
রহল (ঐ)
আলো (৪র্থ গী)
লেল (ঐ)
বৈসল (ঐ)

আল, ইও, ইলে, অলে, অউ (লুঁ) আলে, অল, এল প্রভৃতি দ্বারা অতীতকাল বুঝাইতেছে।

ক্রিয়াপদের ভবিষ্যতের রূপ	ঢাড়	(১ম গী)	দেব	(৩য় গী)
	খসিও	(২য় গী)	গড়াবে	(৪র্থ গী)
	লাগিও	(ঐ)	কহব	(ঐ)
	জড়িও	(ঐ)		

"ঢাড়" পদটি বর্ত্তমানকালেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। এরূপ প্রয়োগে অনুজ্ঞা বা আদেশ বুঝাইবে। 'ঢাড়ল' পদটা অতীতকালে ব্যবহৃত হয়।

অর্থ পার্থক্য

"তোঁহড় ঘির হৈতে ঘির ঢাড়।"
এস্থলে "তোমার ঘৃত হইতে ঘৃত ঢালিয়া দাও।" (সমাপিকা)
অথবা "তোমার ঘৃত হইতে ঘৃত ঢালিয়া দিবে।" বুঝাইবে।
অথবা "তোমার ঘৃত হইতে ঘৃত ঢালিতে থাক"। (অসমাপিকা)

অ, ইও, আবে, অব প্রভৃতি বিভক্তিযোগে ভবিষ্যৎ বুঝাইবে।

আবহো (৩য় গীত)

আবহো শব্দের মূল

"আবহো" বিভাময় আঙিনা ঘড়্ আঙিনা তোহাড়।"
এই আবহো, আইস (অনুজ্ঞা) আয়হ্
(সংস্কৃতে—আনি, আবহ, আমহ (উত্তমপুরুষ) ।

সংস্কৃত উত্তমপুরুষে "আবহ" হইয়া থাকে, এস্থলে মধ্যমপুরুষে আবহো হইয়াছে, কিন্তু অনুজ্ঞা বুঝাইতেছে। আমরা 'লোট্' বিভক্তির ন্যায় পদ সিদ্ধ হইতে দেখিতেছি।

সময়ে সময়ে "আব্" অর্থাৎ আইস অর্থেও ব্যবহৃত হইতে শুনিতে পাই। "হো" বা "ো।" বিভক্তি দ্বারা অনুজ্ঞা বুঝাইয়া থাকে যথা—

(যাব্ শব্দ) যাবহো = যাও।
(কর) করহো = কর।
(যা বা যাহ) যাহো = যাও। ইত্যাদি।

কোঁচ ও পলে জাতির পল্লীভাষা

মালদহ জেলার পল্লীভাষা সম্বন্ধে যতই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন ততই অভিনব ভাবাবেশে মোহিত হইয়া যাইবেন। এ জেলার ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। যদি ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রগাঢ়ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া ইহার অন্তঃস্তলে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে গৌড়ের ইতিহাসের এক অভিনব উদ্যানে উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন।

মিশ্রভাষা

নাগর, ধানুক, চাঁই, কোঁচ, পলে প্রভৃতি অনার্য্য-জাতি এবং পুণ্ড্রাদি আর্য্যজাতিও মাহিষ্য। গণেশ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির সমাবেশে অত্র জেলার ভাষা বড়ই মিশ্র ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। এ ছাড়া মালদহে বিস্তর বিভিন্ন জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মালদহের 'জাতি ও জাতির বিবরণ' পুস্তকে সবিশেষ আলোচনা করা হইবে।

কতিপয় জনতা

পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল (সাঁওতালপরগণা) প্রভৃতির ভাষা অর্থাৎ বিহারী, মৈথিলী, রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানের ভাষা মালদহে বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত কোচবিহারাদির ভাষাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'পলে' জাতি অতি আদিম পার্ব্বতীয় জাতি। ইহারা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান ছিল। মালদহের এই প্রকার ভাষাপার্থক্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রবাদ আছে যোজনান্তর ভাষা এদেশে গ্রামান্তর বলা চলিতে পারে।

মালদহের নদী পরিবর্ত্তন যেমন অস্বাভাবিকভাবে হইয়াছে ভাষাপরিবর্ত্তন বা সংক্রামনও আশ্চর্য্যভাবে হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে কোচ ও পলে জাতিকে সাধারণতঃ "বাঙ্গাল" বলিয়া থাকে; তাহাদের পল্লীভাষারও নিন্দা অন্য জাতিকে করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক তাহারা মালদহের অতি সুপ্রাচীন জাতি। বারেন্দ্র অঞ্চলে তাহাদের অধিকাংশের বাসস্থান। কোচ ও পলেরা প্রাচীন উন্নত অরণ্য ভূভাগে বাস করে। তাহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। এদেশের সেরশাবাদীয়া নামক মুসলমানদের ভাষায় স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গাল ভাষা

কোঁচ, পলের পল্লীভাষার আদর্শ

বিশেষ্য পদ

(কোঁচ ও পলেরা যে প্রকার স্বর ও টানযোগে উচ্চারণ করে তাহা লিখিবার উপায় নাই)

মৈথ্যা (থলে), মেথলি (মেখলা), গামোছ (লঙ্কা), ধেঁাকড়া (কাঁথা), কান্নুহা (জ্ঞাতা), ভাতলকরী (ভাতকাঠি), ভাতোয়া (ভাতপাকের হাঁড়ী)।

মৈথ্যা (থলে)

প্রঃ। রে আঁধাঁরু ! হাটোৎ যামু "মৈথা" দিম্‌না ?

উঃ। দিম্ দিম্ বা দিমু দিমু।

মেখলী (মেখলা-কটিদেশে বাঁধিবার স্ত্রীগণের বস্ত্রবিশেষ)

মোরঘেরে সাহু (স্বামী) আন্নুছে মেখলী কিন্তে।

গামোছ (লঙ্কা)

বাপুরে জালাটা (দড়ির জালবৎ থলে) মোর দিস্ হাটোৎ গামোছ ব্যাচতে যামু।

ধেঁাকড়া (কাঁথা)

ধেঁাকড়া মোর হারিয্যা গেলঃমোঁহো জাড়ৎ মরছ।

কান্নুহা (জ্ঞাতা)

মুই একনা কান্নুহা কোরমু, পাট মোকে দিস্।

মোর ঘেরে মরৎ সাহু (মহাজন) আলছুঃ কি খাইতে দিম্।

রে ছুয়াল বয়েগী ঠাকুর টাকে চাল দিলুঃ।

বাঙ্গাল— বাইনার ব্যাটা গুপারি কি ভাও দিবুঃ।

বানিয়া— গুপারি তিন সের তাও পাবু।

বাঙ্গাল— হৈল্ হৈল্ দিস্ দিস্।

যখন বাইন্তা গাঢ়াক্ হন্।

তখন বাইন্তা টিপ্ টিপ্ করন।

বাঙ্গাল— বাইন্তার ব্যাটা বার্ মসল্যা জ্ঞান্। বাইন্তার ব্যাটা মোর ঘেরে সওদাটা দিমু না আর কোন বাইন্তার কাছোৎ যামু।

কতিপয় নাম— বরাতু (শালিপতিভাই), শ্যাকাই (শ্যালক), কাহিন (নিকা), হিয়াল, ঝাঁপ (চট, কাঁথা, গাত্রবস্ত্রাদি, থাল, ধোকড়)।

ব্যক্তির নাম—আন্ধার, জোনাকু, নিরাসা, আজ (রাজ), মোহন, ধর্ম্যা।

ক্যাজাক্ করোছি—ঠাট্টা করিতেছি।

"মালদহের জাতি ও ভাষা"-নামক পুস্তকে প্রত্যেক জাতির ও তাঁহাদের ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির বিস্তীর্ণ বর্ণনাযুক্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহরিদাস পালিত
মালদহ শিক্ষা-সমিতি।

আসাম-ভ্রমণ

দ্বিতীয় প্রবন্ধ*

ডিমাপুর ও মাইবং

১৩১৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে ডিমাপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, আর ১৩১৫ সালের দোল-যাত্রার দিনে মাইবং দেখিয়াছি।

মণিপুর রোড ষ্টেশনের অতীব সন্নিকটেই ডিমাপুরের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ। ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় ১ মাইল গেলেই রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড়-প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। তৎপর আরও কিছু গিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া কিছুদূর গমন করিলে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে পৌঁছা যায়।

তোরণদ্বারটি প্রায় ২৫ হাত উচ্চ এবং বেশ প্রশস্ত। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। ইহার দুইদিক্ হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে, ঐ প্রাচীর ৫ হাত উচ্চ ও ২ হাত প্রশস্ত।

ভিতরে ঢুকিলেই দাবার গুটির ন্যায় পরিলক্ষিত দুইসারি প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ডিমাপুরের প্রধান দর্শনীয় পদার্থ এই গুলি—

স্তম্ভ অনেক; সর্ব্বাপেক্ষা বড় যেটি উহার উচ্চতা প্রায় ৯ হাত এবং বেড় প্রায় ১৫ হাত। এই স্তম্ভগুলি "বেলে পাথর" দ্বারা নির্ম্মিত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিতান্ত সন্নিকটে কোনও প্রস্তরময় পর্ব্বত দেখা যায় না। স্তম্ভগুলিতে সুন্দর কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। জীবজন্তু লতাপাতা ফুল প্রভৃতি ইহাতে খোদিত হইয়াছে। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রস্তরস্তম্ভগুলিতে কোনও যোড়া দেখা যায় না। যেন এক একটি প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া এক একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

কালের সর্ব্বসংহারক প্রভাবে বিশেষতঃ ১৩০৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে স্তম্ভগুলি মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া গিয়াছে, দুই একটি ভূমিসাৎও হইয়াছে। সদাশয় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ঐ গুলির অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে প্রভূত যত্ন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে জায়গাটিও এখন বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, নচেৎ ইহা বনজঙ্গলে এবং তদাশ্রিত হিংস্রজন্তুতে দুর্গমকল্প হইয়া উঠিয়াছিল।

এই প্রস্তরস্তম্ভগুলি কি এবং কেনই বা একত্র এতগুলি স্তম্ভ সারি সারি দাঁড় করা হইয়াছে; ইহার কারণ এখনও কেহ সুচারুরূপে নির্ণীত করিতে পারেন নাই। খাসিয়া পাহাড়ে কোনও কোনও স্থলে বহু শিলাখণ্ড একত্র দণ্ডায়মান দেখা যায়, ঐ গুলি শ্মশানের পরিচায়ক; ইংরাজিতে "মোনোলিথ" (একশিল) বলা হয়। এই স্তম্ভগুলিও কি তাই?

---

* গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার নবম অধিবেশনে (সন ১৩১৬) পঠিত।

কিন্তু স্তম্ভে খোদিত সুচারু কারুকার্য্য দেখিলে ইহা বোধ হয় না। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শ্মশানচিহ্ন-সূচক প্রস্তররাজি থাকিবে ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়? অথচ এই-গুলি যে কোনও এক অট্টালিকার অঙ্গীভূত স্তম্ভরাজি নহে ইহা আপাতদৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয়। মিঃ গেইট্ তদীয় আসাম-ইতিহাসে অনুমানতঃ বলিয়াছেন যে, এইস্থানে একটা পণ্য-বীথিকা ছিল। আমার কিন্তু সেইরূপ বোধ হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই জায়-গাটি কাছাড় রাজগণের দরবারস্থান ছিল; পাত্রমিত্রগণের পদমর্য্যাদা অনুসারে স্তম্ভের উচ্চনীচতা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় স্তম্ভের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া রাজদর্শন ও সম্ভাষণ করিতেন।

এই স্তম্ভাবলীতে কোনও লিপি নাই, এবং যতদূর স্মরণ হয় কোনও দেবমূর্ত্তি বা নরমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখি নাই। তেজপুরের প্রাসাদস্তম্ভে * যেমন নারায়ণের অবতারদের মূর্ত্তি অঙ্কিত, সেইরূপ কিছু এখানে দেখা গেল না, অথচ তেজপুরের স্তম্ভের কারুকার্য্য অপেক্ষা ডিমাপুরের স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য যে কোনও অংশে নিকৃষ্ট তাহা বলা যাইতে পারে না।

সেই প্রকাণ্ড প্রাচীর-বেষ্টিত রাজবাড়ীর সর্ব্বত্র বেড়াইয়া দেখিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা এক প্রকার অসাধ্য মনে করিলাম। বনজঙ্গলে উহার অবশিষ্ট স্থান এখনও দুর্গম। আজ প্রায় ৪০০ বৎসর হইল (১৫৩৬ খৃঃ অব্দে) কাছাড়ী রাজগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া আহোম-আক্রমণের হাত হইতে কিয়দ্দিনের জন্য পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। এই চারিশত বৎসরের পর যাহা দেখিতে পাওয়া গেল ইহাই প্রচুর মনে করিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলাম।

ডিমাপুরের অপর দর্শনীয় বস্তু ইহার পুকুরগুলি। একটিতে গিয়া স্নান করিলাম। উহার তীরভূমি কি সুন্দর স্থান! জল অতি পরিষ্কার, বেশ টলটল করিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, অন্যূন ৪০০ বৎসর পরেও † কাছাড়ী-রাজ-খনিত এই পুষ্করিণীতে ঈদৃশ নির্ম্মল জল বর্ত্তমান রহিয়াছে! এই পুষ্করিণী শিবসাগর কিংবা আসামের অন্যান্য প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় বৃহৎ না হইলেও জলের উৎকর্ষে কোনটি হইতেই হীন হইবে না, অথচ জয়সাগর, শিবসাগর প্রভৃতি অপেক্ষা ইহা ২।৩ শতাব্দীর প্রাচীনতর।

আর যে সব পুকুর দেখিলাম, সেই সকল প্রায়ই দলঘাসে পরিপূর্ণ অথবা শুষ্কপ্রায়। প্রহর কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকগুলি পুকুর দেখিলাম, কিন্তু সকলটি যে পুষ্করিণী (বা দীর্ঘিকা) ছিল একথা বলিতে পারি না। এই বন্ধুর ভূমিতে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে গিয়া কোনও কোনও স্থান পুকুরের আকারে খাত হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হইল।

ডিমাপুর মণিপুর হইতে ১৩২ মাইল ব্যবহিত। এখান হইতে কোহিমা দিয়া শকটগমনোপ-যোগী সড়ক নির্ম্মিত হওয়ায় মণিপুর গমনের সুবিধা হইয়াছে।

---

* আসামভ্রমণ প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† পুকুরটি যে কখন খনিত হইয়াছিল কে জানে? সুতরাং চারিশত বৎসরের প্রাচীনত্বও "অন্যূন" কথা মাত্র।

একণে নামটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই ডিমাপুরের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব উপসংহৃত করিব।

সাধারণের ধারণা "হিড়িম্বাপুর" হইতেই ডিমাপুরের উৎপত্তি। কাছাড়ী-রাজগণ নিজেদের হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই কাছাড়ী-রাজ্য নাগা পর্ব্বত, মণিপুর ও ত্রিপুরারাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সকল রাজ্যের সঙ্গে মহাভারতোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সম্পর্ক ছিল। ত্রৈপুর-রাজগণ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র দ্রুহ্যর বংশজাত। নাগরাজ-কন্তা উলুপী অর্জ্জুন কর্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন। মণিপুর-নৃপতিগণ অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত। কাছাড়-রাজগণও সেইরূপ ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভ-সম্ভূত ঘটোৎকচের বংশধররূপে আপনাদিগকে পরিচিত করিয়াছিলেন।

মাইবঙ্গের যে পাষাণনির্ম্মিত প্রাসাদের বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে, তাহাতে রাজার হিড়ম্বেশ্বর উপাধি দৃষ্ট হয়। কাছাড়রাজ্য বরাবর হিড়ম্ব বা হেড়ম্ব রাজ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, এমন কি, (১৮৩০ খৃঃ অব্দে) বৃটীশ অধিকারের পরেও কয়েক বৎসর সরকারি কাগজপত্রে কাছাড় জেলার নাম হেড়ম্ব ছিল। এতদবস্থায় ডিমাপুর নামটি হিড়িম্বাপুরের অপভ্রংশ মনে করা স্বাভাবিক।

কিন্তু আসাম-ইতিহাস-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব বলেন—

"Dimapur or the town on the Dima is a modern name. We have no record of the Kachari name for the place. It was called by the Ahoms Chedimchipen (city of earth-burn-make) or the brick-built city. It was also sometimes alluded to as Chedima or the city on the Dima river. Dima or Duima was the Cachari word for any large collection of water (di water, ma great); but the Ahoms took it as the name of the river on which the Kachari capital was situated."—

Mr. Gait's History of Assam ; footnote page, 89.

কাছাড়ী ডুই ত্রিপুর তুই সংস্কৃত তোয়; মা সংস্কৃত মহা। (এস্থলেও সংস্কৃতের চিহ্ন বর্ত্তমান।) হিড়িম্বাপুরই যেন ডিমাপুরের আদিনাম বোধ হয়। আহোমগণ যে চিডিমা বলিত ইহাও 'হিড়িম্বা'এর উচ্চারণ ব্যত্যয় বোধ হয়। তৎপর "চি"টুকু নগরার্থক ভাবিয়া উহা লোপ করিয়া ফেলিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ডিমাপুরে কোনও প্রস্তরলিপি নাই। "পুর" শব্দটী যে সংস্কৃত ইহার ত অন্যথা হইবার যো নাই; তৎসহ পার্ব্বত্য শব্দের সংযোগ প্রায়শঃ দেখা যায় না, যদিও অধুনা (ইংরাজী শব্দের সঙ্গে) লায়েলপুর কেম্বেলপুর ইত্যাদি এবং মোসলমান যুগে আলিপুর, মামুদপুর প্রভৃতি নাম হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক, ডিমাপুরের নিকটস্থ নদীর বর্ত্তমান নাম ডিমা নহে, ধন্‌শ্রী।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে হিড়িম্ব (ওরফে হিড়ম্ব ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ) ও তদ্ভগিনী হিড়িম্বার কাহিনী আছে। সমাতৃক পাণ্ডবেরা জতুগৃহ-দাহকালে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণমুখে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বহু পর্য্যটন করিবার পর হিড়িম্বের

সাক্ষাৎ লাভ করেন। হিড়িম্ব রাক্ষস ছিল; তাহার সঙ্গে ভীম বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমের মূর্ত্তি দেখিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়বতী হইয়াছিল। ভ্রাতার বিনাশের পর কুন্তী ও পাণ্ডবগণের নিকট নিজের কামনা বিবৃত করিলে পুত্রজন্ম পর্য্যন্ত তাহার সহিত ভীমকে অবস্থান করিতে তাঁহারা অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তার পর যাহা আছে, আদি-পর্ব্ব ১৫৫ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইয়েছে :—

"তথেতি তৎ প্রতিজ্ঞায় হিড়িম্বা রাক্ষসী তদা।
ভীমসেনমুপাদায় সোর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥

* * *

কৃত্বা চ পরমং রূপং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
সংজল্পিতং সুমধুরং বরয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥
তথৈব বনদুর্গেষু পুষ্পিতদ্রুমসানুষু।
সরঃসু রমণীয়েষু পদ্মোৎপলযুতেষু চ ॥
নদীদ্বীপপ্রদেশেষু বৈদূর্য্যসিকতাসু চ।
সুতীর্থবনতোয়াসু তথা গিরিনদীষু চ ॥
হিমবদ্গিরিকুঞ্জেষু গুহাসু বিবিধাসু চ।
সাগরস্ত প্রদেশেষু মণিহেমচিতেষু চ ॥
পল্ললেষু চ রম্যেষু মহাশালবনেষু চ।
দেবারণ্যেষু পুণ্যেষু তথা পর্ব্বতসানুষু ॥

* * * *

রময়ন্তী তথা ভীমং তত্র তত্র মনোজবা।
প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং ভীমসেনান্মহাবলম্ ।"

ঘটোৎকচের জন্ম হইল; ইহার এই নাম সম্বন্ধে আছে—

"ঘটো হাস্তোৎকচ ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত।
অব্রবীত্তেন নামাস্ত ঘটোৎকচ ইতি স্মৃতঃ ॥"

ঘট অর্থে মস্তক, উৎকচ কেশরহিত; নীলকণ্ঠ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক, ঘটোৎকচ সহ ভীম পাণ্ডবগণের সঙ্গে আসিয়া মিলিলেন। ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের সর্ব্বপ্রথম ছেলে, কেন না তখনও দ্রৌপদীর স্বয়ংবরই হয় নাই। কুন্তী এই নিমিত্ত তাহাকে সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর তাঁহাদিগকে

"আমন্ত্র্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ প্রতস্থে উত্তরাং দিশম্ ।"

ভারতের যুদ্ধে ঘটোৎকচের বীরত্বের কীর্ত্তিকাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া মহাবনের একাংশে অবস্থিত ছিলেন। ঘটোৎকচ তাঁহা-

দিগকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন। ইহা দ্বারা এই আসাম অঞ্চলের কোনও স্থানে যে তাঁহার আবাস ছিল, ইহা খুব কষ্টতঃ কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু হিড়িম্বা ভীমকে লইয়া যে যে স্থানভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাতে প্রকৃতির লীলাভূমি এই আসাম প্রদেশেরই যেন স্থান সকলের উল্লেখ দেখা যায়। তবে যে "সাগরস্থ প্রদেশেষু" আছে ইহাতে "মনোজবা" রাক্ষসীর সাগরতট পর্য্যন্ত বিহার-ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে; তা এস্থান হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থলে মধ্যে মধ্যে বিহারার্থ গমন অসম্ভাবিত কিছুই নহে। বিশেষতঃ সাগরও তখন সুদূরবর্ত্তী ছিল না।

যাহা হউক, পৌরাণিক বিষয়ের সমধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাছাড়ীরাজগণ আহোমদের নিকট পরাভূত হইয়া ডিমাপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ডিমাপুর ছাড়িয়া দক্ষিণে পর্ব্বতরাজির মধ্যে মাহুর নদীর তীরে কাছাড়রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার নাম হইল মাইবং অর্থাৎ 'ধান্যক্ষেত্র'। ডিমাপুরের "ডিমা" যাহাই হউক "পুর" ত সংস্কৃতমূলক। এতদবস্থায় পরবর্ত্তী রাজধানীটি কেমন করিয়া কাছাড়ী ভাষায় "মাইবং" বলিয়া অভিহিত হইল, সংস্কৃতমূলক একটা সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিল না, ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ কি? বোধ হয় এই নামটা তখনই কাছাড়ী জগতে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, ইহা আর পরিবর্ত্তনসহ ছিল না। তাই "মাইবং"ই থাকিয়া গেল।*

মাইবং জায়গাটিতে এই পর্ব্বতসঙ্কুলপ্রদেশেও অনেকটা স্থান জুড়িয়া সমতল; ধান্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার কথাই। এখন ইহা আসামবেঙ্গল রেলওয়ের অন্যতম ষ্টেশন রূপে কথঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মণিপুর রোড ষ্টেশন হইতে মাইবং ষ্টেশন ৮৪ মাইল।

লামডিং হইতে মাইবং ষ্টেশনে যাইতে এই ষ্টেশনের ডিষ্টেন্ট সিগনেল দেখিয়া যখন এঞ্জিনে বংশিধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি হয়, তখন আরোহী যদি বামদিকে পর্ব্বতের গাত্রে নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে বিষ্ণুমণ্ডপের আকারে কাল একটা ঘর খুব উচ্চ একটা ভিটার উপর অবস্থিত দেখিতে পাইবেন। মাইবঙের উহাই একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। ঈদৃশ পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া প্রস্তুত কোন ঘরের কথা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে আর শুনা যায় না। প্রস্তরখণ্ড দ্বারা এইরূপ একটী ঘর তৈয়ার করা কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচায়ক মনে করিতে না পারি; কিন্তু একটা পাষাণময় পাহাড়ের অঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক গৃহাকারে পরিণত করাতে যে একটা বেশ বাহাদুরি আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একটি সঙ্গী লইয়া প্রায় ২০ মিনিট কাল উত্তর দিকে চলিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই প্রস্তরগৃহের সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণার্থ উপস্থিত হইলাম। প্রায় ৮ হাত উচ্চ দোলমঞ্চের অধোভাগের ন্যায় ভিত্তির উপর গৃহটি নির্ম্মিত। উঠিবার কোনও সিঁড়ি নাই— কোনও মৈও ছিল না। ভিত্তির এক কোণে অল্প অল্প গর্ত্ত থাকায় একটি বংশদণ্ড ভর

* কাছাড়রাজ শত্রুদমন আক্রমণকারী আহোমদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাইবঙের নাম "কীর্ত্তিপুর" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই নাম তেমন উজ্জ্বল হয় নাই।

করিয়া কোনও রূপে উপরে উঠিলাম। গৃহের পূর্ব্বদিকে এক জন গৃহত্যাগী নিম্নজাতীয় "সাধু" আশ্রয়লাভ করিয়া বাঁশ, লত্তা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা একটি পোর্টিকো বাঁধিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিলাম। ইহাতে ঘরটির সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে এবং চারিদিকে খোলা বারান্দার চলিবার ব্যাঘাতও হইয়াছে; বিশেষতঃ সাধু অন্নপাকের এবং দেহতাপের জন্য আগুন জ্বালাইয়া গৃহের পূর্ব্ব দিকের বিলক্ষণ ক্ষতি জন্মাইয়াছে। কিন্তু তথাপি সে "সাধু" এবং এক জন সাধুর আশ্রয় স্থান হইলে তত্রত্য কুলি প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসীরা গৃহটিকে অধিকতর সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে পারে, ইহা মনে করিয়া সাধুকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাই; বরং তদীয় সাধুত্বের মর্য্যাদাকল্পে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহার আশীর্ব্বচন রাশি রাশি লাভ করিলাম।

ঘরের চারিদিকে বারান্দা ২ হাত আন্দাজ প্রশস্ত; অতএব চারিদিক্ বেশ বেড়াইয়া দেখা যায়। গৃহটি সম্পূর্ণ নিরেট হওয়ায় ইহার দ্বার নাই, তবে চারিদিকেরই দেওয়ালের মধ্যস্থলে এক একটি খোপ আছে। উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের খোপে কিছু নাই। কিন্তু পশ্চিম দিকের খোপটিতে কিছু অঙ্কিত আছে, তাহা কি বুঝা গেল না। এই চিহ্নটি তরবারির চিহ্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কেন না কাছাড়ের রণচণ্ডী, আহোমদের 'হেং দাং' তথা শিবাজীর 'ভবানী'র ন্যায়, একখানি তরবারির নাম। সম্প্রতি এই তরবারি খানিরও অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। এই পশ্চিম দিক্ই ট্রেইন হইতে দেখা যায়।

এতৎসহ গৃহের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। [১নং চিত্র দ্রষ্টব্য।] গৃহটী দৈর্ঘ্যে ১২ হাত, প্রস্থে ৭ হাত, চালের প্রস্থ প্রায় ৪ হাত; অর্থাৎ দো-চালা ৭×১২ মণ্ডপ তৈয়ার করিতে এতদঞ্চলে ঘরামিরা যে "বাট" দিয়া থাকে, সেই রূপই। উচ্চতা বড় কম, দেওয়ালের মধ্য ভাগের উচ্চতা বড় জোর ৩ হাত মাত্র। গৃহের গাত্রে কোনও রূপ লতাপাতাদি অঙ্কিত হয় নাই; ইহা আশ্চর্য্যেরই বিষয়, কেন না এতাদৃশ স্থলে এইরূপ সাদাসিধা কাজ বড় দেখা যায় না।

এই পশ্চিমের দেওয়ালের খোপের দক্ষিণ দিকে প্রস্তরগৃহের গাত্রে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় খোদিত লিপি আছে। গৃহের পাথর "বেলে" গোচের হওয়ায় লিপি অনেক স্থলে অস্পষ্ট এবং কোনও স্থলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অক্ষরের নমুনা প্রদর্শনার্থ ইহার যতটা নকল করিতে পারা গিয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল—[২নং চিত্র দ্রষ্টব্য।]

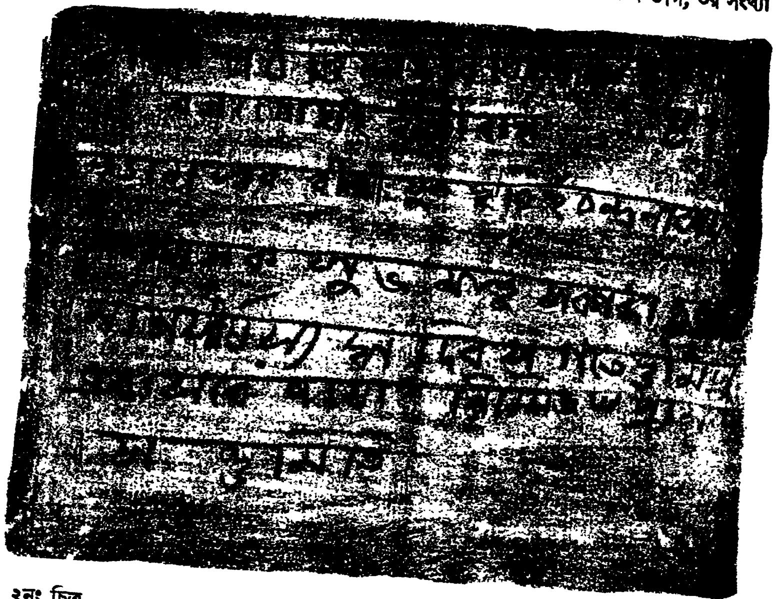
শুদ্ধপাঠ এই :—"শ্রীশ্রীরণচণ্ডীপদারবিন্দে মধুকরস্য বগা গোহাই শ্রীশ্রীরা * * * হিড়ম্বেশ্বরশ্রীশ্রীযুক্তহরিশ্চন্দ্রনারায়ণনৃপস্য শকে শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৪৩* মার্গশীর্ষস্য দ্বাদশদিবস গতে ভূমিপুত্র-বাসরে পাষাণনির্ম্মিতঃ প্রাসাদঃ সম্পূর্ণ ইতি"।

মূলে প্রাসাদ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে; ইহাতে সূচিত হয় যে, ইহা কোনও পণ্ডিতের রচনা নহে। বর্ণাশুদ্ধির দায়িত্বভার খোদকের স্কন্ধে চাপান যাইতে পারে, কিন্তু "পাষাণনির্ম্মিতং

* এই অঙ্কটিতে ৪ স্থলে ৮ হইবে—পরিশিষ্ট দেখুন। সা-প-প-স।



১নং চিত্র মাইবঙের প্রস্তর-গৃহ ১৮৬ পৃষ্ঠা



২নং চিত্র

প্রস্তর-গৃহের শিলালিপি

প্রাসাদং সম্পূর্ণমিতি" এইরূপ একটা অশুদ্ধি কেবল লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তবে "শ্রীশ্রীরণচণ্ডীপদারবিন্দেমধুকরস্ত" ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষার ন্যায় সর্ব্বজনবিদিত বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। "ভূমিপুত্রবাসরে" কিছু পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু ইহাও লেখকের জাতপত্রাদি হইতে শ্রুত শব্দবিশেষ হইতে পারে।

তবে কাছাড়রাজ্য পণ্ডিতশূন্য ছিল, একথা বলিতে পারা যায় না। কাছাড়ের দণ্ডবিধি একখানি পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ইহা গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাকর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে; এই দণ্ডবিধি বঙ্গানুবাদসমন্বিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত।

"বর্গা গোহাই" এই শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া এই স্থানে যে আহোমরাজগণের অধিকারের ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের পাষাণ-নির্ম্মিত "প্রাসাদ" দর্শনপূর্ব্বক ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে কি কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য চলিলাম। ভাল সঙ্গী জুটাইতে না পারায় অসুবিধা হইতে লাগিল। ভগ্ন ও বিধ্বস্ত প্রাচীরের ইষ্টক অনেকগুলি রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বেই দেখা যায়। রেলওয়ে তৈয়ার হইবার সময়ে বোধ হয় এই সকল ইষ্টক কণ্ট্রাক্টারদের অনেক কাজে লাগিয়াছিল। প্রস্তরমূর্ত্তি অনেকটী পাওয়া গিয়াছিল, ঐগুলি কিছু স্থানান্তরিত হইয়াছে, আবার কিছু বোধ হয় বেশ সদ্ব্যবহারেই লাগিয়াছে; রাস্তার আস্তরণের নিমিত্ত চূর্ণিত হইয়া ধূলি-সাযুজ্য লাভ করিয়াছে।

মাইবং ষ্টেশনের সম্মুখে একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের গঠনে ইহা হাতী বা গণ্ডারকল্প। তবে আকর্ণবিশ্রান্ত করালবদন দৃষ্টে এই মাত্র সূচিত হয়, বুঝি বা ইহা শার্দ্দূলের প্রতিমূর্ত্তি। ষ্টেশন হইতে মাইল খানিক দক্ষিণে একটা গাঁজার দোকান আছে, রেলওয়ে রাস্তারই নিতান্ত সন্নিকটে উহা অবস্থিত; ইহার নিকটে ২।৩টি প্রস্তরমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে।* রেলের যাত্রীরা তাহা অনায়াসে দেখিতে পায়েন। মূর্ত্তিগুলি মানুষের তাহা বেশ বোঝা যায়। তবে কিরূপ মানুষের তাহা বোধগম্য হয় না। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি হইতে পারে; আবার কোনও রূপ দেবমূর্ত্তিও যে না হইতে পারে তাহাও বলা যায় না। যাহাই হউক, এই দণ্ডায়মান মূর্ত্তি-গুলির সৌষ্ঠব সম্বন্ধে এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যতটা লম্বা নাভি হইতে পা পর্য্যন্ত ততটা নয়; অর্থাৎ নীচের দিকে খর্ব্বতা দেখা যায়।† ইহা স্বভাববিরুদ্ধ। তবে এইরূপ অসৌষ্ঠব এতদপেক্ষা সভ্যতর স্থানেও দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলিতে ভাস্কর্য্য চাতুর্য্য নেহাৎ মন্দ নহে।

---

* সম্প্রতি এই সকল মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে।

† বড় মূর্ত্তিটির মাপ লিয়াছিলাম। মাথার চূড়া হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৯ ইঞ্চি এবং নাভিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৫ ইঞ্চি। [এই মূর্ত্তিটির চিত্র সম্প্রতি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রের যে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ভ্রমতঃ ইহাকে "বুদ্ধমূর্ত্তি" বলা হইয়াছে।—সা-প-প।]

সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অনেকটা জায়গা বেড়াইয়া দেখা গেল। সঙ্গে একটী কাছাড়ী-লোক ছিল, সে বড় ভাল করিয়া কিছু দেখাইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে উচ্চ ভিটা এবং শুষ্ক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া গেল। পশ্চিম দিকে এক স্থলে একটী দেবমন্দিরের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। তৎপার্শ্বে কাছাকাছি দুইটি গাছ দেখা গেল, যাহা এই পর্ব্বতের অন্যত্র দেখা যায় না। এই গাছের ইংরেজী নাম cycad বৈজ্ঞানিক নাম "cycas revoluta"। গৌহাটি সহরের টেলিগ্রাফ আফিসের উত্তর ভাগে সড়কের পার্শ্বে এইরূপ দুইটি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গী কাছাড়ী উহার নাম "দীপগাচ" বলিল। ইহার এই নাম হইবার কারণ কি, বুঝিলাম না; কাছাড়ীটিও উহা বলিতে পারিল না। তবে ইহার ফুল ঠিক দীপশিখার ন্যায় দেখা যায়, ইহাতেই যদি এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহার এই স্বদেশী নাম হইয়া থাকে। কাছাড়ীর কথা হইতে জানা গেল যে, এই দেবস্থলীতে দীপগাছের কাছে নরবলি পর্য্যন্ত হইত। সুতরাং বলিতে হইবে গাছের সঙ্গে দেবপূজার সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্যের বিষয় এই যে রণচণ্ডীর "প্রাসাদ" এই স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী অথচ এই নর-বলির স্থান কাছাড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাসবাটিকা হইতে ক্রোশ পরিমিত ব্যবধানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল!

উপসংহারে কাছাড়-রাজগণের বাস্ত-বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাভারতে উল্লিখিত হিড়িম্ব হিড়িম্বার এবং ঘটোৎকচের আবাসভূমি বিষয়ে আমার যাহা অনুমান তাহা ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মণিচরণ বর্ম্মা নামে জনৈক শিক্ষিত কাছাড়ী আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"যে দেশে ভীমসেনের সহিত হিড়িম্বার দেখা হইয়াছিল সেই দেশ প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী কোনও এক স্থানে ছিল। ঐ হৈড়ম্ব রাজ্যে ঘটোৎকচ রাজত্ব করেন নাই। ভগবতী ৵ হেড়ম্বেশ্বরীর শাপে সেই রাজপুরী পৃথিবী গ্রাস করিয়াছেন। মহাবীর ঘটোৎকচ আসামের অন্তর্গত দরং রাজ্য নিজ বাহুবলে অধিকার করিয়া লইয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দরং হইতে গিয়াই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। গৌহাটী অঞ্চলের হাতীর চেয়ে দরং অঞ্চলের হাতী বৃহৎ ও বলবান্, তাই ভগদত্তের হাতীকে ঘটোৎকচের হাতীর নিকট পরাজয় পাইতে হইয়াছিল। ঘটোৎকচ হইতে উদয় ভীমনারায়ণ পর্য্যন্ত ১৮ জন রাজা দরঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক দিন ভগবতী স্বপ্নাদেশ করাতে ঘটোৎকচ-বংশের অষ্টাদশ রাজা উদয় ভীমনারায়ণ বিশ্বনাথ-ঘাটে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসিয়া প্রথমতঃ শিলাঘাটে রাজধানী স্থাপন করেন, তথা হইতে তদীয় বংশধরগণ আসামের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কাছাড়রাজবংশধরগণ এক সময়ে সদিয়া অঞ্চলেও রাজত্ব করিয়া ছিলেন, বোধ হইতেছে; কারণ আজ পর্য্যন্ত সেই বিখ্যাতা দেবী কেঁচাইখাতির পূজা আমাদিগকে দিতে হইতেছে।"

এই গেল ঐতিহাসিকযুগের পূর্ব্বের কথা। আহোমদের বুরঞ্জি * হইতে কাছাড়ীদের বিবরণ

---

* 'বুরঞ্জি' অর্থ ইতিবৃত্ত। আহোম 'বু' অর্থ 'অজ্ঞ', 'রন্', শিক্ষা দেওয়া 'জি', ভাণ্ডার। অর্থাৎ যে ভাণ্ডার হইতে অজ্ঞেরা শিক্ষা লাভ করে।

যখন আমরা জানিতে পারিতেছি, তখন ডিমাপুরে তাহাদের রাজধানী অবস্থিত। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উহারা ডিমাপুর হইতে আহোমগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থানেও আহোমেরা ইহাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই।

১৭০৬।১৭০৮ খৃষ্টাব্দে আহোম-আকবর রুদ্রসিংহের সময় মাইবং আহোমগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; তখন কাছাড়রাজ পলাইয়া খাসপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই খাসপুর বর্ত্তমান বৃটীশ রাজধানী শিলচর সহর হইতে ১৩ মাইল উত্তর দিকে মধুরা নদীর তীরে অবস্থিত। * কিন্তু তখনও ইহা স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হয় নাই, কেন না ১৬৪৩ শকে অর্থাৎ ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মাইবঙ্গে রণচণ্ডীর পাষাণনির্ম্মিত প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। খাসপুরকে কাছাড়ীরা টালিগ্রামও বলে। এই খাসপুর শিবের বন্দ মৌজার অন্তর্ভুক্ত; টালিগ্রাম শিবের বন্দের সংলগ্ন স্থান।

এই খাসপুরেও কাছাড়ের শেষ ভূপতি আমরণ তিষ্ঠিতে পারেন নাই। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয়েরা কাছাড়রাজ্য আক্রমণের উপক্রম করিলে কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইয়া নিরাপদ হন এবং খাসপুর চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃটীশ সীমান্তের অতিশয় সন্নিকৃষ্ট হরিটিকর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই ১৮৩০ অব্দে মণিপুরীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র নিহত হন, এবং তদীয় শেষ বাসস্থান ভস্মীভূত হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অভাবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাছাড়রাজ্য অধিকৃত হয়। কাছাড়ের শেষ রাজধানী হরিটিকর আসামবেঙ্গল রেলওয়ের বদরপুর ষ্টেশনের ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত। সেই স্থানের টিলাটিকে এখনও লোকে 'রাজার টিলা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। †

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* খাসপুরে কাছাড়ের শেষ তিন রাজার 'পাট' অর্থাৎ স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতে অনেকগুলি মন্দির এখনও পরিদৃষ্ট হয়। ঐ গুলির অধিকাংশই অল্লাধিক ভগ্নাবস্থায় অবস্থিত।

† এস্থানে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই, সামান্ত দুই একটী পুকুর আছে। টিলার উপরি ভাগে ঘাসের স্তরের নিম্নে এখনও খুঁড়িলে রাজার ধানের গোলার ভস্মাবশেষ পোড়া চাউল পাওয়া যায়।

আসাম-ভ্রমণ দ্বিতীয় প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধ প্রায় এক বৎসর হইল লিখিত হইয়া গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার নবম অধিবেশনে (মাঘ ১৩১৬) পঠিত হইয়াছিল। ইহার পর সম্প্রতি মাইবং সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মাইবঙ্গের পাষাণ-নির্ম্মিত গৃহের নির্ম্মাণ তারিখ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

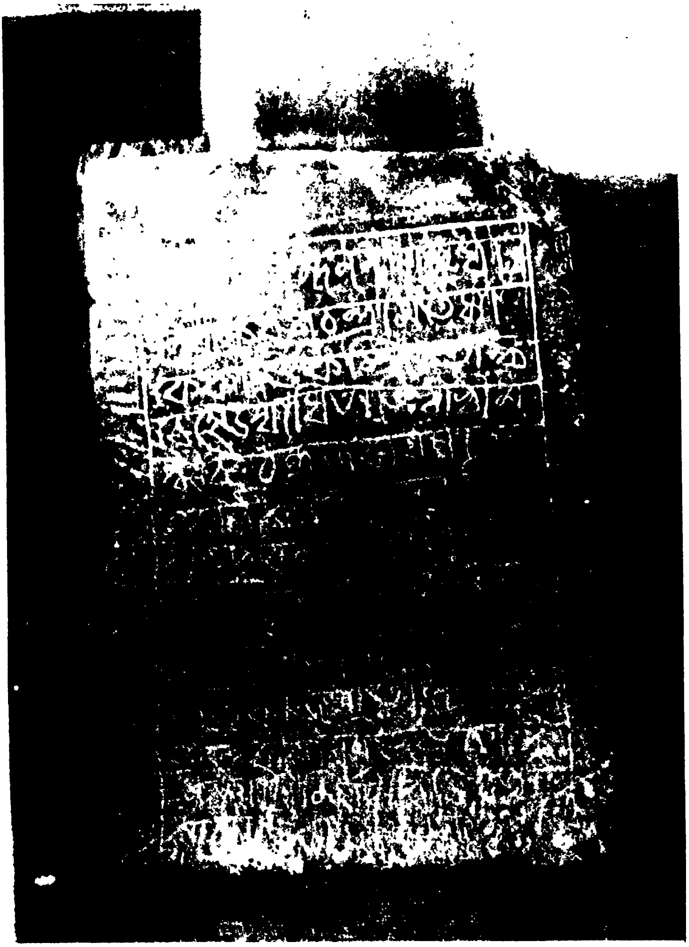


আমি নিজে মাইবং গিয়া প্রস্তরগৃহের পার্শ্ব-লিপি পাঠ করিয়াছিলাম, একথা প্রবন্ধে বলিয়াছি। তখন শকটিকে '১৬৪৩'ই পড়িয়াছিলাম। ইহাতে '৪' এই অঙ্কটি এমন ভাবে লিখিত যে ইহাকে ৮ পড়াই উচিত ছিল। * তথাপি কেন ৪৩ পড়িয়াছিলাম, ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

'আসামের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত ই-এ-গেইট্ মহোদয় তদীয় Report on the Progress of Historical researches in Assain নামক পুস্তিকায় (৫ পৃষ্ঠে) এই লিপির শক '১৬৮৩' বলিয়া লিখিয়া ছিলেন। ঐ রিপোর্ট তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। তৎপর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আসাম-ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে তিনি প্রস্তর-গৃহ-নির্ম্মাণ তারিখ, ১৭২১ খৃষ্টাব্দ (অর্থাৎ ১৬৪৩ শক) লিখিয়াছেন [যদিও তদীয় গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠে শকের অঙ্কটী অশুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে] এবং কাছাড়রাজবংশের তালিকায় (৩৬০পৃ) দুই জন হরিশ্চন্দ্র দেখাইয়াছেন। অতএব গেইট্ সাহেবের এই শেষবারের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে করিয়াই শকের অঙ্কটিকে ১৬৪৩ পড়িয়াছিলাম। সম্প্রতি এতদ্বিষয়ক পুনরালোচনা উপলক্ষে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিবরণ" নামক গ্রন্থপ্রণেতা শিলচরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ধর মহাশয় আমাকে খাসপুরের শিলালিপি সম্বন্ধে বিবরণী প্রদান করিয়া জানাইয়াছেন যে, ১৬৯৩ শকে

---

* মাইবঙ্গের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শকের অঙ্কের একটি ছাপ তুলিয়া দিয়াছেন, উপরে তাহা প্রদত্ত হইল।



৩নং চিত্র খাসপুরের শিলালিপি ১৯১ পৃষ্ঠা

খোদিত এই শিলালিপির * উল্লিখিত হরিশ্চন্দ্র এবং মাইবঙ্গের লিপিতে উল্লিখিত হরিশ্চন্দ্র একই ব্যক্তি ; এবং মাইবঙ্গের লিপির শক ১৬৪৩ না হইয়া ১৬৮৩ হইবে। তিনি বলেন যে, শিলচরের অনেকেই ঐ মাইবঙ্গের লিপি পড়িয়াছেন, সকলেই ৪ না পড়িয়া ৮ পড়িয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলনার্থ কাছাড়রাজবংশের যে তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ একজন মাত্র পাওয়া যায়। অপিচ হাণ্টার সাহেব তৎসঙ্কলিত Statistical Accounts of Assam Vol. II (পৃঃ ৪০৩-৪০৪) কাছাড়রাজগণের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে শেষ আটজন রাজার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এই † যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজগণের নাম অবিশ্বাস্য হইলেও ইঁহারা যে যথার্থই রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না ; অথচ তাঁহার তালিকায়ও একজন হরিশ্চন্দ্র মাত্র দেখা যায়। ১৬৮৩ শকে মাইবঙ্গে পাষাণগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দশবৎসর অন্তে এই হরিশ্চন্দ্রই চিরকালের জন্য মাইবং পরিত্যাগ করিয়া খাসপুরে নিজ নামে এক রাজপাট স্থাপন করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভাব্য ঘটনা। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই হরিশ্চন্দ্র ১৬৪৩ হইতে ১৬৯৩ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন, এই কথা স্বীকার করি না কেন ? এই সমাধানের একটা বিষম অন্তরায় এই যে, ১৬৫৮ শকে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র নারায়ণের সনন্দ দুই খানি পাওয়া গিয়াছে‡, এবং এই জন্যই গেইট্ সাহেব বাধ্য হইয়া দুই হরিশ্চন্দ্র কল্পনা করিয়াছিলেন। কাছাড় রাজবংশাবলীতে হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী রাজা ছিলেন, ইহাই দেখা যায়। অতএব মাইবঙ্গের খোদিত লিপি যে ১৬৮৩ শকাব্দের, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* খাসপুরের ভগ্নাবশেষ হইতে এক হাত দীর্ঘ তিনপোয়া প্রস্থ এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া নিয়া শিলচরে কলেক্টরিতে রাখা হইয়াছে। তাহাতে যে লিপি খোদিত আছে তাহার বিশুদ্ধ পাঠ এই :—"শ্রীনন্দনন্দনাজ্ঞয়া নেত্রাঙ্করসচন্দ্রমিতে শাকে কার্ত্তিকস্থিতে ভাস্করে হেড়ম্বাধিপতিশ্রীশ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্রনারায়ণাভ্যুদয়িনি রাষ্ট্রে তদন্তর্গতখাসপুরনামনগরে ৺তৎপাদপঙ্কজমকরন্দলোলুপমানাশ্রীলশ্রীমতীরাজমাতৃলক্ষ্মী প্রভাদেবীসাধিতেষ্টকাদিনিচয়নির্ম্মিতবিচিত্র প্রাসাদাভিরামঃ।" এই লিপিযুক্ত শিলাখণ্ডের চিত্র প্রদত্ত হইল। [৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য।]

† "The last eight of these names are certainly correct and represent real personages." p. 304.

‡ এই সনন্দ দুইখানি হেড়ম্বরাজ্যের মন্ত্রিবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ;, ঐ গুলি তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ চাঁদলস্করের পুত্র মণিরামকে উজিরীপদ প্রদান উপলক্ষে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এবং খাসপুরের কাছাড়রাজগণের কীর্ত্তিপরিচায়ক বিবরণী ও চিত্রাদি অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" এবং গৌহাটি বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভা হইতে প্রকাশিত "হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। [সম্প্রতি "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন" পত্রে ইংরেজীতে লিখিত খাসপুর-ভ্রমণকাহিনী সচিত্র প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও দ্রষ্টব্য।]



ময়ূরভঞ্জের সূর্য্যমূর্ত্তি ১৯৬ পৃষ্ঠা



চুড় সূর্য্যমূ পৃ

চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি

আজ আমি আপনাদের নিকট যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিতেছি, তাহার আলোচ্যবিষয় চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি। আমি সেদিন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চুঁচুড়ার ৺ষাঁড়েশ্বরের মন্দির দেখাইতে আনিয়াছিলাম। যখন ৺ষাঁড়েশ্বরতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, সমস্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ। যাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরের কিছুই দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিলাম—তিনি আমাকে মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্দির সম্বন্ধে কতকগুলি জিনিষও দেখিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে যখন কিছুই দেখাইতে পারিলাম না, তখন তিনি বলিলেন, "চুঁচুড়ায় আর কোথায়ও কি কোন দেবতার মূর্ত্তি বা মন্দির নাই?" এই বলিয়া তিনি এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী বালক বলিল—"মহাশয়! ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি দেখ্‌বেন?" আমরা ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। একটী সঙ্কীর্ণ স্থানের এক কোণে একটী অশ্বত্থবৃক্ষ দণ্ডায়মান। সেই বৃক্ষের গাত্র ভেদ করিয়া একটী প্রস্তরমূর্ত্তি তথায় বিরাজিত ছিল। বালক সেই মূর্ত্তিকে ষষ্ঠীর মূর্ত্তি বলিয়া ইঙ্গিত করিল। আমরা তাহাতে কিন্তু ষষ্ঠীর 'ষষ্ঠীত্ব' কিছুই দেখিলাম না। বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলাম যে, মূর্ত্তিটী স্ত্রীমূর্ত্তিই নহে—পুরুষমূর্ত্তিকে স্থানীয় লোকেরা কি জানি কেন ষষ্ঠীরূপে খাড়া করিয়াছেন, কিন্তু যখন ভাবিলাম যে মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত যত বুদ্ধমূর্ত্তি যখন শিব হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তখন যে আমাদের এই পুরুষমূর্ত্তিরও এ দশা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সঙ্গে আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্রকে আনিয়াছিলাম। তিনি আগ্রহ-সহকারে মূর্ত্তিটীর দুইখানি ফটো তুলিয়া লইলেন। ফটো লইয়া আমরা চুঁচুড়া হইতে বিদার গ্রহণ করিলাম। তারপর নানা উপায়ে মূর্ত্তিটীর পরিচয় স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি মূর্ত্তিটিকে যেরূপ বুঝিয়াছি, অদ্য আপনাদিগের নিকট তাহাই নিবেদন করিব।

মূর্ত্তির পরিচয়

মূর্ত্তিটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মূর্ত্তির হস্তে অভয়-মুদ্রা পরিশোভিত। শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বামহস্তের অঙ্গুলী সকল প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধীকৃত করিলেই অভয়মুদ্রা হয়। "ঊর্দ্ধীকৃত-বামহস্তে প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা।" শ্যামারহস্যে লিখিত আছে, কোন ব্যক্তিকে অভয়দান করিবার সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, সেইরূপ হস্ত করিলেই অভয়মুদ্রা হইবে। যেমন, 'বরদাভয়মুদ্রাযতবরদাভয়বৎ কুরু।' এই মূর্ত্তির মুদ্রাও অভয়মুদ্রা। তারপর মূর্ত্তিটীর মস্তক মাণিক্যবিশিষ্ট। কর্ণ কেয়ূরহারাদি কুণ্ডলযুক্ত। বিগ্রহটী ত্রিনেত্র—তবে উপরের চক্ষুটী কিছু অস্পষ্ট। দুই হাতের উপর দুইটী

পদ্ম। পদযুগল উপানৎ পরিমণ্ডিত। এই মূর্ত্তির সহিত সূর্য্যমূর্ত্তির সম্যক্ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। সূর্য্যমূর্ত্তির ধ্যানে দেখিতে পাই—

"রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধূককান্তিং বিলসত্ত্রিনেত্রম্।"

অন্যত্র—"রক্তাম্বুজাসনসগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিররুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

এতদ্ভিন্ন মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যদেবের মূর্ত্তির কথা আছে। আমাদের দেশে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ স-সহচর বা সহচরহীন অনেক সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। এই সূর্য্যমূর্ত্তিটীর পাদনিম্নে সপ্তাশ্ব বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়পার্শ্বে পার্শ্বচর। তন্মধ্যে একজন অসিচর্ম্মধারী। মূর্ত্তিটী নিরীক্ষণ করিলে সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এই মূর্ত্তিটী দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত পরিমিত ও প্রস্থে এক হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক। এতদ্ভিন্ন মূর্ত্তির তিনদিকে দ্বাদশাদিত্য। দুইজন পার্শ্বচরের দুইধারে দুইটী সহচর। ইহাই আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তির পরিচয়।

সম্প্রতি সেরপুরের অন্তর্গত কৌশল্যাতলায় কয়েকটী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী মূর্ত্তির সহিত আমাদের এই বর্ত্তমান মূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রঙ্গপুরের অন্যতম ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "সেরপুরের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের ৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"পুরুষমূর্ত্তি, দ্বিভুজ, দুই হাতে দুইটী পদ্ম; পদযুগলের মধ্যস্থলে অতি ক্ষুদ্র একটী শায়িত মূর্ত্তির উপর একটী পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান; উভয়পার্শ্বে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি আড়ভাবে অবস্থিত এবং দুইটী পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সর্ব্বনিম্নে কতকগুলি বাধিত অশ্ব। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয় মূর্ত্তিটীকে সূর্য্যমূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। উচ্চতা প্রায় ২৷৷০ হস্ত।"

জানি না কি ক্ষণে কাহাকর্ত্তৃক এই সূর্য্যদেব ষষ্ঠীদেবী নামে প্রথমে প্রচারিত হইয়া বালক-বালিকার রক্ষয়িত্রী ও লালয়িত্রীরূপে এবং পুত্রমুখদর্শনবিধুরা বন্ধ্যারমণীর আশাস্থল হইয়া চুঁচুড়ায় ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। জানি না ষষ্ঠীদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি না? ধর্ম্মগতপ্রাণ হিন্দুরমণীর হস্তের সিন্দূর ললাটে ধারণ করিয়া তপনদেবের পুরুষত্ব লোপ হইয়াছে কি না? তবে আমাদিগের বিশ্বাস যদি আপনারা এই মূর্ত্তিটীকে সূর্য্যদেব বলিয়া মনে করেন, তবে শাস্ত্রনির্দ্ধারিত উপায়ে ইহার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন।

মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ

মূর্ত্তিটী দেখিয়া ইহা কোন্ সময়ের তাহা স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। তবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনাদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কখন কোন্ সময়ে কেমন করিয়া এই

বিগ্রহ আপনার মন্দির ছাড়িয়া, পূজোপচার পরিত্যাগ করিয়া, চুঁচুড়ার এই গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছেন। চুঁচুড়ার সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত বংশ তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন—তখন গৌড়ে হিন্দুশাসন চলিতেছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী বা "উজীর মমালক্" ছিলেন। গৌড়েশ্বরের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এক পরম-রূপবতী কন্যা নিত্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। একদিন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পূজানিরতা রহিয়াছেন, এমন সময় বলভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিনি পুরন্দরের নিকট কন্যাপ্রার্থনা করেন এবং পুরন্দরও তাঁহাকে জামাতৃরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিবাহান্তে বলভদ্র ক্রমশঃ সূর্য্যোপাসক হইয়া পড়িলেন। এই বলভদ্রের বংশপরম্পরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য-মূর্ত্তির কিছুকাল পূজোপাসনা চলিয়া আসিতেছিল। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্যামরাম মন্ত্রান্তরে দীক্ষিত হন। তদবধি, তাঁহাদিগের গৃহস্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি অপূজিত থাকে। এই শ্যামরাম বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে "বাবু" উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময় তাঁহার নাম প্রতিপত্তি যথেষ্টই হইয়াছিল। ইনি সাধারণের জন্য দুইটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শ্যামরাম বাবুর বাটীতে কোন এক বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে সূর্য্যমূর্ত্তিটী স্থানান্তরিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঘাটে স্থানলাভ করে। আমার বিশ্বাস, এই "ঘাটেপড়া" ঠাকুরটাকে কেহ কি ভাবিয়া পূজোপচার প্রদানের জন্য 'ষষ্ঠী' নাম দিয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তদবধি বোধ হয় বলভদ্রের সাধের তপনদেবের গাছতলায়ই সার হইয়াছে। আমি যে অনুমান করিয়াছি, সে অনুমান ঠিক কি না বলিতে পারি না। এই মূর্ত্তিই যে বলভদ্র-প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঘটনা-সমাবেশে যাহা সম্ভব তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমি এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ করিয়াছি। *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রবন্ধ-লেখক চুঁচুড়ায় রক্ষিত প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া বাস্তবিক আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য মূর্ত্তিটীর শিল্প-নৈপুণ্য ও গঠনাদির পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার সময়নিরূপণকল্পে যে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে, বাস্তবিক সেনরাজগণের সময়েও রাজপরিবারের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। সেনরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাকে পরম সৌর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, এ অবস্থায়

* সূর্য্যপূজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—প্রবন্ধ-লেখক।

গৌড়েশ্বরের অমাত্য বলভদ্রসোমের পূর্ব্বপুরুষ যে একজন পরম সৌর ছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে।

শুনিলাম, চুঁচুড়ার আলোচ্য সূর্য্যমূর্ত্তিটীকে অনেকে সূর্য্য বলিতে কুণ্ঠিত। মূর্ত্তিটী যে মিত্রদেবের, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবন্ধ-লেখক যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মুর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে। ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রাহ্মপর্ব্বে ও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রে মিত্রমূর্ত্তির পূর্ণপরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহুদিন হইল, ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্বপ্রসঙ্গে তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।* এ স্থলে সাধারণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য "বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প" হইতে মিত্রপরিচায়ক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল—

"একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্। হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্চুকশ্চর্ম্মবক্ষসম্॥
অকুঞ্চিতসুকেশস্ত প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্। কেশবেশসমাযুক্তং স্বর্ণরত্নবিভূষিতম্॥
নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে বামে রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা। সর্ব্বাভরণসংযুক্তা কেশহারসমুজ্জ্বলা॥
এবমুক্তরথস্তস্য মকরধ্বজ ইষ্যতে। মুকুটশ্চাপি দাতব্যমণ্ডৎ সর্ব্বং সমণ্ডলম্॥
একবক্ত্রাঙ্কিতো দণ্ডো স্কন্দস্তেজোকরাম্বুজম্। কৃত্বাতু স্থাপয়েৎ পূর্ব্বং পুরুষাকৃতরূপিণৌ॥
হয়ারূঢ়স্ত কুর্ব্বীত পদ্মস্থং বাচনামকম্। স দিব্যমানবপুষং সর্ব্বলোকৈকদীপকম্॥
জাতিহিঙ্গুল্যসংস্থাপ্য কারয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্। চতুর্ব্বাহুর্দ্বিহস্তো বা রেখামণিবিভাজনা॥
দ্বিহস্তস্থসরোজন্ম সবলাশ্বরথস্থিতঃ। দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌ চ খড়্গিনৌ॥"

(বিশ্বকর্ম্মীয়-শিল্প)

'(মিত্রদেব) সপ্তাশ্ব ও সারথিযুক্ত একচক্র মহারথে অধিষ্ঠিত। দুই হস্তে পদ্ম এবং বক্ষে কঞ্চুক ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কেশগুলি অকুঞ্চিত ও প্রভামণ্ডলমণ্ডিত। কেশ সুবেশযুক্ত ও স্বর্ণ-রত্ন-বিভূষিত। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে নিক্ষুভা ও বামপার্শ্বে রাজ্ঞী। উভয়ে সর্ব্বাভরণসংযুক্তা ও কেশহারসমুজ্জ্বলা। উক্ত রথ মকরধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত। সকলেরই মণ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। মিত্রদেবের সম্মুখভাগে পুরুষরূপী দুইটী মূর্ত্তি করিতে হইবে, তন্মধ্যে দণ্ড বা যমের একবক্ত্র এবং স্কন্দ তেজোকরাম্বুজ হইবেন। দিব্য দেহধারী ও সর্ব্বলোকের আলোকদানকারী বাচকে হয়ারূঢ় পদ্মের উপর স্থাপন করিবে। সূর্য্যের মণ্ডল জাতি ও হিঙ্গুলবর্ণবৎ হইবে। চতুর্ভুজই হউক বা দ্বিভুজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামণি দ্বারা সুশোভিত, দ্বিহস্তোপরি পদ্ম ও সবলাশ্বরথে স্থাপন করিবে। দণ্ড ও পিঙ্গলনামক খড়্গধারী দুইটী দ্বারপালকেও রাখিতে হইবে।'

উপরের মূর্ত্তি-পরিচয় হইতে মিত্রদেব ও তাঁহার অনুষঙ্গিগণের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। সাধারণের কৌতুহল-পরিতৃপ্তির জন্য চুঁচুড়ার মুর্ত্তির পার্শ্বে ময়ূরভঞ্জের দুর্গম জঙ্গল হইতে আবিষ্কৃত মিত্রদেবের চিত্রও প্রদর্শিত হইল।

পত্রিকা-সম্পাদক।

* Archæological Survey of Mayurabhanja, VOl. 1. p. xv–xvi.

রাজা দত্তখাস- কে?

বঙ্গ হইতে সেনরাজবংশের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হইলে এবং সর্ব্বত্র মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, গৌড়াধিপ সেনরাজগণের প্রবর্ত্তিত কুলবিধিরক্ষায় অনেক কুলীনসন্তানই অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের আচার ব্যবহার ও সামাজিক সম্বন্ধ বল্লালী কুল-প্রথা অনুসারে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য মনে করিয়া পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ পূর্ব্ব নিয়মগুলি অনেকটা শিথিল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে যাঁহারা বিশেষভাবে দোষী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কুলীনসন্তান হইলেও কেহ বংশজ, কেহ শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়, কেহ বা নিতান্ত হেয় কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় বন্দ্যবংশে জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন, চট্টবংশে বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন, পূতিতুণ্ডবংশে গোবর্দ্ধন, ঘোষালবংশে শির, গাঙ্গুলীবংশে শিশু, কুন্দবংশে রোষাকর, কাঞ্জিবংশে কানু ও কুতুহল এবং মুখুটিবংশে উৎসাহ ও গরুড় অর্থাৎ বন্দ্যাদি অষ্ট গ্রামীর মধ্যে উক্ত উনিশজন মাত্র 'মুখ্যকুলীন' এবং মাধবাচার্য্য মহিন্তা, শরণি গুড়, অতিরূপ পিপ্পলী, রুদ্র চৌৎখণ্ডী, চক্রপাণি বা চাঁকু পারিহাল, চক্রপাণি গড়গড়ী, ঠোট রায়ী, জনার্দ্দন ডিংসাই, ধর্ম্ম কেশরকুনী, জগৎ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পীতমুণ্ডী, গুয়ী, কুলভী ও মুণ্ডাকর দীর্ঘাঙ্গী এই চৌদ্দগ্রামীর চৌদ্দজন ব্যক্তি 'গৌণকুলীন' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে গৌণ-কুলীন এবং মুখ্যকুলীন উভয়ের মধ্যেই আদান-প্রদান চলিত। আমরা ধ্রুবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বল্লালী কুলীন উৎসাহ মুখুটীর পুত্র আহিত মাধবাচার্য্য মহিন্তা ও শরণি গুড়ের সহিত, (১) বহুরূপ চট্ট গুয়ী কুলভীর সহিত,(২) মকরন্দ বন্দ্য গর্ব্বেশ্বর রায়ীর সহিত,(৩) বাঙ্গাল চট্ট শূলপাণি পিপ্পলীর সহিত,(৪) মহেশ্বর বন্দ্য অতিরূপ পিপ্পলী ও রুদ্র-

(১) "আহিতস্য পরিবর্ত্ত আর্ত্ত্যা দেবলকে পুরা। চট্টেন বহুরূপেণ মকরন্দেন চোচিতঃ॥
জাহ্লনেন সমানোঽসৌ পূতিগোবর্দ্ধনেন চ। উচিতেন খাটুকেন দেবলেন সমং পুনঃ॥
মহিন্ত্যা মাধব ক্ষেম্যঃ গুড়িশরণিকস্তথা। উধোকলোলিকশ্চৈব পুত্রো যো খ্যাতপৌরুষৌ॥" (মহাবংশ)

(২) "বহুরূপোঽচিতাএতে নববিখ্যাতপৌরুষাঃ। ক্ষেম্যোঽস্য কুলভিগুয়ী কাঞ্জিকুতুহলোচিতঃ॥" (মহাবংশ)

(৩) "তুল্যোভূন্মকরন্দস্য আহিত মূর্দ্ধজোত্তমঃ। * * *
রায়ীগর্ব্বেশ্বরঃ পশ্চাদেতে ক্ষেম্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ। মকরন্দসুতাবেতৌ দাসো বিনায়কাবুভৌ॥" (মহাবংশ)

(৪) "ক্ষেম্যো বাঙ্গালচট্টশ্চ শূলপাণিশ্চ পিপ্পলী। * * *
মহিন্তা মাধবাচার্য্যো মুখকামঃ সমন্ততঃ। কিতোনাম সুতস্তস্য সুনামা লোকসম্মতঃ॥" (মহাবংশ)

চৌৎখণ্ডীর সহিত,(৫) বন্দ্যবংশীয় অপর প্রধান কুলীন ঈশান জন বা জগৎ ডিংসাই ও নিশাপতি ঘণ্টেশ্বরীর সহিত (৬), বাদলি মুখ জয়কুলভী ও নন্দনগুড়ের সহিত (৭), এবং কানু কাঞ্জিলাল গর্ভেশ্বর রায়ী ও রামগড়গড়ীর সহিত (৮) পরিবর্ত্ত বা কুলকার্য্য করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দের মহাবংশ পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, গৌড়াধিপ বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন এই উভয়ের সময়েই ৮ ঘর মুখ্য ও ১৪ ঘর গৌণ কুলীনমধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সম্বন্ধনির্ণয়কার লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় এই বল্লালপূজিত ১৪ জন গৌণকুলীনকে 'কষ্টশ্রোত্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।(৯) তাঁহার মতে "এই চৌদ্দগাঁই সদাচার-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণকুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।"(১০) বাস্তবিক এই গৌণকুলীনগণ সদাচারপরিভ্রষ্ট ছিলেন না। সুপ্রাচীন রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন, 'নবলক্ষণাক্রান্ত কুলীনগণ দুইভাগে বিভক্ত হন, মুখ্য ও গৌণ। নবগুণে যাঁহারা একটু খাট ছিলেন, তাঁহারাই গৌণকুলীন হইয়াছিলেন।"(১১) রাঢ়ীয়-কুলমঞ্জরী নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, উক্ত দ্বাবিংশতি গ্রামীসম্ভূত ২২ জন বিপ্রই বল্লাল কর্ত্তৃক কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।(১২) হরিমিশ্রের কারিকাতেও মুখ্য ৮ ও গৌণ ১৪ এই দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবই মহারাজ দনোজামাধবের সভাতেও সম্মানিত হইতে দেখা যায়।(১৩) কিন্তু গৌণকুলীনের পূর্ব্বসম্মান বেশী দিন স্থায়ী হইল না। গৌড়বঙ্গে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজেও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় নানা স্থানে কুলীনগণ ছড়াইয়া পড়ায় আদান-প্রদানেরও অনেকটা অসুবিধা ঘটিয়াছিল। অনেকেই সদাচার-পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন ও কুলবিধি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছিলেন। এই সময়ে আচারবৈলক্ষণ্যহেতু গৌণকুলীনগণ মুখ্য-কুলীনের দ্বেষ করিতেছিলেন। দোষী মুখ্যকুলীন ও নির্দ্দোষ গৌণকুলীনের মধ্যে সামাজিক

(৫) "মহেশ্বরো মহাবিজ্ঞঃ গুচোচট্টসুতাপতিঃ। রাজ্ঞ লক্ষ্মণসেনস্য সভায়াং তিলকঃ কৃতিঃ॥
পিপ্পলীয়াতিরূপেন বিজ্ঞেন গুণশালিনা। চৌৎখণ্ডিরুদোকেন চ পরিবর্ত্তং সহাকরোৎ।
মহাদেবঃ সুতস্তস্য লক্ষ্মণেন প্রপূজিতঃ॥" (মহাবংশ)

(৬) "পূতিগোবর্দ্ধনোদিণ্ডি র্জনোঘণ্টা নিশাপতিঃ। মুখজোভ্যাগতশ্চৈব ঈশানস্য বিনিময়াঃ॥" (মহাবংশ)

(৭) "জয়োনন্দনকৌতুল্যো কুলভিচ গুরী তথা। বাদলে মুখজস্যেতে তুল্যাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (মহাবংশ)

(৮) "কানুকস্যোচিতোবন্দ্যো দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কেম্যোগর্ভেশ্বরো রায়ী রামোপি গড়সম্ভবঃ॥"

(ধ্রুবানন্দের মহাবংশ)

(৯) সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট ।৹ পৃষ্ঠা

(১০) সম্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ ৩০০ পৃষ্ঠা।

(১১) "তে দ্বিধা গৌণমুখ্যাশ্চ নবধা কুললক্ষণম্। নবধা স্বল্পভাবেন গৌণত্বমুপজায়তে॥" (কুলরাম)

(১২) "তদস্তগ্রাহিণোক্তে যে বিপ্রা দ্বাবিংশতির্মতা। গ্রামিণস্তান্ সমভ্যর্চ্চ কুলীনানকরোন্নৃপঃ॥"

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

(১৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৬৪ অধ্যায় (২য় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

কুলমর্য্যাদা লইয়া গোলযোগ ঘটিতেছিল। রাজা বল্লালসেন নিয়ম করিয়া যান যে, কুলীন ভিন্ন গোত্রীয় কুলীনে কন্যাদান করিবেন এবং সেই কুলীনের ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ পরিবর্ত্তই কুলীনগণের সর্ব্বপ্রধান স্বধর্ম্ম।(১৪) ইহার ব্যতিক্রমে কুলমর্য্যাদার হ্রাস বা কুলক্ষয় হইবে। এই নিয়ম রক্ষা করিয়া গৌণকুলীনেরা মুখ্যকুলীন ছাড়িয়া পরস্পর আদান-প্রদান চালাইতে লাগিলেন। মুখ্যকুলীনদিগের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব দেখিয়া কুলাচার্য্যগণ গৌণকুলীনদিগের কুলপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা শ্রীদত্ত খাসের সভায় কুলাচার্য্যগণ উপস্থিত হইলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই দত্তখাস মহাশয়ের সভায় মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল।(১৫) প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'গৌণকুলীনগণ' পরস্পর গৌণকুলীন মধ্যে আদান-প্রদান বা পরিবর্ত্ত করিতেছিলেন, কদাচিৎ মুখ্যকুলীনে কন্যাদান মাত্র করিতেন, (মুখ্য কুলীনের কন্যাগ্রহণ বা মুখ্যকুলীনের সহিত পরিবর্ত্ত করিতে কাহারও আগ্রহ ছিল না,।) রাজা শ্রীদত্তখাস গৌণকুলীনদিগের এইরূপ শ্রোত্রিয়গণের সমান আচার লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গৌণকুলীনকে শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।'(১৬)

রাজা দত্তখাস উক্ত চৌদ্দ ঘর গৌণকুলীনকে কেবল "শ্রোত্রিয়" করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। চৌদ্দ ঘরের মধ্যে কেশরকোনী, রায়ী, পীতমুণ্ডী, গড়গড়ী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভী ও চৌৎখণ্ডী এই সাতঘরকে "অরি" বা কুলনাশক বলিয়া স্থির করিলেন। দেবীবর তাঁহার "মেলবন্ধ" নামক গ্রন্থে ইহার কারণ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, যে উক্ত সপ্ত গাঁইর গৌণকুলীনেরা চুরী করিয়া কুলীনকন্যা লইতেন, এই জন্যই এই সাতঘর অগ্রাহ্য হইলেন.।(১৭) অবশিষ্ট সাতঘরের মধ্যে পিপ্পলী, দীর্ঘাঙ্গী ও ডিংসাই এই তিনঘর সিদ্ধ এবং মহিন্তা, হড়, গুড় ও পারিহাল এই চারি ঘর সাধ্যশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার "কুলরামে" লিখিয়াছেন, 'ইষ্টদ্বেষ থাকায় উক্ত কেশরকোনী প্রভৃতি সপ্তঘর "অরি" বা কষ্টশ্রোত্রিয় হইলেন।' (১৮) দেবীবর ও বাচস্পতিমিশ্র এই উভয়ের উক্তি

(১৪) "কন্যাদানপ্রদানাভ্যাং স্বধর্ম্ম পরিবর্ত্ততঃ। অন্যোন্যসমধর্ম্মী চ ভবিতা রাজসম্মতঃ॥
অয়মেব বৃহদ্ধর্ম্মঃ কুলীনত্বেন সংযুতঃ। কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্যাং নৃপবল্লালসেনকঃ॥" (কুলরাম)

(১৫) "স্ববংশভূপালকুমারকন্যাং যোগ্যো বিবাদঃ প্রতিপত্তিকারি।
শ্রীদত্তখাসস্য সভায় পূর্ব্বং কিনালকুণ্ডং ঘটকাঃ সমূচুঃ॥" (ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশ)

(১৬) "গৌণৈঃ সহ গৌণানাং পরিবর্ত্তবিধানং কদাচিন্মুখ্যে তনয়াপ্রদানং অতো শ্রীদত্তখাসেন রাজ্ঞা শ্রোত্রিয়াণাং সধর্ম্মত্বেন গৌণা অপি শ্রোত্রিয়াঙ্কৃতাঃ॥" (দেবীবর)

(১৭) "কেশরো রায়ী গাঞী চ পীতমুণ্ডী চ গড়গড়ী। ঘণ্টা কুলভী চৌৎখণ্ডী সপ্তৈতে চারয়ঃ স্মৃতাঃ॥
কুলীনজাপহারিত্বাৎ সপ্তানাঞ্চ কুলাধিতা। যস্মৈ দেয়া ততোঽগ্রাহ্যা দোষজ্ঞৈরিতি কল্পিতম্॥"
(দেবীবর)

(১৮) "ইষ্টদ্বেষতয়া সপ্ত চারয় পরিকীর্ত্তিতা॥" (মেলপর্য্যায়ধৃত কুলরাম)

হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রাজা দত্তখাসের সময়ে গৌণকুলীন ও মুখ্যকুলীনে পরস্পর রেষারেষী চলিয়াছিল, মুখ্যকুলীনগণ পূর্ব্ববৎ গৌণকুলীনকে কন্যাদান করিতে বিমুখ ছিলেন, এ কারণ প্রধানতঃ গৌণকুলীনেরা পরস্পর আদান-প্রদান চালাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেশরকোনী প্রভৃতি সপ্তঘর কুলগৌরব বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া ছলে, কৌশলে ও গোপনে মুখ্য-কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতেছিলেন। অবশ্য বল্লালী কুলবিধি আলোচনা করিলে তাঁহাদের এ কার্য্য (কুলীনের পক্ষে) নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ কুলীনগণ স্ব স্ব কুলরক্ষা করিবার জন্য সকল সমাজেই এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ গৌড়াধিপ বল্লালের সময়ে যাঁহারা গৌণকুলীন বলিয়া সম্মানিত হন, রাজা দত্তখাসের সময় তাঁহাদের ৭ম ও ৮ম পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ স্থলে ৭।৮ পুরুষ পরে উক্ত সপ্তঘরের লোকসংখ্যা ধরিলে ন্যূনকল্পে ৩।৪ শতব্যক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। এই তিন চারিশতব্যক্তির সকলেই কিছু কুলীনকন্যা-হরণদোষে দূষিত হন নাই বা লিপ্ত ছিলেন না। অথচ তাঁহারা সকলেই কুলহীন হই-লেন। কেবল কুলহীন নহে, কুলনাশক বলিয়া গণ্য হইলেন। মুখ্যকুলীনগণ শ্রোত্রিয়কন্যা অবাধে বিবাহ করিতে পারিতেন, তাহাতে কোন দোষ হইত না; অথচ বল্লালসেনের সময় হইতে যে সপ্তঘরের সহিত আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল, তাঁহাদিগকে কন্যাদান দূরের কথা, তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিলেও কুলীনের কুলপাত হইবে, রাজা দত্তখাস এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ‡ এবং সমগ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজ উক্ত ব্যবস্থা অবনতশিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, রাজা দত্তখাস কখনই একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। বাস্তবিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে তিনিই কুলীন ও শ্রোত্রিয় সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা করিয়া যান। আজ পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছেন।* কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ একজন সমাজব্যবস্থাপক অসামান্য ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কোথায় তাঁহার বাস ছিল, কুলগ্রন্থ হইতে তাহার কোন আভাস পাওয়া যাইতেছে না! রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বপ্রধান কুলগ্রন্থ "মহাবংশ" হইতে এই মাত্র জানিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলীন পূতি শোভাকর ১৩৭৭ শকে (১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে রাজা দত্তখাসের সভায় রাঢ়ীয় কুলীনগণের ৫৭ম সমীকরণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সময় বল্লালী কুলীনগণের অধস্তন ৭।৮ পুরুষ হইয়াছিল।

এখন বঙ্গে সর্ব্বত্রই যথেষ্ট ঐতিহাসিক আলোচনা চলিতেছে। এ সময়ে রাজা দত্তখাসের প্রকৃত পরিচয় ও সময় নিরূপিত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়াই "রাজা দত্তখাস কে" এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম্ভাগ, ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিবের গাজন

"বলদ বাহনে হর করিলা গাজন।
সহিত গমনে লাইল্যা ধর্ম্মর গাজন।" (শূঃ পুঃ)

বঙ্গদেশে "গাজন" একটী প্রাচীন ধর্ম্মমহোৎসব। গাজনের মূল অনুসন্ধান করিলে, আমরা বঙ্গের ধর্ম্মেতিহাসের এক অভিনব অংশে উপস্থিত হই। বৌদ্ধ-উৎসবাদির সহিত গাজনের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না। কেহ কেহ বলেন, "গর্জ্জন" শব্দ হইতে "গাজন" শব্দের বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ-উৎসবে নৃত্য-গীত ও বাদ্যোদ্যমের কথা ছিল না, প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মোৎসব বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ ইস্‌লামধর্ম্মের আবৃত্তিবৎ ছিল। কালে শ্রীহর্ষাদির রাজত্বসময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ-নীরব-সাধনা সাধারণ অজ্ঞ কৃষকগণের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তারে সমর্থ হইতে পারে নাই বলিয়া একটা তামসিক ভাবের সমাবেশপূর্ব্বক বৌদ্ধ-সাধনা, বৌদ্ধ তামসিক উৎসবে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে বাদ্যোদ্যমসহকারে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অভিনব ভাবে, বুদ্ধ-পূজার প্রচলন আরম্ভ হয়, দেশের নিরক্ষর জনগণ সকলেই সাত্বিক নীরব সাধনা বুঝিবে কেন? তাহারা তামসিক আমোদ উপভোগ করিতে না পাইলে সুখী হইতে পারিবে না, ইহা যখন পণ্ডিতে বুঝিলেন, তখন তা[illegible] জন্য স্বতন্ত্রভাবে উৎসবাদির বন্দোবস্তও হইয়াছিল। রাজা তাহার উদ্যোগী ছিলেন। একদিকে নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির সহিত বুদ্ধ-উৎসবের সম্বন্ধ, আবার অন্যদিকে প্রচুর আহারের বন্দোবস্ত থাকায়, উৎসবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বহু জনগণের চীৎকার বিপুল বাদ্যোদ্যমব্যাপারে "গর্জ্জন" উঠিত, তাই বোধ হয়, এই উৎসব কালক্রমে "গাজন" নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

'গাজন' ধর্ম্মপূজকদের সময়ে 'গর্জ্জন' শব্দ হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

বৌদ্ধগণের গীত, বাদ্য, নৃত্য, অনাচরণীয় হইলেও, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের নিকট আদৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন তান্ত্রিকতামূলক বহু দেবদেবী কল্পনায় পুষ্টি প্রাপ্ত হইল, সেই সময় হইতে এই "গাজনে কাণ্ড", বঙ্গের ধর্ম্মব্যাপারে এক অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণই গাজন প্রতিষ্ঠা করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ পল্লী-কথিত ভাষায় উপদেশ ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি-প্রণয়নে তৎপর হইয়াছিলেন। গাজন মহোৎসবের মন্ত্রাংশগুলিও সংস্কৃতে রচিত না হইয়া, প্রাচীন বঙ্গীয় পল্লীভাষায় রচিত দেখিতে পাই।

বৌদ্ধগণ ধর্ম্মপূজার মন্ত্রগুলি পল্লী-কথিত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের গাজনব্যাপার পল্লী-কথিত ভাষায় রচিত হইবার কারণ অনুসন্ধান ও সেই

পল্লী-কথিত ভাষার মন্ত্ররচনা বৌদ্ধগণই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন।

মন্ত্রাংশ আলোচনা করিলে, দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-উৎসবের পূর্ণভাব তাহাতে বিরাজিত রহিয়াছে। ধর্ম্মপণ্ডিত রামাইএর ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতির অনুকরণ সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না।

উৎকল হইতে মালদহ, দিনাজপুর পর্য্যন্ত, গাজনের একই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা, উৎকল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানের গাজনব্যাপার ও মন্ত্রগুলি একই উদ্দেশ্যমূলক, একই ভাবজ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে পারি, যিনি বঙ্গের গাজনের মন্ত্রগুলির সন্ধান লইয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সর্ব্বত্র সমান ভাব, সমান ভাষার অনুকরণ বা বিস্তার দেখিয়া গাজনে ব্যাপারের মূলদেশ দেখিতে পাইবেন, এ প্রকার বিবেচনা করা যায়।

সন ১৩১৬ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "আদ্যের গম্ভীরা" নামক মালদহের শিবের গাজনের ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তৎপরে আমি এতাবৎকাল বঙ্গদেশের বিবিধ স্থানের গাজনের বিবরণ-সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলাম। এতাবৎ বহু পল্লীর শিব ও ধর্ম্মগাজনের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বুঝিয়াছি, শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজনের পরবর্ত্তী এবং শিবের গাজন, ধর্ম্মের গাজনের পূর্ণ অনুকরণ মাত্র।

গাজন বৌদ্ধ-উৎসব।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মোৎসবের ক্ষীণ তান্ত্রিকভাবসূচক ধর্ম্মের গাজনের বিলোপসাধন উদ্দেশ্যেই হউক অথবা শৈবধর্ম্মাবলম্বী নিরক্ষর পল্লীবাসীর উৎসাহার্থেই হউক, প্রাচীন ধর্ম্মের গাজনের অনুরূপ শিবের গাজনের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা দোষাবহ হইবে না। আমি গাজনের ইতিহাস সংগ্রহে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই যেন বৌদ্ধ-উৎসবের ভিতর প্রবেশ করিতেছি বলিয়া বোধ করিতেছি।

সেনরাজগণের সময়ে শিবের গাজনের অভ্যুদয় হয়।

শিবের গাজনের উৎপত্তি সম্বন্ধে মনে হয়, যেন সেনরাজগণের সময় ইহা পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে সদাশিব মুদ্রা অঙ্কিত আছে। সেই সময়ে গাজন ব্যাপার—সদাশিব-উৎসব—বৌদ্ধধর্ম্মের গাজনের ছাঁকে নিরক্ষর শৈবগণের উৎসাহার্থে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, বলিতে হয়।

গাজনের প্রথমে সদাশিবের পূজার আরম্ভ হয়।

আজিও বহুস্থানের শিবের গাজনের পল্লীকথিত ভাষায় মন্ত্রগুলিতে সদাশিব নামের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। রাঢ়ে, বারেন্দ্রে, একদিন রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণীয়ধর্ম্মের গাজন অনুষ্ঠিত হইত, সে ব্যাপার পালনরপতিগণের সময়ের বলিয়া একরকম স্থির হইয়া গিয়াছে। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে শিবের গাজন, ধর্ম্মের গাজনের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইবার কারণ বিলক্ষণ বর্ত্তমান আছে।

আদ্যের গম্ভীরা নূতন কলেবরে শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, উহাতে শিব ও

দেবালয়, দেবগৃহ ইত্যাদি গম্ভীরা নামে খ্যাত ছিল।

ধর্ম্মের গাজনের সমুদায় বিবরণ বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া উহার সমুদায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পূর্ণ বিবরণ প্রদান না করিয়া, বর্দ্ধমান-জেলার শিবের গাজনের একটি আদর্শ প্রদান করিলাম।

সাধারণতঃ গম্ভীরা শব্দ এক্ষণে অপ্রচলিত শব্দে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু 'গম্ভীরা' শব্দ প্রাচীন বঙ্গে পরিচিত ছিল। গম্ভীরা দেবগৃহ বলিয়া সে কালে সকলে অবগত ছিলেন, উৎকল হইতে রঙ্গপুর দিনাজপুর পর্য্যন্ত স্থানে গম্ভীরা বর্ত্তমান চণ্ডীমণ্ডপ বলিয়া জ্ঞান ছিল।

গম্ভীরা আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপ।

গোবিন্দচন্দ্রের গীতে একাধিকবার গম্ভীরা শব্দ চণ্ডীমণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি।

পূর্ব্বে 'গম্ভীরা'শব্দের বহুল ব্যবহার হইত।

"গম্ভীরে বসিয়া যোগী ধ্যানে দিল মন।"

"আপনার কায়া ছাড়ি গম্ভীরে রাখিয়া।
মায়া করি যাত্রা রৈলা দৈবজ্ঞ সাজিয়া।"

(গোবিন্দচন্দ্রের গীত)

"ঘোর গম্ভীরিতে ঘন ঘন ঘণ্টা বাজে।
ঘটক কপোল প্রভু অর্দ্ধচন্দ্র সাজে॥"

(মহাদেবক বন্দনা—উৎকল কবিকর্ণ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও 'গম্ভীরা' গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—

"গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥" ঙ

গম্ভীরা আজকাল অপ্রচলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ, গম্ভীরা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

শ্মশানে পিণ্ডদানমন্ত্রেও দেখিতে পাই, লিখিত আছে, "এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ * *" ইত্যাদি।

যাহাই হউক, 'গম্ভীরা' আমাদের পল্লী-কথিত ভাষা হইতে লুপ্ত হইবার অন্যতম কারণ-মধ্যে বোধ হয়, সে কালে গম্ভীরা-গৃহ ধর্ম্মোৎসব বা বুদ্ধদেবালয় রূপে ব্যবহৃত হইত, সেই কারণে কালে 'গম্ভীরা' গৃহবাচক হইয়াও, বৌদ্ধ-বিদ্বেষবশতঃ, উক্ত নাম লোপ পাইয়াছে। পাষণ্ডী নাস্তিক বৌদ্ধগণের মস্তকে পদাঘাত করিতেও চৈতন্যভাগবতকার ছাড়েন নাই। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-মস্তকে পদাঘাত দ্বারা চৈতন্যভাগবতকার বৌদ্ধবিদ্বেষ ব্যক্ত করিয়াছেন। সেকালেও বৌদ্ধগণের প্রতাপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গম্ভীরা বৌদ্ধ-উৎসবের স্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় উক্ত শব্দের লোপ।

যাহাই হউক, সর্ব্বপ্রথমে 'গম্ভীরা' বৌদ্ধদেব-মন্দির ছিল। সেই সময় "আত্যাদেবী" নামক এক বৌদ্ধদেবী দেবীর পূজার হয়।

আত্যাদেবী বৌদ্ধদেবী।

শূন্যপুরাণে আদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। মাণদহের মাণিকদত্তের চণ্ডীতে শূন্যপুরাণীয় আদ্যাকে ধর্ম্মনিরঞ্জনের কন্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মহরিদাসের* খণ্ডিত পুস্তকেও মাণিকদত্তের ন্যায় আদ্যার বর্ণনা দেখিতে পাই। এ বর্ণনা আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের বর্ণনা নহে। মনসাদেবী যদ্রূপ পূজার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আদ্যাকেও সেই প্রকার ব্যস্ত দেখি। হনুমান আদ্যার 'দেহারা' নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, কলিঙ্গে আদ্যার দেহারা সর্ব্বাদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদ্যা তথায় পূজা প্রাপ্ত হন। মাণিকদত্তের চণ্ডীতে ইহা লিখিত আছে। এই আদ্যা (অতীশের—আর্য্যতারা, বজ্রতারা, চণ্ডী,—বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী) চণ্ডিকা হইয়া শিবকে বিবাহ করেন। আদ্যাদেবী বৌদ্ধচণ্ডীরূপে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ কর্তৃক পূজিতা হইতেন, কালে যখন শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়া পড়ে, তখন বৌদ্ধ আদ্যাদেবীর 'দেহারা' ও 'দেউলে' আদ্যাদেবী গৌরীরূপে অধিষ্ঠিতা হন। এদেশে শৈবধর্ম্ম প্রবল বেগে আত্মবিস্তার করিলে, বৌদ্ধগণের স্ব-সম্প্রদায়ের বিলোপ-সাধনের ভয় মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল, তাহার একটা নমুনা নিম্নে দিলাম—

কতিপয় প্রাচীন পুথিতে আদ্যার উৎপত্তি-প্রসঙ্গ।

শৈবধর্ম্মের অবাধ প্রচার দৃষ্টে বৌদ্ধগণের আতঙ্ক।

যথা :—"যদা ভবিষ্যকালে চ অত্র নেপালমণ্ডলে।
শৈবধর্ম্মাঃ প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষকো ভবিষ্যন্তি॥
যথা যথা শৈবধর্ম্মং প্রবর্ত্ততেঽত্র মণ্ডলে।
তথা তথা চ অত্যর্থং দুঃখপীড়া ভবিষ্যতি॥
বৌদ্ধলোকগণা যেঽপি শৈবধর্ম্মং করিষ্যন্তি।
তে সর্ব্বে কৃতপাপাশ্চ নরকঞ্চ গমিষ্যন্তি॥" (স্বয়ম্ভূপুরাণ, ৮ম অঃ)

যে গম্ভীরা ধর্ম্ম-অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কালে শৈবপ্রভাবের প্রাবল্যে তান্ত্রিক শাক্তগণের দ্বারা তাহা "আদ্যার গম্ভীরা" হইয়া পড়িল। যে গম্ভীরায় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ-পূজিত আদ্যাদেবী বিরাজ করিতেন; তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াই, তান্ত্রিক শাক্তগণ দ্বারা 'আদ্যের গম্ভীরা' বলিয়া তাহা কথিত হইতে থাকিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ফাঁপরে পড়িলেন। আদ্যাদেবী যে চণ্ডিকা তাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণই স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং শৈব বা শাক্তগণ বেশ সহজে "আদ্যার গম্ভীরা"কে নিজস্ব বলিয়া অধিকার করিলেন।

আদ্যাদেবী বৌদ্ধচণ্ডী হইয়া ক্রমশঃ পৌরাণিক দুর্গা ও পার্ব্বতীতে পরিণত হইয়াছেন।

"ভরমিতে ভরমিতে পরভুর পড়ে গেল ঘাম।
তাহাত জনমিল আদ্যা দুর্গা জার নাম॥ ১৩০ (শূন্যপুরাণ সৃষ্টিপত্তন ১৩ পৃঃ)
"ডাক দিআ বোলে আদ্যা মধুর বচন॥" ১৭৩ ঐ সৃষ্টিপত্তন ১৭ পৃঃ
"কি দিএ রাখিআ গেলে বোলেন্ত পার্ব্বতী॥" ১৭৪ ঐ ঐ

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ হিন্দু-দেবদেবীর সম্মান করিতেন, এটা কেবল একত্র বাস-জনিত অভ্যাস-

* ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯১ পৃষ্ঠা।

বশতঃ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু পৌরাণিক ধর্ম্ম হইতে যে বিভিন্ন নহে, ইহাও দেখান অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-ছাঁচে নূতন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম গঠন করিয়া, কৌশলে নির্ব্বাণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্মদীপ-শিখা হিন্দুধর্ম্মালোকে বিলীন করাই উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তাহাই হইল।

বঙ্গের ক্ষীণ বৌদ্ধধর্ম্মের, শৈব-ধর্ম্মে আত্মত্যাগ।

সেনবংশীয় রাজত্বকালের পূর্ব্বে "ধর্ম্মের গাজন" হইত; কিন্তু রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মের গাজনে হিন্দু দেবদেবীকে বসাইয়া ধর্ম্ম (বুদ্ধ)কে উচ্চাসন দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই হিন্দু দেবদেবীগণকে গাজনে ডাকিয়া আনিয়া রামাই ভাল কাজ করেন নাই।

ধর্ম্মের গাজনে পৌরাণিক দেব-দেবীর আগমন-সূচনা।

প্রথমে হিন্দু দেবদেবীগণ ধর্ম্মের গাজনে দর্শকরূপে আগমন করিয়াছিলেন। লোভবশতঃ শেষে ধর্ম্মের স্থান অধিকার এবং ধর্ম্মকে গাজনের নায়কত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং শিব গম্ভীরে বসিয়া পড়িলেন এবং গাজনের সমুদায় স্বত্ব নিজের বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িলেন না।

হিন্দুদেবদেবীগণ ধর্ম্মগাজনের দর্শকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রামাই পণ্ডিত বলিয়াছেন— "বলদ বাহনে হর করিআ সাজন।
সহিত গমনে জাইল্য ধর্ম্মর গাজন ॥" ৪

অথ ঘর দেখা। (শূন্যপুরাণ ৩৫ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বেই আদ্যাদেবী চণ্ডী বা দুর্গা রূপে ধর্ম্মের সংসারে প্রবেশ করিয়া, পরে হর-অর্দ্ধাঙ্গিনী গৌরী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর "বলদ বাহনে হর" যখন ধর্ম্মের গাজনে আসিলেন, তখন— "ধন, জামাই ভাগনা"
"এ তিন নহে আপনা ॥"

জামাই হর (বোধিসত্ব মঞ্জুশ্রী বা লোকেশ্বররূপে) গৌরী (চণ্ডী, তারা বা আর্য্যতারা)-কে বামে লইয়া গাজনে বসিয়া পড়িলেন। ধর্ম্মের আসন অনেক পল্লীতে শূন্য হইল। গম্ভীর হরগৌরীর স্থান হইল।

দর্শক শিব গৌরী বা আদ্যাকে বামে লইয়া স্বয়ং গাজন অধিকার করিলেন।

শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়— "যুগাদিকৃদ্‌যুগাবর্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ ॥"

গম্ভীর,—শিবের একটী নাম; সুতরাং গম্ভীরা যে গম্ভীরালয় বা শিবালয় তাহার প্রমাণ জন্য শিবকে ব্যস্ত হইতে হইল না। ধর্ম্মের গম্ভীরা—আদ্যের গম্ভীরায়, পরে হরগৌরীর গম্ভীরায় পরিণত হইল।

গম্ভীরা অর্থে শিবালয় বুঝাইল।

মালদহে আজিও শিবের গাজনকে 'গম্ভীরাপূজা' বলিয়া থাকে।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামে বাবা ঈশানেশ্বর অতিশয় জাগ্রত দেবতা, তাঁহার গাজন-উৎসবে যথেষ্ট সন্ন্যাসীর সমাগম ও ধুমধাম হইয়া থাকে। বাবা ঈশানেশ্বর দেবের পল্লী-কথিত মন্ত্র-মধ্যে দেখিতে পাই যথা ;—

মালদহের গম্ভীরা-উৎসব এদেশে পূর্ব্বে গম্ভীরাপূজা বলিয়া প্রচলিত থাকিলেও, বর্ত্তমানে গাজন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

"গাজনে আছেন ধর্ম্ম অধিকারি
তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥"

এবং

"গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥"

সুতরাং মনে হয়, ধর্ম্ম-অধিকারীর গাজনে "গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।" আজিও সেই ধর্ম্মের গাজন দেশের লোকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের গাজন পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের গাজন হইয়াছে এবং শিবালয় আজিও অপ্রত্যক্ষ ভাবে 'গম্ভীরা' নামে কথিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে রামাই পণ্ডিতের সময়ে ধর্ম্মের গাজনে—

"বলদ বাহনে হর করিআ সাজন"

উপস্থিত হইতেন, তাহার কিছু পরে গম্ভীরার শিবের গাজনে ধর্ম্ম-অধিকারীর আগমন সূচিত হইতেছে। কাল-মাহাত্ম্য বলিতে হইবে। ধর্ম্ম আপন অধিকার হারাইয়া এক্ষণে শিবের গাজনের এক জন দর্শকরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশের অধিকাংশ পল্লীতে শিব ও ধর্ম্মের গাজন স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন স্থানে ধর্ম্ম-প্রাধান্য এবং কোন স্থানে হর-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মপূজকদিগকে ডোমবৎ করা হিন্দুগণের কৌশল। একদিন প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসনে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যতীত সকলকে "পাষণ্ডী" বলা হইয়াছিল, কালে হিন্দুশাস্ত্রে আবার বৌদ্ধগণকেই পাষণ্ডী বলা হইয়াছে। বেদমার্গ-বিরোধী পাষণ্ডী-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ধর্ম্মপূজকদিগকে ডোম এবং হীন জাতিতে পরিণত হইতে হইয়াছে।

বৌদ্ধগণ, অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণকে পাষণ্ডী বলিত, পরে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকেই পাষণ্ডী বলিল।

শিবের গাজনের পূজককে "গাজুনে বামুন" বলে, ব্রাহ্মণ হইলেও সমাজে তাহাদিগকে বড়ই হীনতা স্বীকার করিয়া থাকিতে হয়।

গাজনের পূজককে 'গাজুনে বামুন' বলে, ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহারা নীচ স্থান অধিকার করিয়াছে।

রাঢ়ের 'ধর্ম্মরাজপূজা' সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গাজনের বিবরণ

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর দেবের গাজন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্দেশের শিবের গাজন প্রায়ই একপ্রকার নিয়মের অধীন, তবে স্থানভেদে কিছু কিছু ভেদও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন এক স্থানের গাজনের পরিচয় প্রদান রাঢ়ীয় গাজনের পরিচয় হইবে মনে করি।

বর্দ্ধমান জেলার কুড়মুন-পুলাশী গ্রামের শিবের গাজনের বিবরণ।

কুড়মুন গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কুড়মুন গ্রাম ৺রাজা রামমোহন রায়ের শ্বশুরালয়।

এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। প্রাচীন হইলেও ইহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। খড়ী নদীর অনতি সন্নিকটে এই গ্রাম অবস্থিত। এই পল্লীতে রাজা রামমোহন রায়ের শ্বশুরবাড়ী ছিল বলিয়া, প্রাচীনেরা গল্প করিয়া থাকেন।

বল্লালী সময়ে গৌড়ের স্বর্ণবণিকগণ কুড়মুনে আগমন করেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা চুঁচুড়াদি স্থানে বাস করিতেছেন।

বল্লালী আমলে গৌড়বাসী স্বর্ণবণিক্‌গণ রাজাকর্ত্তৃক অপমানিত হইলে পর, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই গ্রামে আগমন করেন এবং সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারাই এই গ্রামের একমাত্র অধিবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই গ্রামে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে বাভ্রবীকায়া নামক যে হরগৌরীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। চুঁচুড়া, ফরাশডাঙ্গার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ স্বর্ণবণিক্‌গণের পূর্ব্বনিবাস কুড়মুনে ছিল। এমনও শুনা যায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের নিবাসস্থান কুড়মুন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় স্বর্ণবণিক্‌গণ কুড়মুন ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ স্থানান্তরে গমন করেন।

বাবা ঈশানেশ্বর দেব। প্রাপ্তির কারণ।

এই গ্রামে সেই সময়ে "উগ্রক্ষত্রিয়"-উপাধিক এক সম্প্রদায় বাস আরম্ভ করেন। খড়ী নদীর তীরে "কলমীশায়রদহ" সমীপে হলপ্রবাহকালে এক 'ত্রিশীর লিঙ্গ" বাহির হয়, লিঙ্গটী প্রস্তরের। সেই ত্রিশীর (ত্রিশূলাকৃতি) লিঙ্গটী বহুকাল হইতে বাবা ঈশানেশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত উগ্রক্ষত্রিয় বংশীয়গণ ঈশানেশ্বর দেবের মূল সেবাইত ও গ্রামের মণ্ডল। মালদহের ন্যায় এস্থানে মাণ্ডলিক পদ্ধতির প্রচলন ছিল, অবগত হওয়া গিয়াছে।

মালদহের "পুণ্ড্রক্ষত্রিয়"গণের সহিত "উগ্রক্ষত্রিয়"গণের নৈকট্য আছে বলিয়া বোধ হয়। মণ্ডলবংশীয়গণ সম্ভবতঃ শৈব স্বর্ণবণিক্‌গণের আশ্রয়ে এদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। প্রাচীন ঈশানেশ্বর দেবের মন্দিরটী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দিরটী শতাধিক বৎসরের পুরাতন, তাহা মন্দির-সংলগ্ন ইষ্টকলিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

বাবা ঈশানেশ্বরের গাজন

বাবা ঈশানেশ্বর দেবের গাজনের বিবরণ।

গ্রামে ধর্ম্মের দেহারা আছে এবং তাঁহারও গাজন হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশানেশ্বরের গাজনের উৎসব অত্যধিক হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের ১৩ই তারিখ হইতে ঈশানেশ্বর দেবের বার দেওয়া হয়। কুড়মুন গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের শিবের গাজন স্বয়ং দেখিয়াছি, তন্মধ্যে পলাশী (সোনা পলাশী) গ্রামের বুড়া-শিবের গাজনও উল্লেখযোগ্য। এই পলাশী গ্রামে স্বর্গীয় মেতাবেও লালবিহারী দের প্রাচীন বাসভবন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। দে মহাশয়ের দুই খানি স্বনাম-প্রসিদ্ধ পুস্তক এই পলাশীর গ্রাম্য

চিত্রাবলম্বনে লিখিত। বুড়াশিবের সুবৃহৎ মন্দির ও নাটমন্দির শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। কুড়মুন ও পলাশীর গাজনের নিকট সম্বন্ধ আছে। •

কুড়মুন গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয়বংশীয় ৺সন্তোষ মণ্ডলের পুত্র ৺শঙ্কর এবং তৎপুত্র ৺দুর্গাচরণ

গ্রামের মণ্ডল উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় শ্রীবিষ্ণুদাসমণ্ডল। — এবং তৎপুত্র ৺রামচরণ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস মণ্ডল মহাশয় গ্রামের মণ্ডল এবং ঈশানেশ্বর দেবের দেবোত্তরভোগী কর্ম্মকর্ত্তা। তাঁহার নিকট আমি বাবা ঈশানেশ্বরের পল্লীকথিত ভাষায় শিবপূজাবিধির যে বন্দনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমার মূল আলোচ্য বিষয় হইলেও গাজনের প্রণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চৈত্রমাস ত্রিশ দিনে হইলে ২৬শে চৈত্র তারিখে শিবব্রত-পরায়ণ সন্ন্যাসিগণকে নিরামিষ-

উৎসবারম্ভ। — ভোজী হইয়া থাকিতে হয়। তৎপর দিবস ২৭শে চৈত্র মহা-হবিষ্যান্ন দিবস। এই দুই দিবসেই

সন্ন্যাসী-ধরা

সন্ন্যাসী-ধরা বা ফোটা-দেওয়া "টাকা-পাবন"। — পর্ব্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। উত্তরীয়স্বরূপ সূত্রগুচ্ছ কুশ সংবদ্ধভাবে গলদেশে ধারণ করিতে হয়। পূর্ব্বেকার 'সন্ন্যাসী-ধরা' পর্ব্বের অনুষ্ঠান আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ধর্ম্মপূজায় যেমন বার ধরিয়া কার্য্যারম্ভ হয়, ইহাতে দিন তারিখ ধরিয়া কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে।

"শুক্রবার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস্য।
ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য॥"১ (৪২ পৃষ্ঠা শূন্য-পুরাণ)

শিবের গাজনে ২৬শে ও ২৭শে তারিখে "উত্তরীয়ধারণ" ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্মের গাজনের "টাকাপাবনের" (ফোঁটা-দেওয়া বা সন্ন্যাসী-ধরা) ইহার অনুরূপ।

"ষোল সাস্তি নব লাভ বাহত্তরি কোটা।
সনিবারে নিঅ এহি নিঅমর ফোঁটা॥" ১১ (২৭ পৃষ্ঠা শূন্য-পুরাণ)

শিবের গাজনে ফোটার প্রচলন এক্ষণে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ধর্ম্মপূজক সন্ন্যাসীদের ন্যায় সূত্রগুচ্ছের উত্তরীয় গ্রহণ করিতে হয়।

শিব-সন্ন্যাসীর শ্রেণীবিভাগ। — সকল জাতিই শিবের সন্ন্যাসী-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মানসিক ও কৌলিক দুই প্রকার প্রথা আছে। ইহাদের মধ্যে

(১) শ্মশান সন্ন্যাসী,
(২) ধূল সাপট,
(৩) জল সাপট,
(৪) মূল সন্ন্যাসী,
(৫) মানসিক,

সন্ন্যাসী দুই হয়। প্রত্যেকের গাজনে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। হবিষ্যের দিবস কুড়মুনের সন্ন্যাসিগণ বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্যসহকারে পলাশী গ্রামে গমন করিয়া তথাকার সন্ন্যাসিগণের সহিত আলিঙ্গনাদি সমাপন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র পাল্কীতে স্বতন্ত্র "গাজুনে শিব" বহন করিয়া লইয়া যায়। তৎপর দিবস

ফল

ফলের দিবস অপরাহ্লে সমুদায় সন্ন্যাসী বিচিত্র বর্ণরাগে দেহ চিত্রিত করিয়া থাকে। চিত্রকর খটিকা, হরিতাল, সিন্দুরাদির বর্ণে তাহাদের মুখমণ্ডল চিত্রবিচিত্র করিয়া দেয়। ভূত, প্রেত, ত্রিনেত্রবিশিষ্ট বহুবিধ মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিবিধ বর্ণের কাগজের মালা গলায় দিয়া এবং প্রত্যেকে এক একখানি তরবারী (বর্ত্তমান কালে ভোতা তরবারী ও চেচারী) লইয়া শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়া ঢক্কাবাদ্য সহকারে নৃত্য করিতে থাকে। কালীঘাটে নীলপূজার দিবস প্রাতে যে প্রকার উৎসব হয়। কলিকাতার জেলেপাড়ার সংএর মত, শান্তিপুরে শিবের বিবাহের মত একটা শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া থাকে। মালদহের আদ্যের গম্ভীরার নৃত্যব্যাপার শৃঙ্খলাবদ্ধ; কিন্তু ইহা উহারই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

'ফলে'র কথা।

ফলের দিবস পলাশী গ্রামের সন্ন্যাসিগণ কুড়মুনে আগমনপূর্ব্বক আলিঙ্গনাদি করিয়া যায়। ২৪পরগণার টালিগঞ্জের বুড়াশিবের তলায় নীলের পূর্ব্বরাত্রে বহুস্থানের সন্ন্যাসী একত্র হইয়া এই প্রকার নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে।

শ্মশান-জাগান

নৃত্যগীতাদি অন্তে সন্ধ্যার সময় খড়ীনদীতীরে যে স্থানে ঈশানেশ্বর পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া অনেকে প্রণাম খাটে এবং পর দিবসের জন্য শবমুণ্ড সিন্দুরলিপ্ত ও মন্ত্রপূত করিয়া রাখে। ইহাকেই "শ্মশান-জাগান বলিয়া থাকে।

সন্ন্যাসিগণের শ্মশান-জাগান।

উপোস

২৯শে তারিখে উপবাস করে। এই দিবস রাত্রে পূজাদি ব্যাপারের পর শবমুণ্ড লইয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়। ঢক্কাবাদ্যসহকারে উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে সন্ন্যাসিগণ শবমুণ্ড লইয়া "ধর্ ধর্ ধর্ মড়ার মাথা" বলিয়া পৈশাচিক নৃত্য করিয়া থাকে।

উপবাস।

অনেকে ধুনা পুড়াইয়া থাকে। শেষ রাত্রে অগ্নি-উৎসব হয়।

ফুল-ভাঙ্গা বা ফুলখেলা

কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তাহার উপর দিয়া লম্ফাদি প্রদান ও বিবিধ প্রকার অগ্নিক্রীড়া হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গাজনেও ইহার প্রচলন আছে।

ফুলখেলা বা অগ্নিক্রীড়া।

"হাথত পাএত বাধিএ ফেল আগুনির উপর।
সোল জোজন জুড়িআ অগ্নিপ্রভা উথল তৎপর ॥১২
হাথত গলএ বান্ধি ফেল আগুনির উপর।
পুড়া লইআ জাএ রামাই সঙরে করতার ॥১৩
হেমসীতল আগুণ হইল তথি পর।" ১৪ (৫০ পৃঃ শূন্য-পুরাণ)

শিবের গাজনে উর্দ্ধে পদবন্ধন করিয়া মস্তকের নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলনপূর্ব্বক ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ সহকারে দোল দেওয়া যায়, ইহা তাহার অনুরূপ।

"উর্দ্ধে বান্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জল হ'য়ে জলে যজ্ঞকুণ্ড॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম)

শিবব্রত কৃচ্ছ্র সাধ্য হইলেও ধর্ম্মব্রতের অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

চড়ক

চড়কব্রত।

বর্ত্তমান কালে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলিয়া আর এ উৎসবের অনুষ্ঠান হয় না।

মাণ্ডলিক পদ্ধতি

মাণ্ডলিক পদ্ধতি।

ফল, উপবাসাদির দিবসে সন্ধ্যার পর যখন সমুদায় সন্ন্যাসিগণ স্নানান্তে "কালা পুষ্প" লইয়া জাতিনির্ব্বিশেষে ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া এক পংক্তিতে উপবেশন পূর্ব্বক "গাজুনে ব্রাহ্মণ" দ্বারা "গাজুনে শিব" মস্তকে স্পৃষ্ট করান হয় এবং তৎপরে মণ্ডল, বর্ত্তমান কালে শ্রীবিষ্ণুদাস মণ্ডল, তাঁহাদের বংশাবলীক্রমে পঠিত বন্দনা ও কতিপয় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই বন্দনা বা প্রণামনামক পল্লীকথিত প্রাচীন গদ্য-পদ্যে গ্রথিত বন্দনার পরিচয় প্রদান করিব।

মণ্ডল মহাশয় সন্ন্যাসীপরিবৃত বৃত্তমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যে শ্লোক আবৃত্তি করেন, তালে তালে ঢক্কাবাদ্য সহকারে সন্ন্যাসিগণ তাহা আবৃত্তি করিয়া শিবপূজার প্রাচীন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রথমে—

দ্বারমুক্ত

(১)

প্রাচীন মাণ্ডলিক শিবপূজা-পদ্ধতির পল্লী-কথিত তাবার বন্দনা।

হাতে ত্রিশূল রাঙ্গা লাঠী, পরিধানে বাঘের ছাল।
বৃষভ বাহনে শিব, ত্রিদশের নাথ।
জাগরে জাগরে ভাই, সত্যের কোটাল।
মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্ব্বদ্বার।

এই প্রকারে একাধিক ক্রমে ছয় দ্বারমুক্ত বন্দনা গাইতে হয়। ছয় দ্বার বলিলে বুঝিতে হইবে চারি দিক্-দ্বার এবং স্বর্গ ও গাজনের দ্বার। প্রত্যেক দ্বার-বন্দনা সমাপ্তির সহিত ঢক্কা-

বাদ্য ও "নাম ডাকিতে" হয়। এই "দ্বারমুক্ত" অনুষ্ঠানটী শূন্যপুরাণোক্ত "দ্বারমোচনের" অনুরূপ।

"দুআর ছাড় দুআরী সহিত কটাল।
তব্দা দরসনে দেখা শ্রীধর্ম্মর দুআর॥" ৯ (শূন্য-পুরাণ ৩৯পৃঃ)

শূন্য-পুরাণে "পঞ্চম দুআর" মুক্তের কথা আছে এবং

"গরুড়েক মুকত কৈল গাজন দুআরে।" ১৭ (শূন্যপুরাণ ৩৯ পৃঃ)

বলিয়া "গাজনের দ্বার"মুক্তের প্রসঙ্গ আছে। বর্ত্তমান আলোচ্য দ্বারমুক্তে

"মুক্ত হইল ঠাকুরের গাজনের দ্বার।"

বলিয়া প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

নিদ্রাভঙ্গ

(১)

প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ,
সেবকের দেখ রঙ্গ, পরিহর তোমার চরণে।

(২)

কার্ত্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রাভোগে,
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে।

(৩)

নিদ্রা ত্যেজ দেবরাজ, রহ মা থট্টার মাঝ,
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে।

(৪)

প্রভু তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্ম করে স্তুতি
অন্য দেব কোন খানে লাগে।

(৫)

প্রভু ত্যেজহ নিদ্রের মায়া, সেবকেরে কর দয়া
পুরামর্ত্ত দেব ত্রিপুরারি।

(৬)

শিঙ্গা ডম্বুর হাতে, বৃষভ রাখহ বামভাগে,
বাসুকী রহক ফণা, শিরে ধরি সিদ্ধ গঙ্গা,
কপালে চন্দন চাঁদ বেরি,
তহি মধ্যে শোভে ফোঁটা, হাড় মালা যোগপাটা
গাত্রে শোভে বিভূতি ভূষণ।

(৭)

প্রভু দেব ত্রিলোচন, বিঘ্ন কর বিমোচন,
নরের শকতি, আমরা তোমার আন্তা করি,
শাল খুলে ভর করি।
আগম নিগমে কয়, প্রভুদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর,
অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয়।

(৮)

বৃষভ বাহনে শিব, ত্যেজহে কৈলাসগিরি,
পুয়া অর্থ দেব ত্রিপুরারি।
গম্ভীরে করহ অধিষ্ঠান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম।

মালদহেও এই প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যথা :—

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ॥
খোল চন্দন কাঠের কপাট দেয় দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম॥

(আদ্যের গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬)

ধূল সাপট ভক্তা

নামক সন্ন্যাসী মস্তকে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধভাবে উপর্য্যুপরি রাখিয়া একপদে ঢক্কাবাদ্য সহ নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিলে, মণ্ডল তাহাকে নিম্নলিখিত বন্দনা পাঠ করান।

(১)

গোসাঞ তুমি যেন আটসিনী, যেন বটসিনী, বটসিনী যেন পঞ্চবটসিনী, পঞ্চবটসিনী যেন ধর্ম্ম-অধিকারী। ধর্ম্ম-অধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ, একাদশ রুদ্র, সপ্তসমুদ্র পার, তার দিকে বালুকা-সমুদ্র। তার কীঙ্করের কীঙ্কর ধূল সাপট ভক্তা।

(২)

আপন চুল দিয়া ধূল মার্জ্জনা করিবে। ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল স্বর্গের ধূল স্বর্গে যায়। মর্ত্ত্যের ধূল মর্ত্ত্যে যায়, বাদবাকি ধূল বাবার ভাণ্ডারে যাক্।

তৎপরে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্ত সন্ন্যাসিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠে—

"জয় ধূল সাপট ভক্তার জয়"

সেই সময়ে ঢক্কাবাদ্য সহকারে ধূল সাপট ভক্তা ধূলায় লুণ্ঠন আরম্ভ করে।

তৎপরে

জল সাপটভক্তা

মস্তকে একটী ক্ষুদ্র জলপাত্র রক্ষাপূর্ব্বক দুই হস্তে ধারণ করিয়া, একপদে নৃত্য করিতে করিতে আগমন করে। জল সাপটভক্তাকেও "গোসাঞ তুমি যেন" ইত্যাদি বন্দনা গাইতে হয় এবং বলিতে হয়—

"স্বর্গের জল স্বর্গে যায়।
মর্ত্ত্যের জল মর্ত্ত্যে যায়।
বাদ বাকি জল বাবার ভাণ্ডারে যাক।"

ইহার পরেই সমবেত সন্ন্যাসিগণ বলিয়া উঠেন, "জয় জল সাপটভক্তার জয়।"

বল্লুকা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা

বলার প্রয়োজন-বোধে বলিতে হইল। "বল্লুকাসমুদ্র" শূন্য-পুরাণে দৃষ্ট হয়। বল্লুকার তীরে ধর্ম্মনিরঞ্জন যোগধ্যানে যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

"তিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিআ।
বল্লুকা সৃজন কৈল গণ্ডীরেখা দিআ॥ ১৪৭
সিরজিল বল্লুকা নদী বল্লুকার জল।
উল্লুক বলিআ দিলা সে তপস্যার থল॥" ১৪৮ (১৫ পৃঃ শূন্য-পুরাণ)

"বল্লুকা নদী" সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের উত্তরাংশে শুষ্ক নদীগর্ভ দেখাইয়া অনেকেই উহাকে "বল্লুকা নদী" বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, বল্লুকাতীরে ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কুড়মুন শিববন্দনায় বল্লুকা-প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়, শূন্য-পুরাণীয় মতবাদের উপর এই শিবপূজা প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শূন্য-পুরাণীয় "জলপাবন" অনুষ্ঠানের সহিত বর্ত্তমান আলোচ্য "জলসাপটভক্তা"র সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।

"সুনার কলসি নিল নেতর বসন।
জল আনিতে বসুআ আপনি করিলা গমন॥১
তুরিতে গমন হইল বিজয়া গমন।
বল্লুকার তটে গিআ দিলা দরসন॥২" (শূন্য-পুরাণ—জলপাবন ২২পৃঃ)

ঘর দেখা ও চারিদ্বারে প্রণাম

(১)

পূর্ব্বে পূর্ব্বাপরে তার দ্বারে, দ্বারবারে, কে বারে, সিংহবারে, র বারে, তাম্বাদিপাত্রে, বিপক্ষ নামে, মোর ঊর্দ্ধ বদন। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, পূর্ব্বদ্বারে নমঃ শিবায় নম।

ঢকাবাদ্যসহ সন্ন্যাসিগণের প্রণামকরণ, ও "নাম ডাকা"।

(২)

উত্তরে বহুতি বহু পরে তার দ্বারে * * ইত্যাদি
উত্তর দ্বারে নমঃ শিবায় নম।

(৩)

পশ্চিমে হনুখণ্ড নামে ; তার দ্বারে * * ইত্যাদি
পশ্চিম দ্বারে নমঃ শিবায় নম।

(৪)

দক্ষিণে ভবরুদ্রেশ্বর নামে, তার দ্বারে * * ইত্যাদি
দক্ষিণ দ্বারে নমঃ শিবায় নম।

দিক্‌বন্দনা

(১)

দেউল বন্ধন, দেহারা বন্ধন, শাঠ পাঠ লাঠী বন্ধন,
আন্তের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরস্বতীর গান,
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা বামে বীর হনুমান।
পূর্ব্বে আছেন ভানু ভাস্কর, তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥

দিক্‌বন্দনার এই শ্লোকটীর আভাষ শূন্য-পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

যথা :—"ডাইনে ডুম্বুর সাই বামে হনুমান।
কর জোড় করিআ দুই পাত্র বুঝান॥"৩

ইহার অনুরূপ—(আন্তের গম্ভীরা হইতে)

'জল বন্দ স্থল বন্দ বুঢ়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান,
বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।

(১ম সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬)

অন্য একটী—

"জল বন্দ স্থল বন্দ আন্তের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ভজর বন্দ বামে বীর হনুমান।
সিংহ বাহনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম॥"

(ঐ, আন্তের গম্ভীরা)

সুতরাং সহজেই মনে হয়, স্থানভেদে বন্দনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। মূলে সমুদায় এক ভাব বহন করিতেছে।

(২)

দেউল বন্দন * * ইত্যাদি।
উত্তরে আছেন ভীম কেদার
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

অনুরূপ যথা :—

পশ্চিম দোয়াবে আছে ভীম একাদশ
তাঁহাব চরণে প্রণাম ॥ (ঐ—আম্ভের গম্ভীরা)

(৩)

দেউল বন্দন * * ইত্যাদি।
পশ্চিমে আছেন আরুর বৈদ্যনাথ।
তাঁব চবণে কবি পঞ্চ প্রণাম ॥

(৪)

দেউল বন্দন * * ইত্যাদি।
দক্ষিণে আছে জয় জগন্নাথ
তাঁব চরণে কবি পঞ্চ প্রণাম ॥

অনুরূপ যথা :—

মোকে মুক্ত কব দক্ষিণ দোয়াব।
দক্ষিণ দোয়াবে আছে জয় জগন্নাথ। ইত্যাদি
(ঐ—আম্ভেব গম্ভীরা)

(৫)

দেউল * * ইত্যাদি
স্বর্গে আছেন ইন্দ্রবাজ,
তাঁব চবণে কবি পঞ্চ প্রণাম।

(৬)

দেউল * * ইত্যাদি।
পাতালে আছেন বাসুকী নাগ।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(৭)

দেউল * * ইত্যাদি।
গ্রামে আছেন বাস্তু দেবতা।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥

(৮)

দেউল * * ইত্যাদি।

গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(৯)

দেউল * * ইত্যাদি।

গাজনে আছেন ধর্ম্ম অধিকারী।

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

(১০)

দেউল * * ইত্যাদি।

গাজনে আছেন ছত্তির সাঁই

বাহাত্তর ভক্ত।

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

প্রত্যেক বন্দনার শেষে সন্ন্যাসী বা ভক্তগণ প্রণাম খাটিয়া থাকেন।

সদাশিব প্রণাম

শঙ্করাচার্য্যকৃত সদাশিবের স্তব পাঠ হইয়া থাকে।

আদেশ

জোড় হস্তে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে হয়।

গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী * * ইত্যাদি।

আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাঁঞ, বাত্তর ভক্তা ঠাকুরদের আঁচলে পঞ্চ প্রণাম করিলেন। ঠাকুরদের কি আজ্ঞে হয়?

ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল—পঞ্চ প্রণামে বড় সন্তোষ হইলেন। তোমরা নেচে কুদে ঘরে যাও।

"শিবের মাথায় চাঁপার ফুল।

ভক্ত নাচে ওড়ের ফুল ॥"

ভক্তগণ ঢক্কাবাদ্যের সহিত সমবেত নৃত্য করিয়া এবং নাম ডাকিয়া গৃহে গমন করে।

পরিশিষ্ট

(১) ধূনা পুড়ান। (২) হোমযজ্ঞ। (৩) মুক্তিস্নান (উত্তরী-মোচন)। (৪) বৈতরণী। (৫) শিবযজ্ঞ।

(১) ধূঁনা জ্বালা

সাধারণতঃ মানসিক করিয়া স্নানান্তে সন্ধ্যাকালে নূতন সরায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধূনা-চূর্ণ নিক্ষেপ করা হয়। মস্তকে ও দুই হস্তে সরা রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ধূনা জ্বালান হয়, সচরাচর ধূনা জ্বালার বিশেষ কোন মন্ত্র নাই।

"গঙ্গা জল দিআ সুদ্ধ কৈল ধূনাচুর।
চন্দনর কাট তাহে দিলাম প্রচুর॥ ৮
চন্দন কাট দিলা ঘৃত ধুনা দিআ।
ব্রহ্ম অগ্নি দিআ রামাই দিল জ্বালাইআ॥" ৯

(শূন্য-পুরাণ—ধূনা জ্বালা ৬৭।৬৮ পৃঃ)

ধূনা জ্বালাইবার সময় স্ত্রীগণ সচরাচর পুত্রকোলে করিয়া ধূনা পুড়াইয়া থাকেন।

(২) হোমযজ্ঞ

পূজাদি উৎসবান্তে যথাবিধি হোমকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। হোমকার্য্যটী যজ্ঞের শেষ পূর্ণাহুতি মাত্র। তৎপরে "যজ্ঞফোঁটা" প্রদান করা হয়। এই ব্যাপার বৌদ্ধ-বিষয়ান্তর্গত নহে। হোমযজ্ঞব্যাপারটী আমাদের হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ-বিশেষ।

(৩) মুক্তিস্নান ও উত্তরীয়-মোচন

যজ্ঞাদি সমাপনান্তে ভক্তগণ একত্র তৈল হবিদ্রাদি মাখিয়া শিবনাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্নানে গমন করে এবং স্নানকালে সূত্রগুচ্ছবৎ গললগ্ন উত্তরীয় মোচন করিয়া থাকে। সাধারণ জনগণের বিশ্বাস, দুস্থ কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই মুক্তিস্নানে ভক্তগণের সহিত যোগ দিয়া স্নান করিলে, ভগবানের কৃপায় ব্যাধিশোক-মুক্ত হইয়া থাকে। এভাব সম্ভবতঃ ধর্ম্মপূজার মুক্তিস্নান হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কারণ দেশে ধর্ম্মপূজায় মুক্তিস্নানেও এই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় এবং উহাই শিবের গাজনের অঙ্গগত হইয়া পড়িয়াছে।

"সেই ঘাটে সব্বলোক করএ চান দান।
ধর্ম্মরাজে সেবএ লোক হআ মতিমান॥" ১৯
"আঁধা বাঁঝা রোগী কুষ্ঠী চান করেন জলে।
অবিসে তাহার কাজ সিদ্ধ হএ ফলে॥" ২১

(শূঃ পুঃ—মুক্তিস্নান ১০৭ পৃঃ)

(৪) বৈতরণী

তৈলহরিদ্রা-মর্দনের পর, মুক্তিস্নানের পূর্ব্বে "বৈতরণী পার" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও শিবের গাজন উভয়েই বৈতরণী দেখা যায়।

একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করিয়া জলপূর্ণ করা হয় এবং কয়েক কড়া কড়ি, হরিদ্রা ও পুষ্পাদি তাহাতে প্রদত্ত হইলে, গাজুনে ব্রাহ্মণ বেত্রহস্তে তথায় দণ্ডায়মান হয়েন। প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে সেই ক্ষুদ্রগর্ত্তযুক্ত বৈতরণী পার করাইয়া, ভবসমুদ্র পার করা হইল বলিয়া বুঝান হয়। এই বৈতরণী পারের পর ভক্তগণ বুঝিতে পারে, মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে বৈতরণী নদী পার হইতে হইবে না এবং তাহাদের উপর যমরাজের অধিকারও নাই। বাস্তবিক এই ভাবটী হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। ধর্ম্মের গাজনে হিন্দুশাস্ত্র হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। অনেক সময়ে গোপুচ্ছ-ধারণ করিয়া ইহা পার হইতে হয়। সমুদায় গাজনতলায় এই নিয়মমত কার্য্য না হইয়া, কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়।

"নিরঞ্জন ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভার।
গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার॥" ১২ (শূন্য-পুরাণ ৫৬ পৃঃ)
"আপুনি নিরঞ্জন ধরেন কাণ্ডার। ১৮ (শূঃ পুঃ ১২৭ পৃঃ)
ধর্ম্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটালা॥"১৪ (শূন্য-পুরাণ—বৈতরণী ৫৬পৃঃ)

(৫) শিবযজ্ঞ

বৈতরণী, মুক্তিস্নানাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যার সময় মণ্ডলগৃহে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হয় এবং সমুদায় ভক্তগণ শিবসকাশে উপবেশন করিয়া আনন্দে ভোজন করিতে থাকে। ইহাকেই "শিবযজ্ঞ" বলা হয় এবং এই স্থানেই অন্নাহার করায় উপবাসাদির পর 'নিয়মভঙ্গ" করা হয়। ইহার পর আর কোন অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না।

শ্রীহরিদাস পালিত।

কামতাবিহারী ভাষাসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ*

রাজবংশী ও কোচজাতি কখন কোন্ দেশ হইতে কিরূপে এ দেশে আগমন করিয়াছে বা ইহারা আর্য্য কি আর্য্যেতর অসভ্য বর্ব্বরসম্প্রদায়ভুক্ত তাহার বিচারার্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা নহে, এ দেশের কথিত ভাষার প্রকৃতিসম্বন্ধে সুনিপুণ ভাষাতত্ত্বাভিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীকে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ডাক্তার গ্রীয়ার্স ন তাঁহার Linguistic Survey of Indiaনামক গ্রন্থে কোচবিহার, বগুড়া এবং দিনাজপুরের কতক অংশের কথিত ভাষাকে রঙ্গপুরী বা রাজবংশী ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। অধুনাও ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের কাহাকেও কাহাকেও ডাক্তার গ্রীয়ার্স নের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ বা এ দেশের কথ্য ভাষাকে কোচ ও রাজবংশীভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যত। এই শ্রেণীর কোন লেখক রাজবংশী ও কোচ ভাষার পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ গবেষণায় অভিনবত্বের বিশেষত্ব থাকিলেও, উহা যে সত্যান্বেষী ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের গন্তব্য পথে সন্দেহের তিমির বিস্তার করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্থানভেদে কথিত ভাষায় সামান্য পার্থক্য থাকিলেও মোটের উপর এ দেশবাসী সকল জাতিরই কথ্য ভাষা অভিন্ন। কোন কোন অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজে বা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে বিভিন্নদেশবাসী বিভিন্নভাষাভাষীদের সংঘর্ষ হেতু কথ্যভাষা কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তরপ্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার গ্রীয়ার্স নের আখ্যাত এই রাজবংশী ভাষাই সার্ব্বজনীন ভাষারূপে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরভেদে দুই চারটী শব্দবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া ভাষার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সুসঙ্গত নহে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও এমন কি সমগ্র সভ্য জগতে উচ্চ এবং অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যথেষ্ট ভাষাগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই ভাষাতরঙ্গিণীর বিভিন্নমুখী ক্ষীণপ্রবাহমাত্র অবলম্বন করিয়া জাতিতত্ত্বের মূল নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া কতদূর সমীচীন তাহা সুধীসমাজের বিচার্য্য।

কোচরাজবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যথাক্রমে পাল ও সেনবংশীয় ভূপালগণ এ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। পালবংশীয় রাজন্যবৃন্দ প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সেই জন্য এ দেশের কথিত ভাষা পালি ভাষার যথেষ্ট সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। বলিতে কি পালি ভাষার অস্থিকঙ্কালের উপর প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতির রস-রক্ত মেদ-মজ্জার সংযোগে এ দেশের কথ্যমান ভাষার উদ্ভব বলা যাইতে পারে। রঙ্গপুর-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১২শ ভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ দেশের কথিত ভাষার

---

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে পঠিত।

সহিত পালি ভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা বিশদরূপে প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ফলতঃ বৌদ্ধযুগে যে ভাষার অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে, সেনরাজত্বকালে যাহা সমগ্র কামতা-প্রদেশে সার্ব্বজনীন ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাকে কোচ বা রাজবংশী ভাষা এইরূপ সঙ্কীর্ণ আখ্যা প্রদান করা কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।

সেনবংশীয় শেষ রাজা নীলাম্বর* সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামরূপের অধিকাংশ এবং রঙ্গপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ী ও দিনাজপুর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজত্বের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজধানী কামতাপুরীর (অধুনা গোসানীমারীর) ভগ্নাবশেষ হিন্দুরাজত্বের শেষ নিদর্শন-রূপে হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্করশিল্পের অতুলনীয় গৌরবকীর্ত্তি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক বর্ত্তমান কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমকোণে প্রশান্তসলিলা ধবলা নদীর বামতীরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান কোচ বা রাজবংশী ভাষা তাহারই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ। এরূপ অবস্থায় এই ভাষাকে কোচ বা রাজবংশী এই জাতিগত সঙ্কীর্ণ আখ্যার পরিবর্ত্তে প্রাচীন সেন ও আধুনিক কোচরাজত্বের নামানুসারে কামতাবিহারী ভাষা নামে অভিহিত করাই যেন অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কামরূপ ও গোয়ালপাড়া প্রদেশেও এ দেশের কথিত ভাষা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার কথিত ভাষার সহিত এ দেশের কথিত ভাষার অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। এ দেশের বহুল দেশজ শব্দ অদ্যাপি কামরূপের কথিত ভাষায় অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন কি শব্দের রূপ ও বিভক্তিচিহ্নগুলি পর্য্যন্ত প্রায় একরূপ। প্রাচীন কোচবিহারী এবং অসমীয়া ভাষা যে অভিন্ন ছিল, কামরূপবড়পেটানিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বড়দলই মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীশঙ্করদেব,শ্রীমাধবদেব ও মাধবকন্দলির রচিত অসমীয়া সাতকাণ্ড রামায়ণের ভূমিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না।

"ইতিপূর্ব্বে কোরবা হৈছে কোচবিহার অসম দেশর অন্তর্গত আরু কোচবংশীয় রজা সকলে মহাভারত অসমীয়াত রচনা করোবা সময়ত প্রায় সমুদয় অসম খণ্ডর অধিকারী আছিল। নর-নারায়ণ রজার ভায়েক কমলা গোহাইর আলি কোচবিহারর পরা ডিবরুগড় লৈকে আজিও "গোহাই কমলা" আলি নামে জেলি আছে। আর কোচ রজা বিলাকর আনো আনো অনেক কীর্ত্তি আজি লৈকে অসমত আছে, এনে স্থলত কোচবিহারত পূর্ব্বে যি ভাষা চলিত আছিল, সেই ভাষাই অসম দেশর আজি চলিত অসমীয়া ভাষা।"

প্রধানতঃ ভাষাসাহিত্য সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য প্রকটিত হইয়া থাকিলেও আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক প্রমাণরূপে উহা পরিগ্রহণের কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না, কারণ

---

* ইয়ুরোপ ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে খেন বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কোচবিহারের লিখিত ও কথিত ভাষায় যে সামান্য পার্থক্য ছিল, তাহা ধর্তব্য নহে।†

পালরাজত্বের অবসান ও সেনবংশীয় ভূপালগণের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কিছুকাল এ দেশ অরাজক ছিল। এই সময়ে কোচ, মেচ, গারো, কাছারী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিগণের সংঘর্ষের ফলে তৎ তৎ জাতীয় ভাষার শব্দাবলী কামতাবিহারী ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাকৃত, সংস্কৃত ও পালিশব্দ ব্যতীত কামতাবিহারী ভাষায় যে সকল দেশজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমিত হয়। কোন কোন লেখক ঐ সকল শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বা স্বরূপত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কোচ ও রাজবংশী ভাষায় পার্থক্য-প্রদর্শনে সমুৎসুক। রঙ্গপুর ও কোচবিহারের কোন কোন স্থানের কথিত ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কোচবিহারের উত্তরাংশের ভাষা একরূপ দুর্ব্বোধ্য। ভুটানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলের কথিত ভাষায় আর্য্যেতর শব্দেরই বহুল সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী। কোচবিহারের পশ্চিমাংশের ভাষা অনেকটা জলপাইগুড়ীর ভাষার অনুরূপ, ইহাও সকলের পক্ষে সহজ বোধগম্য নহে। আবার কোচবিহারের পূর্ব্বাংশের ভাষায় কামরূপী ভাষার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। রঙ্গপুরের গাইবান্ধা ও সদর সবডিভিসনের ভাষার সহিত অন্যান্য স্থানের ভাষার মূলপ্রকৃতি এক হইলেও উচ্চারণগত সামান্য বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাইবান্ধা মহকুমার লোক হসন্তান্ত ক্রিয়াপদগুলি ওকারান্ত এবং টাকার স্থানে ট্যাকা উচ্চারণ করে আবার সদর সবডিভিসনে 'করিছে'র স্থলে করোচে, 'খাইতেছে'র স্থলে খাওচে, এইরূপ উচ্চারিত হয়। এ দেশের অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে ডাঐ, বাদীয়া, তেলেঙ্গা ও নমঃশূদ্র জাতির ভাষায় বিলক্ষণ উচ্চারণগত পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপ পরিচয় না পাইলেও কেবল উচ্চারণ শুনিয়া ঐ সকল জাতিকে বেশ চিনিতে পারা যায়।

ডাঐ ও নমঃশূদ্রজাতির উচ্চারণ অনেকটা একরূপ। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

কামতাবিহারী শব্দ	ডাঐ বা নমঃশূদ্রজাতির উচ্চারণ	অর্থ
কাঞ্	কাইঞ্	কে
কোন্টে	কোণ্টই	কোথায়
খাইয়	খেইয়	খাওয়া
চাকই	চক্কই	মৎস্যবিক্রয়ের খাঁচা

বাদীয়ার ও তেলেঙ্গাজাতির মধ্যে একরূপ ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা সেই সেই জাতির ভাষা নামে কথিত হয়। উহা এরূপ দুর্ব্বোধ্য যে সাধারণের পক্ষে তাহাতে দন্তস্ফুট করা

† "In the old Rajvansi dialect there was very little difference between the written and the spoken language." The Cooch Behar State and its land revenue settlements, page 201.

দুঃসাধ্য। স্ব স্ব সমাজের লোকের সহিত কথোপকথনের সময় তাহারা উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এ দেশের নস্ত আখ্যাধারী মুসলমানসমাজ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিশাল রাজবংশী সমাজেরই একটী বিচ্ছিন্ন অংশ। নষ্ট নস্‌স বা নস্ত উপাধিটী তাহাদের ধর্ম্মভ্রষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথিত ভাষায় যে বিশেষ ব্যবধান নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমানদের ভাষায় নানা, নানী, চাচা, ফুফু ও শাল্লা কাল্লা প্রভৃতি যে গুটিকয়েক যাবনিক শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একরূপ নগণ্য।

প্রাচীন মেয়েলী সাহিত্য-ছড়া ও গ্রাম্যগীত হইতে সেকালের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। সর্ব্বত্র না হউক এ দেশের কোন কোন স্থানে বিবাহ, অন্নারম্ভ প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও কুলকন্যাগণের গীত গাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই সকল গীতের রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়। উক্ত গানগুলির মধ্যে কোন কোনটীর রচনা এরূপ প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ যে কলকণ্ঠপিকবরনিন্দী কামিনীর সুমধুর বামাকণ্ঠে উহা তানলয়যোগে গীত হইতে শুনিলে, হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যসভ্যতার কলুষপঙ্কিলস্রোতে এক্ষণে প্রাচীন রীতিনীতি ভাসিয়া যাওয়ায়, এই সকল মেয়েলী গীতগুলিও ক্রমশঃ আমাদের জাতীয়সাহিত্য হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। সরল গ্রাম্যকবির আড়ম্বরহীন রচনা এ দেশের কথিত ভাষার প্রকৃতিনির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া নিম্নে এই শ্রেণীর একটী গীত উদ্ধৃত হইল। উহা যে বিবাহের সময় সম্প্রদানকালে উদ্গীত হইয়া থাকে, গীতটী পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"পাট আগিনা বিচিত্র আলিপনা চান্দোয়া করে ঝলমল।
বসিছে জনকরাজা যত জ্ঞাতিবন্ধু লয়া॥
জনকে করে আজ্ঞা শীঘ্র আন সীতা বিয়ার লগ্ন যায় বয়া।
(বাজিছে উৎসবের বাজ)
হাত পাও ধুইয়া জলে—বসিল সীতা বাপের কোলে
বাপ লয়া করুণা করে।
সংসারের নারায়ণী বাপের প্রাণখানি হেন ঝিয়ক পরে যায় লয়া॥
বসিয়া উজল পীড়ায় বা'র করে সুন্দর সীতায় নিয়া যায় সীতাক
ছায়ামণ্ডপের তলে।
তোলাতুলি সপ্তবার জয়ধ্বনি জোগাড় হ'ল সীতার মুখচন্দ্রিকা
তিনগোটা তুলসী পঞ্চগোটা হরিতকী দান করিলে গঙ্গাজলে।"

উল্লিখিত গীতটী ভাবসম্পদ বা রচনাচাতুর্য্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত যে সকল শব্দ-সমাবেশে উহা রচিত, তাহার অধিকাংশই সাধু বাঙ্গলাভাষা হইতে গৃহীত। এ দেশের রাখাল বালক বা কৃষকযুবকগণ মাঠে গোচারণকালে অথবা ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে যে সকল

আদিরসাত্মক গান গাইয়া থাকে, তাহারও অধিকাংশ এইরূপ মার্জ্জিতশব্দবহুল। ঐ সকল সঙ্গীতে আদিরসের প্রভাব অত্যধিক হইলেও উহার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য, সামাজিক আচারব্যবহার, রীতিনীতির পরিচয় প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত আছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনার্থ এই সকল গ্রাম্যসঙ্গীত, মেয়েলী ছড়া, প্রবাদ-বচন ও হেঁয়ালীগুলি সংগ্রহের আবশ্যকতাও অল্প নহে। এ দেশী কথিত ভাষার গতিনির্ণয়ের সুবিধার্থ এই শ্রেণীর একটি ভাওয়াইয়া গানের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এ গীতটী নিরক্ষর গ্রাম্যকবির রচিত হইলেও বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে বহু সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শব্দের সমাবেশ উহাতে লক্ষিত হইবে।

"গেইলে কি আসিবেন সিপাইরে
ঢাল বান্ধেন তলয়ার বান্ধেন তুইনা বান্ধেন পাগুরী
বিহাও করি ছাইরে গাইছেন সিপাই অল্প বয়সের নারীরে।
ঐ নয়া ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যায়ছেন্ গুয়া।
পর পুরুষে খাইবে গুয়ারে চোচার ভাগী তোমরা রে॥
নয়া ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যায়ছেন্ কলা।
বউছল বাদুরে খাইবে কলা চোচার ভাগী তোমরা রে॥"

গীতটীতে কোন নবপরিণীতা তরুণী সুদীর্ঘ বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুলা হইয়া বিদেশ-গমনোদ্যত স্বামীকে ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

কামতাবিহারী ভাষায় মৈথিলী-শব্দের সংখ্যাও অল্প নহে, তবে কথিত ভাষাপেক্ষা লিখিত ভাষাতেই উহার সমধিক প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। রাজা নীলাম্বর কর্ত্তৃক আনীত মৈথিল ব্রাহ্মণগণ এদেশে ভাষা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক কি না তাহা নিশ্চিত রূপে বলা সহজ-সাধ্য না হইলেও অধুনা প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ যে সকল পুরাতন গ্রন্থের অস্তিত্ব আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সমাগত মৈথিল-ব্রাহ্মণগণের সুযোগ্য বংশধরগণ কর্ত্তৃক রচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদক কবিবর গোবিন্দমিশ্র, মহাভারতকার রাম সরস্বত্যুপাধিক অনিরুদ্ধ ও দ্বিজ শ্রীনাথ প্রভৃতি অমর কবিকুলতিলকগণ সকলেই মৈথিল-ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। ইহঁাদের পূর্ব্বে কোন কবি এ দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যরসের পীযুষ-প্রবাহে অভিষিক্ত করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের স্মৃতি অতীতের যবনিকান্তরালে লুক্কায়িত।

অতঃপর কামতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী, ক্রিয়ার রূপ, বিভক্তি প্রভৃতি ব্যাকরণ-গত দুই একটি নিয়মের উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

সাধারণতঃ এ দেশের নিম্ন-জাতীয় লোক শব্দের আদ্য র স্থানে অ ও অ স্থানে র উচ্চারণ করিয়া থাকে। রামচন্দ্রের স্থানে আমচন্দ্র, রাইতের স্থানে আইত, রবিবারের স্থানে অবিবার, রৌদ্রের স্থলে ঔদ, এবং রাখালের স্থানে আখোয়াল ও রোবার স্থানে ওব্যা, আমের স্থানে রাম, আঁখোর স্থানে রাঁখা, এবং আগালের স্থানে রাগাল, এইরূপ।

উচ্চারণ সৌকার্য্যার্থ অনেক শব্দের, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ-বিয়োগে হ্রাসবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ কতকগুলিশব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

বাঙ্গালাশব্দ	কামতাবিহারী শব্দ
মানুষ	মান্‌ষী
পা	পাও
বাবা	বা
বোনাই	বমু
না	নোয়ায়
নূতন	নউতন
গাছ	গছ্‌
পাখী	পখী
মহিষ	মইষ
আসিল্‌	আইল্‌
কাঁঠাল	কাটোল
কন্যা	কইনা
পয়সা	পাইসা
করিয়া	করি
শাশাক	শুঁশা
পাট	পাটা
কেন	কেমে
একখানা	এক্‌না
হইতে	হাতে
এ দিকে	এত্তি
এ দিক্‌দিয়া	এদিয়া

ক্ষেত্র ও বনের পরিবর্ত্তে বাড়ী শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা ধানবাড়ী, পাটাবাড়ী, বাঁশবাড়ী, খ্যাড়বাড়ী, জঙ্গলবাড়ী ইত্যাদি।

ব্যক্তি-বাচক সর্ব্বনাম উত্তম ও মধ্যমপুরুষে সম্ভ্রমার্থে এক বচনের স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যথা :—

মুঁইঞ্‌	সম্ভ্রমার্থে	আমরা
তুঁইঞ্‌	ঐ	তোমরা
তাঁঞ্‌	ঐ	তাহারা

উল্লিখিত বহুবচনের সহিত কেবলমাত্র গুলা বা ঘর শব্দ সংযোগে প্রকৃত বহুবচনে পরিবর্ত্তিত করা হয় যথা, আমরা-গুলা, তোমরা গুলা, তাম্রাগুলা। আমার ঘর, উমার ঘর ইত্যাদি।

নামবাচক বিশেষ্য পদগুলির সহিত এইরূপ যথাক্রমে কোণা ও গুলা শব্দ যোগ করিয়া একবচন ও বহুবচন করা হইয়া থাকে। যথা—

একবচন	বহুবচন
মানুষ কোণা	মানুষগুলা
পখী কোণা	পখী গুলা
হাতী কোণা	হাতীগুলা

ভয় ও রাগ এই বিশেষ্য পদ-দ্বয় সাধারণতঃ খাওয়া শব্দের যোগে ক্রিয়া-পদে পরিণত হইয়া থাকে। যথা, ভয় খাওয়া, রাগ খাওয়া, হাতাস খাওয়া। আবার নিশ্চয়ার্থেও অনেক সময় অসমাপিকা ক্রিয়ার পর খায় শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন, খাওয়া খায়, শুতা খায় ইত্যাদি। লাগিবে শব্দের পরিবর্ত্তেও অনেক সময় খাইবে শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা, ঘর কোণা বাঁধিতে মাস খানেক খাইবে।

কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের পদান্তস্থ কে শব্দের স্থানে ক্ এবং তে স্থানে ত্ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—তোক্, আমাক্, উমাক্ ভাইক্ এবং নদীত্, ঘরত্, জঙ্গলত।

না এই ক্রিয়াবিশেষণটী প্রায়ই অসমীয়া ভাষার ন্যায় ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং কর্ত্তা পদের অন্তে বসে, যথা—না যাওঁ মুইঞ্, না খাওঁ মুইঞ্, না করোঁ মুইঞ্, না শুতোঁ মুইঞ্।

কোন বিষয় কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ আবশ্যক হইলে, হুড়্, হিড়্, হাব্ প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, হুড্ দেখ্, হিড্ শুন্, হাব আয়্ ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের অন্তস্থ অক্ষরে তুচ্ছার্থে হসন্ত এবং সম্ভ্রমার্থে ওকার যোগ করা হয় যথা থাক্ থাকো, কর্ করো, শুত্ শুতো ইত্যাদি। আবার আকারান্ত ক্রিয়া-পদের তুচ্ছার্থে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল সম্ভ্রমার্থে একটি ও বা ওকার মাত্র সংযোগ করা হইয়া থাকে, যথা—খা খাও যা যাও।

কাল ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের গুটিকয়েক রূপ নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে।

কৃ ধাতু

উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
মুইঞ্ করোঁ	তুইঞ্ কর্	তাঁয় করছ্
	তোম্রা করো (সম্ভ্রমার্থে)	তাম্রা করছ্ (সম্ভ্রমার্থে)
মুইঞ্ করিম্	তুইঞ্ করেক্	তাঁয় করবে
মুইঞ্ কৃইচোঁ	তুইঞ্ কচিস্	তাঁয় করছে

গম্ ধাতু

মুইঞ্ যাঁও	তুইঞ্ যা	তাঁয় [illegible]

	তোম্‌রা যাও (সম্ভ্রমার্থে)	তাম্‌রা যাউক্‌ (সম্ভ্রমার্থে)
মুইঞ্‌ যাইম্‌	তুইঞ্‌ যাবু	তাঁয় যাইবে
	তোম্‌রা যামেন্‌ (সম্ভ্রমার্থে)	তাম্‌রা যাইবে (সম্ভ্রমার্থে)
মুইঞ্‌ গেইচোঁ	তুইঞ্‌ গেছিস্‌	তাঁয় গেছিল
	তোমরা গেইছেন্‌ (সম্ভ্রমার্থে)	তাঁমরা গেছিল (সম্ভ্রমার্থে)

কতকগুলি ক্রিয়াপদের বর্ত্তমানকালে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষভেদে যথাক্রমে ধর্‌চোঁ, ধর্‌চে এবং ধর্‌ছিস্‌ শব্দ যোগ করা হয়, যথা মুইঞ্‌ যাবার্‌ ধরচোঁ, উম্‌রা যাবার ধর্‌ছে, তাঁয় আসবার্‌ ধর্‌ছে।

সম্ভাব্য ভূতকালে ক্রিয়ার পর হয় শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন, তোম্‌রা যদি গেলেন্‌ হয়, তাঁয় যদি আসিল্‌ হয় ইত্যাদি।

সম্বোধনে বাৎসল্যার্থে পুংলিঙ্গে বাপই ও স্ত্রীলিঙ্গে মাইঞ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার স্থল-বিশেষে নায়কনায়িকার প্রেম-সম্বোধনেও বাপই ও মাইঞ শব্দ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিম্নোদ্ধৃত গীতাংশ তাহার প্রমাণ।

"বাপই রে মোক কাঁকই কিনিয়া দে
নউতন বাহারের চুল মোর বাতাসে হালে।
বাপই রে আজ্‌ বালাটারীর হাট্‌
আর সদায় মোর যেমন্‌ তেমন্‌ চুণ তামাউকের পাতা।"

আবার অন্যত্র,—

"সুন্দরীক মাইঞ্‌ তুঁই যেমন তার ঢপের মাইয়া তোর সোয়ামী মিলে নাই।
যাটায় পথে মাইঞ্‌ তোর নাগাল্‌ পাঁও ওরে পাকা কলার মত গিলিয়ারে খাঁও
তোকে পাইলে মাইঞ্‌ ছাড়ো বাপো মাও।"

বাপই ও মাইঞ ব্যতীত এ দেশে আর একটি সম্বোধনপদ প্রচলিত আছে, তাহা বাহে। পরিহাসরসিক বৈদেশিকগণ ভাষাতত্ত্বের গূঢ়রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া এ দেশের লোককে বাহে এবং এ দেশকে বাহের দেশ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বাহে শব্দটী বাবাহের অপভ্রংশমাত্র। শব্দসংক্ষেপানুরোধে দ্বিতীয় অক্ষরটি লুপ্ত হওয়ায়, বাহেরূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য

পর্ব্বতবাসী ও অরণ্যচারী অসভ্যজাতি ভিন্ন সমস্ত সভ্যজনপদবাসীর ভাষা দুই প্রকার—লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষা। লিখিত ভাষা মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ এবং কথিত ভাষা অসতর্কিত রূপে ব্যবহৃত বলিয়া অমার্জ্জিত ও প্রায়ই অশুদ্ধ বা ব্যাকরণদুষ্ট। কোন কোন স্থানের এই উভয়বিধ ভাষার এত প্রভেদ যে, সহজে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। যথা—

"সে স্বসেরা নিন্দাছে
সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।
ছ্যাকা পারিবার গেইছে।
খারে কাপড়্ কাচিতে গিয়াছে।"

কোচবিহার বঙ্গদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত এবং পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন। উপরে যে গ্রাম্যভাষার আদর্শ দেওয়া হইল, তাহা কোচবিহারেরই গ্রাম্য-ভাষা। উহা বাঙ্গলাভাষার রূপান্তর বই আর কিছু নহে।

কোচবিহারবাসিগণ সাধারণতঃ কোচনামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহারা এই নামে পরিচয় দিতে নারাজ, আপনাদিগকে রাজবংশী বলে। ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়ার্সন তজ্জন্ত এতদ্দেশীয় ভাষাকে রংপুরী বা রাজবংশী ভাষা বলিয়াছেন। তাহা বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ ভাষা নহে, সামান্ত পার্থক্যপ্রযুক্ত সে রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক্ ভাষা বা dialect বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যদি রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক্ dialect ভাষা বলিতে হয় তাহা হইলে ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীর চলিত ভাষাকেও একটা পৃথক্ ভাষা বলিতে হয়। নানা স্থানের কথিত ভাষায় সেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পৃথক্ ভাষা নহে, লিখিত ভাষা লইয়াই ভাষাভেদ বিচার করিতে হয়। কোচবিহারের লিখিত ভাষায় এমন কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না, যাহাতে তাহার একটা পৃথক্ নাম দেওয়া যাইতে পারে। কোচবিহারের ও এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিলে, ইহা-দিগকে এক জাতীয় ভাষা বই অন্ত কিছু বলা যাইতে পারে না। আমরা পশ্চাৎ তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় "কোচ ও রাজবংশী শব্দসংগ্রহ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে যে রাজবংশী শব্দের তালিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে "কাণ", "[illegible]", "তালু", "ভুরু", "গাল", "জিভা", "চাম্ড়া", "বুক", "আঙ্গুল", "পাও", "হাটু", "গর্দান", "[illegible]", "চেংড়া", "দলি", "কাকই", "শিরসিক" "দেহের", "আণ্ডাবাচ্ছা" প্রভৃতি প্রায় অর্দ্ধেক শব্দ

এতদ্দেশীয় গ্রাম্যশব্দ হইতে অভিন্ন। কোচবিহারের সাধারণ লোকের উচ্চারিত গ্রাম্য-ভাষার সৌসাদৃশ্য এই যে, তাহারা "অ" স্থানে "র" এবং "র" স্থানে "অ", "উ" স্থানে "রু", "রা" স্থানে "আ", "রু" স্থানে "উ", "রো" স্থানে "ও" এবং "রৌ" স্থানে "ঔ" উচ্চারণ করে। যথা—"রমণী" "অমনী", "রাত্তির" "আত্তির", "রূপনাথ" "উপনাথ", "রৌদ" "ঔদ" ইত্যাদি। আমাদের এতদ্দেশের কোন কোন স্থানের প্রাকৃত লোকেও এরূপ উচ্চারণ করে শুনা গিয়া থাকে। কোচবিহারের লোকের উচ্চারিত শব্দের মধ্যবর্ত্তী 'র" লুপ্ত ও তাহার পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বিত্ব হয়; যথা—"তোর্ধা" স্থলে তোধ্‌ধা ইত্যাদি। এরূপও এতদঞ্চলের অনেক স্থানের গ্রাম্যভাষায় দৃষ্ট হয়।

স্বরবর্ণের উচ্চারণে স্বরের এবং শব্দাংশের লোপ এই স্থানের কথিত ভাষার একটা প্রধান লক্ষণ; যথা :—

মানুষ	মান্‌সী।	বাবা	বা।
পাখী	পখী।	বনাই	বনু।
মাসী	মসী।	করিয়া	করি।
গাছ	গছ।	তোকে	তোক্।
বেটাকে	বেটাক।	পাতকুয়া	পাট্‌কী।
মাঠেতে	মাঠত।	আলাপ	আল্লা।
		একখানা	একনা।

খাওয়া শব্দটা অনেক স্থলে করিবার এবং আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

(আগ)	রাগ খাওয়া	রাগ করা।
	হতাশ খাওয়া	ভয় পাওয়া।
	এ কামে এক মাস খাইবে	এ কাজে একমাস লাগিবে।
	মোর যাওয়া খাইবে	আমাকে যাইতে হইবে।

সর্ব্বনামের ব্যবহারেও পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় পুরুষের বহুবচনের রূপ একত্ব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা,—

আমি	স্থলে	আমরা
তুমি	"	তোমরা

এইরূপ মান্‌সীগুলা, ছাওয়ালগুলা ইত্যাদি। সম্মানসূচক 'আপনি' 'তিনি' 'উনি' ইত্যাদি শব্দ কোচবিহারের ভাষায় নাই। তৎপরিবর্ত্তে "তোমরা" "উমরা" "ইমরা" শব্দের ব্যবহার আছে।

সপ্তমী বা অধিকরণ বিভক্তির জন্য "তে"র পরিবর্ত্তে—'ত"ব্যবহৃত হয়, যথা—ঘর, ঘরত;

নদী—নদীত, বাসা—বাসাত, ইত্যাদি শুধু গ্রাম্য ভাষাতে নহে, লিখিত ভাষাতেও এ প্রকার অধিকরণের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"বিহারে বিরাজে চন্দ্র দেবেন্দ্র ভূপাল।
গগনে উদিত চন্দ্র বুঝে কালাকাল॥
অসিত 'পক্ষত' সে যে না হয় উদয়।
গগনে উদিতচন্দ্র সিতে অভ্যুদয়॥"

কোচবিহারের অনূদিত রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

এতদ্দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না, যথা—

"শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িল 'ভূমিত'॥"

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ২২৪ পৃঃ।

সেইরূপ কর্ম্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তির "কে" স্থলে "ক" ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

"প্রতাপী সে কপিবর নিরখয় তাত পর
লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননে।
কোপাবিষ্ট দুরাশয়, ভীষণ লোচনদ্বয়,
ভয় হয় "তাক" দরশনে।"

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ অনুবাদিত রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন কাব্যেও এরূপ প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে,—

"এখনি আসিব, নিমাইর্ বাপ,
ক্ষীর কদলক্ লৈয়া।"

বঙ্গবাসী আপিশ হইতে প্রকাশিত "চৈতন্যমঙ্গল" ৩৮ পৃঃ।

কোন কোন স্থলে কোচবিহারীয় এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় "র"এর পরিবর্ত্তে ষষ্ঠী বিভক্তিতে "ক" ব্যবহৃত হয়,—

"বিহারক" রাজপুরী নামে অমরাবতী।
বীর নারায়ণ দেব যার অধিপতি॥"

মহারাজ বীরনারায়ণ রচিত কিরাতপর্ব্ব।

"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
নিত্যানন্দ রাম বন্দো 'রোহিণীক' সুত॥"

বঙ্গবাসীর চৈতন্যমঙ্গল ২ পৃঃ।

এতদ্দেশে প্রচলিত প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়ায় যথাক্রমে "ই" ও "এ" বিভক্তি স্থলে "ঙ এবং "এন"র ব্যবহার হয় যথা,—

বর্ত্তমান কালে—আমি করি… …মুই করো।
তুমি কর … … তোমরা করেন।
অতীত কালে—আমি গিয়াছি … মুই গেইছো।
তুমি গিয়াছিলে…তোমরা গেইছেন।

এতদ্দেশীয় ভাষায় উহাদের ব্যবহার,—

বর্ত্তমান কালে—"সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারো।" চৈতন্যভাগবত, ১৭৩ পৃঃ।

অতীতকালে— কি দেখিলুঁ গোরারূপ অপরূপ ঠান।
কি দেখিলুঁ সকরুণ অরুণ নয়ন॥"

এতদ্দেশীয় ভাষাতেও ভবিষ্যৎ কালের ঐ ঐ ক্রিয়ায় "মু" বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কোচবিহারের ভাষাতেও ইহা বিরল নহে,—

"প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার' ভিতরে॥" ঐ ১৩৬ পৃঃ।

ইংরাজী progressive formএর রূপ বাঙ্গলায় বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, যথা—আমি যাইতেছি, সে হাসিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু কোচবিহারের ভাষায় "মুই যাবার ধরচো", "তোমরা হাসিবার ধরচেন" এই প্রকার হইয়া থাকে।

কতকগুলি প্রকৃত ক্রিয়ার রূপও উভয়ত্র সমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—কোচবিহারের লিখিত ভাষায়—

"স্বর্গ মঞ্চত পাতালন্ত আশ্রয় যি জন।
জিনিলন্ত যিতো জনে রাক্ষস দুর্জ্জন॥"

কোচবিহারের অনুবাদিত গীতগোবিন্দ।

অন্যত্র— "কন্দর্পের শরে হৃদয় জর্জরে,
বিহনে বিকল হয়্যা।
অন্ধকার বনে কাহক লাগনে,
'ভ্রমন্ত' বিষাদে চায়্যা॥" ঐ ঐ

প্রাকৃত রূপ এতদ্দেশীয় প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত—

"সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥"

কবীন্দ্র-প্রণীত মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব।

অন্যত্র— "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥" চৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহকার কোচ ও রাজবংশী ভাষায় বহুল শব্দ সংগ্রহ

করিয়াছেন, অতএব পুনরুক্তিদোষপরিহারের জন্য এ স্থলে তাহাদের উদ্ধার করা অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

কোচবিহারের ভাষার সহিত আসামী ও বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। সে কারণে প্রথমোক্ত স্থানের ভাঁষাকে বাঙ্গলা ভাষা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, আসামী ভাষাতে সেইরূপ তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারের লিখিত ভাষার সহিত এতদ্দেশপ্রচলিত ভাষার সৌসাদৃশ্য ছিল, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবতাদির ভাষা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, নিম্নে আসামী ভাষার সহিত বাঙ্গলা ও কোচবিহার-প্রচলিত ভাষার যে কি প্রভেদ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

"ঘুমুছা সঙ্গে রঙ্গে প্রভু দেব হরি।
থাকিলা অনঙ্গ কেলি কৌতূহল করি॥
এহি মতে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভু দামোদর।
সাত দিন্ বঞ্চিলন্ত ঘুমুছার ঘর॥
শুনিয়োক সাবধান হইয়া সর্ব্বজন।
মহা মহেশ্বর কৃষ্ণ যাত্রার কীর্ত্তন॥" শ্রীধরকন্দলী।

ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এবং এতদ্দেশের কথিত ভাষার যে যোজনান্তর একটু আধটুক রূপান্তর আছে তাহাও সত্য। হুগলীজেলার বদনগঞ্জ থানায়, বাঁকুড়ার কোতলপুর ও অন্যান্য থানার এবং মেদিনীপুরের রামজীবনপুর থানার অধিবাসিগণ তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়ার শেষে প্রায়শঃ "ক" সংযুক্ত করিয়া থাকেন, যথা—দিলেক, নিলেক, হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বন-বাসাদির দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণে হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি ক্রিয়ার রূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। বহুবচনের "দিগ" বিভক্তিটা আমাদের চোখের উপর বাঙ্গলা ভাষা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এক্ষণে "আমাদিগের" "তাহাদিগের" স্থলে আমাদের তাহাদের ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে। কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা হইতে এতদ্দেশীয় আধুনিক ভাষার এই প্রকারেই পার্থক্য ঘটিয়া থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোচবিহারের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারেই আসাম বা পুরাণ-প্রথিত প্রাগ্জ্যোতিষপ্রদেশ। কোচবিহারের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, উক্ত প্রদেশে এখনও কোচজাতীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে তাঁহারা যে মিথিলা ও আসাম অঞ্চল হইতে যে ব্রাহ্মণদিগকে কোচরাজ্যে উপনিবিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে আসামী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। তৎ-পূর্ব্বে কোচবিহারে রাজবংশী ভিন্ন অন্য জাতির বাস ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণের দ্বারাই এ দেশে লিখিত ভাষার প্রচলন হয়। কালসহকারে রাজবংশী ভাষার সংস্রবে তাহাদের ভাষা বিকার প্রাপ্ত হইয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। এ জন্য কোচবিহারের লিখিত

তাহা খাঁটী আসামী ভাষা নহে। বঙ্গভাষার সহিত আসামী ও রাজবংশী ভাষার যে কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাজার উৎসাহ না মিলিলে কোন দেশের ভাষার পুষ্টি ও শ্রীসমৃদ্ধি সাধিত হয় না। কোচবিহারের অধিপতিগণ সে পক্ষে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা কোচবিহারের ভাষার উন্নতি-পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন। দেশীয় কবির অন্নচিন্তানিবারণার্থ যথেষ্ট ভূমি ও অর্থ দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। দেশীয় ভূস্বামিগণের উৎসাহ ও আনুকূল্যে আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, যথা—ঘনরাম, কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর প্রভৃতি কবি। তাঁহারা দেশীয় রাজন্যগণের কৃপায় দেশীয় সাহিত্যে আপনাদিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন। রাজার উৎসাহ না পাইলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেন না, দেশীয় সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম মুছিয়া যাইত, সাধারণ লোকের স্থায় তাঁহাদিগকে দিনপাত করিতে হইত। কেননা সেকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ লিপিকারগণকে বেতন দিয়া নূতন কাব্য লেখাইয়া লইতেন, তাহাতে গ্রন্থকারের কোন লাভ ছিল না, এরূপে নিজের সময় নষ্ট করিয়া কয় জন কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন? আজিকালি গ্রন্থকর্তৃত্ব দ্বারা যেমন অর্থাগমের উপায় হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। বিশেষ অর্থবান্ না হইলে কেবল মাত্র সুনাম সুখ্যাতির জন্য অতি অল্প লোকই সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কোচবিহারের নরপতিগণের দ্বারা তদ্দেশীয় কাব্যের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কার্য্যানুরোধে সাত আটবৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারের রাজধানীতে গিয়া আমাকে তিন চারিমাস তথায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তৎকালে সেখানকার ৺ মহারাজ ভূপবাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পুস্তকালয়ে গতিবিধির সুযোগও ঘটিয়াছিল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সাধুতা ও সচ্চরিত্রতায় আমি সকল সুবিধাই পাইয়াছিলাম। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গলা পুস্তকগুলি বিশেষতঃ যে গুলি এ পর্য্যন্ত অমুদ্রিত অবস্থায় আছে, সেই গুলিই আমার আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোচবিহারের কবিগণের কৃতিত্ব দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ক্রমে সে গুলির পরিচয় দিতেছি।

১। পুস্তকালয়মধ্যে কোচবিহারের কবিদিগের যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে "কিরাতপর্ব্ব" পুস্তকখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহারাজ বীরনারায়ণের অধিকারকালে কবিশেখর উপাধিধারী রামকৃষ্ণ নামক কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজ বীরনারায়ণ খৃষ্টীয় শকের ১৬২১ হইতে ১৬২৫ পর্য্যন্ত কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিরাতপর্ব্বের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, গ্রন্থের নানা স্থানে কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অন্তল পুরত রাজরমণী।
বেশ করে শুনি মনোমোহিনী।
মল্লিকামালায় কবরী সাজ।
নীলগিরি যেন গঙ্গার মাঝ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে পিন্ধিল। †
পূর্ণচন্দ্রে যেন অগ্নি লাগিল॥
খঞ্জন গঞ্জন চারু চঞ্চল।
লোচনযুগলে লেপি কজ্জল॥
যেন কামবাণে গেড়ল দিয়া।
ভুরু শরাসনে থুইল জুড়িয়া॥
তথাপি তরুণ তস্কর ডরে।
উপরে হেমঘণ্টা ধ্বনি করে॥
উরুর শোভা কহিতে না পারি।
যেন রামরম্ভা মানিছে হারি॥
চরণকমল মনক লোভা।
মত্তগজ জিনি চরণশোভা।
তাত রুনু ঝুনু নূপুর বাজে।
জগৎ জিনিতে মদন সাজে॥
বীরনারায়ণ নৃপতি মণি।
কবিশেখরের মধুর বাণী॥

অন্যত্র—

বিহারক রাজপুরী নামে অম্রাবতী।
বীরনারায়ণদেব যার অধিপতি॥
মধুর মধুর মহাভারত ভারতী।
বোলা রামকৃষ্ণ কবিশেখর বদতি॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভকালে কোচবিহারের কবি বলিয়া নহে, এতদঞ্চলের কবির রচিত, হইলেও কাব্যখানি কোন অংশে অনাদৃত হইবার নহে।

যে সময়ে কোচবিহারের কবি এই গ্রন্থখানির রচনা করেন, সে সময়ে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবকবিগণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য অসংখ্য কাব্য রচনা করিতেছিলেন।

২। মহারাজ বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ খৃঃ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারে রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকারকালে শ্রীনাথ-নামক জনৈক

† পরিল।

ব্রাহ্মণ "দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যাংশে ইহা কোন মতে হীন নহে। বরং স্থানে স্থানে কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে কাশীরামদাসের রচিত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনার তুলনা করিলে উভয়ের প্রতিভার পরীক্ষা হইবে। শ্রীনাথের কাব্যে কল্পনা আছে—সেই কল্পনা লাবণ্যময়ী হৃদয়গ্রাহিণী, কাব্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পক্ষে অসাধারণ শক্তিশালিনী। আমরা ব্রাহ্মণ-কবির সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারি না। পাঠকগণ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন, আমরা তাঁহার কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অনন্তর দ্রৌপদীর পুরস্ত্রী সকলে।
বিধিমতে স্নান করাইল কুতূহলে॥
গোরচনা তীর্থজল কুঙ্কুম চন্দনে।
দ্রৌপদীক স্নান করাইল এয়োগণে।
তার পর সখীগণে করাইল বেশ।
আগরের ধূপ দিয়া শোন্দাইল কেশ॥
বান্ধিল কবরী যেন মদনের ছায়া।
সিন্দুর তিলক দিল তার কামছায়া॥
খোপার উপরে দিল মল্লিকার মালা।
মনমৃগ বন্দী করিবার যেন ছলা।
লোচনযুগলে চারু পিন্দাল ‡ অঞ্জন।
কমল দলত যেন বসিল খঞ্জন॥
অঞ্জনের রেখা দিল ভ্রূযুগে লেপন।
কামদেব ধনুত যেন চড়াইল গুণ॥
রবি শশী জ্বলে যেন কর্ণত কুণ্ডল।
লাবণ্যলতার যেন গোটা দুই ফল।
নাসার উপরে শোভে মুকুতার ফল।
তিলপুষ্পে পড়িয়াছে যেন হেমজল॥
কুচের উপর শোভে মুকুতার হার।
সুমেরু শিখরে যেন গঙ্গাজল ধার॥
করত কঙ্কণ শোভে বলয়া ভুজত।
চন্দ্রকলা জ্বলে যেন আকাশতলত॥

‡ পরাইল।

চরণে পিন্দাল ছুই বাজন নুপুর।
রাজহংস সকলের গর্ব্ব গেল দুর॥
কুসুমে রঞ্জিত বস্ত্র দেবাঙ্গ ভূষণ।
পরিপাটী করিয়া পিন্দাইল সখীগণ॥
বিবাহ মঙ্গলসূত্র বান্ধিল মদনী।
রুচিকর হৈল যেন দ্রুপদনন্দিনী॥
কি কহিব দ্রৌপদীর রূপের মহিমা।
বিধাতার নারী হেতু নির্ম্মাণের সীমা॥
স্বামীক বরিতে চলিছে বালা।
হাতে সুবর্ণের পঙ্কজমালা॥
নিতম্ব ভারে গজগতি যায়।
টলমল সর্ব্বঅঙ্গ করয়।
রুমু ঝুমু বাজে নুপুর পায়।
সপ্ত মদনক যেন জাগায়।
নুপুর শব্দে মজি গেল মন।
কোকিলের ধ্বনি মানি তেমন॥
ভূপতিগণের চিত্তচকোর।
কৃষ্ণা মুখচন্দ্রে হৈ গেলা ভোর॥
রূপে সুধাকর পিয়েন আনে।
চন্দ্রের রশ্মি চকোরগণে॥
দ্রৌপদীর মুখ চন্দ্রমণ্ডল।
সভাসমুদ্রক কৈল তরল॥
যে ভিতি চাহিল আড়নয়নে।
দগ্ধ হইল সেহ মদনবাণে॥
কে বর্ণিতে পারে রূপ তাহার।
জয়লক্ষ্মী যেন কামরাজার॥
মদনে দহিল সবার চিত।
ভারত কথা অতি মনোনীত॥
প্রাণনারায়ণ মন মন্দির।
বিদধি যেন অঙ্গ টৈহির॥
ভূপতিকদের পুত্র স্বজনে।
শ্রীনাথ ভনে আজ্ঞা পরমাণে॥”

বলদৃপ্ত পার্থ লক্ষ্যভেদ জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ধনুঃশর গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন,—

"বৈশম্পায়ন কয়, তবে ধনঞ্জয়,
বিপ্রসভা পরিহরি।
ধনু বড় দেখি, খালি কোনা পেখি,
উঠিল যেন কেশরী॥
যেন দেখি সর্প, করি মহাদর্প,
গরুড় চলিল ঝম্পে।
গজগতি সম, সিংহ পরাক্রম,
ধমকে ধরণী কম্পে॥
দেখি চমৎকার, রাজা সমাজের,
বিস্ময় হৈ গেল মনে,
ক্রমে কোন বীর, পরম গম্ভীর,
পরিত্তস্ † নাহি কেনে॥
ব্রাহ্মণ সবার, হৈল হাহাকার,
অর্জ্জুন উঠিল যবে।
কৃষ্ণা সে লপট, করি ঝট পট,
বলিতে লাগিল সবে॥
ব্রাহ্মণ বালক, উঠিল কিশক,
সবে বিপ্রে দেহ হাঁস।
সবে রাজা মেলি, দেহ করতালি,
হাসাব দ্বিজ সভাক॥
কন্যারূপ দেখি, লাজক না পেখি
ব্রাহ্মণ চলিল সাজি।
ইহার কারণে সকল ব্রাহ্মণে
বড় লাজ পাইব আজি॥"

৩। দ্রৌপদী-সয়ম্বর কাব্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থ "নারদীয়পুরাণ"। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ খৃঃ ১৭১৪ অঃ হইতে ১৭৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অনুজ খড়্গনারায়ণ, নারায়ণ নামক ব্রাহ্মণকে অনুমতি দিয়া ইহার রচনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থের ভাষা এবং ভাব উভয়ই প্রশংসার যোগ্য, নমুনা দেখিলেই পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—

† পরিশ্রম।

"জয় নিত্যানন্দ নিরাকার নারায়ণ।
নিরুপাধি নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন॥
পরম অপরানন্দ পরম পুরুষ।
পদ্মপাণি পঙ্কজলোচন নিষ্কলুষ॥
স্বরূপ অরূপ নিরূপণ রূপধারী।
গোপনারীনায়ক শ্রীগোলোকবিহারী॥
ধরাধরধারী ধরাধর শ্যামকায়।
কোটী কন্দর্পের দর্পহারী শ্যামরায়॥
স্বরূপতঃ অজ কিন্তু জনম অনন্ত।
অকর্ত্তা কর্ম্মের আর নাহি সার অন্ত॥
তুমি পূর্ণকাম আমি কামী সর্ব্বদাই।
কামনার দাস ভকতির অন্তরাই॥"

৪। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ খৃঃ ১৭৮৩ হইতে খৃঃ ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারে রাজত্ব করেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তিনি নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, ধর্ম্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ এই কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের সকলগুলিতেই কবিগণের সুললিত শব্দবিন্যাস এবং কাব্যের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি দেখিয়া সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পদবিন্যাসগুণে তাঁহাদের কবিতা বড়ই চিত্তস্পর্শিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, নানাস্থানে সুন্দর ভাবসমাবেশে তাঁহাদের কাব্য উচ্চশ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। চরিত্রচিত্রণেও তাঁহাদের কৃতিত্ব আছে। আমরা যথাসময়ে কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহিত যথাক্রমে কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কোচবিহারের কবিগণ এতদ্দেশীয় কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না।

ক। অরণ্যকাণ্ড—এই গ্রন্থের রচয়িতা রুদ্ররাম বাচস্পতি

"শ্রীহরেন্দ্রনৃপচন্দ্র মহেন্দ্র সমান।
অরিন্দম ভীমসম পরাক্রমবান।
মহিমার সীমা তার বলিবারে নারি।
মহাদানী মহারাজ বিহারবিহারী॥
তার নিজ দেশী দ্বিজ রুদ্র শুদ্ধমতি।
গুরুদত্ত নাম তার বিদ্যাবাচস্পতি॥
নৃপের আদেশ পায়্যা স্বদেশ বচনে।
[illegible] নিশাচর-বধ পদ ভণে॥"

কবিতার নমুনা—

পঞ্চবটীবনে খরদূষণের নিধনবার্ত্তা লইয়া লঙ্কাপুরে গিয়া সূর্পণখা রাবণকে ভৎর্সনা করিতেছে,—

"শুনগো রাবণ যেমত বারণ
অঙ্কুশ না হৈলে ধায়।
অমাত্য মধ্যত তুমি সেহি মত
নিরঙ্কুশ গজ প্রায়॥
শুন বাক্য মোর ভয় হৈল ঘোর
দণ্ডকারণ্যের মাঝে।
না জান অখন জানিবা তখন,
পারিবা যখন কাজে॥
আপন নগরে, সুখ ভোগ করে,
বিচার না করে দেশে।
শ্মশানাগ্নি প্রায়, মানসে রাজায়,
সে দেশের প্রজা শেষে॥
তোর কার্য্য কালে, নৃপতি সকলে,
আপনে না দেন রতি।
রাজ্য হয় নাশ, কার্য্যের বিনাশ,
নষ্ট যায় নরপতি॥"

খ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত, দুইখানি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পুঁথি দেখা গেল। একখানিতে দ্বিজ রঘুরাম ও শ্রীনাথশর্ম্মার এবং অপরখানিতে শ্রীদেবকী-নন্দনের ভণিতি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রথম খানির রচনা মহারাজের মনোনীত না হওয়ায় শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। কবিতাগুলি পাঠ করিলে সেইরূপই মনে হয়—

"কামতা রাজ্যের পতি রাজশিরোমণি।
গুণাধার বেহার যাহার রাজধানী॥
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ নাম নৃপবর।
তার অধিকারত ময়নাগুড়ি গ্রাম।
সেহি গ্রামবাসী দ্বিজ নাম রঘুরাম॥
রামায়ণ বাল্মীকের তাহার আদেশে
কাতর হইয়া ডাকে দীন রঘুরাম।
পার কর ভবসিন্ধু দীনবন্ধু রাম॥

রামকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ মুখ ভরি
নিশ্চয় করিয়া বলি শুন সাধু ভাই।
রাম নামে প্রীতি কর আর সবে ছাই ॥"

শ্রীদেবকীনন্দন কৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সর্ব্বাংশে প্রশংসার যোগ্য।

"বিহারে নরেন্দ্রচন্দ্র, বিহারেন শ্রীহরেন্দ্র,
ভূপমধ্যে শিরোমণি খ্যাত ॥
সদা শুদ্ধমতি অতি, যথা হেন মহীপতি,
আছে যার শিববংশ খ্যাত।
ভুবনে বিখ্যাত যার, চক্রবর্ত্তী বলি আর,
স্বকীর্ত্তিচন্দ্রমা প্রকাশিত।
দশদিগে অনুক্ষণ, যার গুণ আলাপন,
করি গুণিগণ সাধে হিত ॥
মার্ত্তণ্ড সদৃশ চণ্ড, প্রতাপেতে খণ্ড খণ্ড,
করি নাশে বিপক্ষ তিমির।
সুত তুল্য প্রতিপাল, সদা নিজ প্রজাপাল,
ধনধান্যে করে মহাবীর ॥
যার যশ-শশধর, সমপূর্ণ সুধাকর,
নহে চারু করয় প্রকাশ।
কমলদলের প্রায়, নয়ন শোভিত তায়,
শিরেতে কুটীল কেশপাশ ॥
শোভে অতি চারুতর, যেন নীল জলধর,
গগনমণ্ডলে সদা ভাসে।
ভ্রূযুগ অনঙ্গ ধনু, জিনি শোভে যার তনু,
ছটায় তিমিরচয় নাশে ॥
জিনিয়া বারণকর, বিরাজিত মনোহর,
ভুজযুগ আজানুলম্বিত।
বজ্রসম যার বক্ষ, স্থূল দেখি সুবিপক্ষ,
রক্ষ রক্ষ বোলে হয় ভীত ॥
গীত বাদ্য অনুরক্ত, দ্বিজ দেব গুরুভক্ত,
সদা রত রাজ্যের শাসনে।

কত শত হস্তী হয়, যাহে আর বিয়াজয়,
সেবে যারে নানাদেশী জনে ॥
নট ভাটগণ যারে, অনুক্ষণ স্তুতি করে,
গুণক প্রকাশে দেশে দেশে।
বিদিত শাস্ত্রের মর্ম্ম, যাহার অসাধ্য কর্ম্ম,
নাহি কিছু জ্ঞাতসার শেষে ॥
তাঁহার আদেশরত্ন, পায়্যা করি বহুযত্ন,
সুধাময় কথা রামায়ণ।
ব্রাহ্মণ সন্তান অতি অল্পমতি প্রবদতি,
ভাষা বন্দে শ্রীদেবীনন্দন ॥"

গ। সুন্দরাকাণ্ড—ইহাতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন অন্য কাহারও ভণিতা দৃষ্ট হইল না। ইহাতে বোধ হয়, মহারাজ স্বয়ং ইহার রচয়িতা। তিনি একজন উচ্চ-শ্রেণীর কবি ছিলেন। তৎপ্রণীত কাব্যে যেমন শব্দলালিত্য তেমনি ভাবের বৈচিত্র্য। এরূপ কাব্য অনেক আধুনিক কবির লেখনী নিঃসৃত হইলে আমরা তাঁহাকে কবির উচ্চ আসন না দিয়া থাকিতে পারি না। ভণিতা যথা—

"ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে গান মনোনীত।
বদ রাম অবিশ্রাম ভূপের রচিত ॥

অন্যত্র—
রামনাম মুক্তিধাম বদ সভাসদ।
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ভণে রামায়ণপদ ॥"

এরূপ স্থলে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বই আর কাহাকে ইহার রচয়িতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার কবিত্বের পরিচয় গ্রহণ করুন,—

"প্রতাপী সে কপিবর, নিরেখয় তাত পর,
লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননে।
কোপাবিষ্ট দুরাশয়, ভীষণ লোচনদ্বয়,
ভয় হয় তাক দরশনে ॥
মুখচন্দ্র মনোহর, যেন পূর্ণ নিশাকর,
চারু ভুরু ভঙ্গিম সুন্দর।
নানা মণি রত্নময়, শিরে কিরীট শোভয়,
মুক্তাদাম তাত মনোহর ॥
যেন নীল মহীধরে, মণিশৃঙ্গ শোভাকরে,
তাত আর অরুণ কিরণ।

লাগিলে হয়েন যেন,　　সেই প্রায় শোভিছেন,
রাবণের কিরীট শোভন ॥”

ঘ। বিষ্ণুপুরাণ—গোবরাছড়া-নিবাসী মাধবচন্দ্র শর্ম্মা ইহার রচয়িতা ; যথা—

“মনুজ নিকরে সদা করে যার সেবা।
উপমা তাহার আর দিতে পারে কে বা ॥
সেহি দেবতার ভক্ত দেহীর ঈশ্বর।
এহি হরবংশজ নৃপতি পুণ্যতর ॥
শ্রীলশ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ অভিধান।
তাহার কল্যাণ সদা করুন ঈশান ॥
যার নিজ পরিবার মহাকবিগণ।
পুরাণ ভারতপদ করিছে রচন ॥
তাঁহার করুণাদেশ মজে অভিলাষ।
বিপ্রজাতি গোবরাছড়াত নিবাস ॥
শ্রীমাধবচন্দ্র বিরচিল পদগণ।
মনে তার জগৎবন্দন নিরঞ্জন ॥”

ঙ। অতঃপর ধর্ম্মপুরাণের বঙ্গানুবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহারই মধ্যে কবির নাম, যাহার আদেশে ও উৎসাহে কাব্যখানি রচিত এবং যে সময়ে তাহা রচিত ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

“হরেন্দ্র নরেন্দ্রচন্দ্র গুণপারাবার।
করুন শিবের সুতা কল্যাণ তাঁহার ॥
অখণ্ড প্রতাপে হৈছে মার্ত্তণ্ড উজ্জ্বল।
চণ্ড ভুজদণ্ড ভূমণ্ডলে আখণ্ডল ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম মকরন্দ পানে।
মন মধুকর করে আনন্দ সঘনে ॥
খণ্ডিত কন্দর্পদর্প শরীর সুন্দর।
নিজ কুল কুমুদকোরকে শশধর ॥
নীতিবিশারদ বীর পরম সুস্থির।
অতুল অরাতিকুলতিমিরমিহির ॥
দয়াবান্ ধৈর্য্য শৌর্য্য আদিগুণগণ।
কবির শকতি কি বা করিতে গণন ॥
তাহার হাতের মন্ত্রীবর মহাশয়।
শ্রীশচীনন্দন নাম গুণের নিলয় ॥

উদার পবিত্র চিত্ত চরিত্র যাহার।
ইষ্টে তার শিষ্ট নিষ্ঠ মন হৈছে যার॥
তাঁহার আজ্ঞায় মন করিয়া সুস্থির।
সুগোচর বিশেষ করিতে নৃপতির॥
ধর্ম্মপুরাণের পদ অতি সুশোভন।
যথাশক্তি বিরচিল শ্রীরামনন্দন॥
কর মন পরকাল তরণ উপায়।
লহ শ্রীগুরুর নাম বৃথা দিন যায়॥
কমল দলত জল যেমন চঞ্চল।
দেহমধ্যে প্রাণ মন তেমন তরল॥
ক্ষণমপি সজ্জনের সঙ্গ কর সার।
সেহি সে তরণী ভবার্ণব তরিবার॥
যে কালে টুটিল সব কোকিলের মান।
চারিদিকে শুনিলাম মণ্ডুকের গান॥
সে কালত বর্ষাঋতু করিল প্রকাশ।
কর্কট রাশিতে ছায়াপতি নিল বাস॥
সপ্তদশ দিনে তার শুন সভাসদ।
সমাপ্ত হইল ধর্ম্মপুরাণের পদ॥"

৫। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত শিবপুরাণ-বঙ্গানুবাদ কোচবিহারের পুস্তকালয়ে আছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। বৈদ্যনাথ নামক ব্রাহ্মণ এই পুরাণখানি তাঁহারই রাজত্বকালে রচনা করিয়াছিলেন। শিবপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"প্রসন্ন বদন সুন্দর শান্ত।
শারদইন্দুসম দীপ্তিমন্ত॥
নানাবিধ রত্ন বিচিত্র অঙ্গ।
অনঙ্গের অরি জিনি অনঙ্গ॥
মুকুট চন্দ্র অর্দ্ধে অলঙ্কৃত।
কর্পূরকুঙ্কুমরাগরঞ্জিত॥
ললাটমধ্যস্থ অরুণ নেত্র।
সেহি নেত্র সনে আছে অস্তত্র॥

পদ্মযুগ যেন লোচনদ্বয়।
করুণানিধান করুণাময়॥

ভণিতি	গুণসমূহের মধ্যে তার প্রভুতা।
বাড়ুক নন্দনবনে যেন কল্পলতা॥
তাহাতে অভয় লইতে করি আশা।
দ্বিজ বৈদ্যনাথ সত্ত্ব বিরচিল ভাষা॥"

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের পরে আর কাহার রাজত্বকালীন কোন গ্রন্থ কোচবিহারের পুস্তকালয়ে দেখিলাম না। তবে উপকথা নামে একখানি কাব্য পাইলাম, তাহাতে গ্রন্থকারের নাম বা গ্রন্থরচনার সময় জানা গেল না—না যাউক, কিন্তু উপকথার রচনা উল্লেখযোগ্য। তাহার স্থানে স্থানে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীনা মাতামহীগণ যে "রাজপুত্র, পাত্রের পুত্র" অবলম্বনে উপকথা বলিতেন, ইহাও সেইরূপ একটী গল্প। ইহাতে রাজপুত্র ও পাত্র (মন্ত্রী) পুত্রের পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের পরিচয়, একত্র বিদ্যাশিক্ষা, দারপরিগ্রহ ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপারের বিবরণ, রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রের স্ব স্ব কর্ত্তব্যতাপালন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোন রাজপুত্রকে সাংসারিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার উদ্দেশে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কবির বিলক্ষণ বর্ণনাচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়।

"নমো পঞ্চবাণ-অরি,	পিণাক ত্রিশূলধারী,
স্মরারি শোধন কামান্তক।
বিভূতি বিভূতি যার,	নমো দেব নাগহার,
দিগম্বর দেবের নায়ক॥
পার্ব্বতীমনোরঞ্জন,	স্বরূপত নিরঞ্জন,
নিরাকার পুরুষপ্রধান।
যার আদি মধ্যহীন,	শক্তি ভক্তি সুপ্রবীণ,
যার গুণ বেদে করে গান॥
বারাণসী মুক্তিধাম,	তব গুণে অনুপাম,
এ জগতে নাহি যার সম।
সে দেশের অধিকারী,	তুমি নাথ শূলধারী,
নমো দেব পুরাণ উত্তম॥
জটাতটে গঙ্গাবাস,	তাঁহার স্মরণে নাশ,
কোটীজন্মার্জিত পাপচয়।
তার স্নানে লোকগণে,	প্রীতি ভক্তি পূত মনে,
অনায়াসে সব মুক্ত হয়॥

হরিহর এক তনু, প্রণমিছি পুনঃ পুনঃ,
এক ব্রহ্ম কারণে বিভেদ।
না জানিয়া ভেদজ্ঞানে, নষ্ট হয় নরগণে,
কেমনে পাইবে মুক্তিপদ।" ইত্যাদি।

নিম্নোক্ত কবিতাগুলিতে তৎকালিক বিবাহপদ্ধতিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

"গন্ধাধিবাসন, করি সমাপন,
বিবাহের অঙ্গচয়।
করিল তখন, আসি আয়োগণ,
সজ্জিত ভূপতনয়॥
চাতুরী বচনে, তাক আয়োগণে,
কৌতুক করে সে বেলা।
স্ত্রী-আচারক্রিয়া, সব সমাপিয়া,
আসিল সব সরলা॥
রাত্রি এহি মতে, গেল উঠি প্রাতে,
আনন্দের সীমা নাই।
বোলে আইসে নিশি, ছুইয়ো মুখশশী,
নিরেখিব একঠাঞি॥
এহি মত চিন্তা, করে সব কান্তা,
অন্তরে তাহাত পরে।
দ্বিতীয় প্রহরে, হৈল দিনকরে,
মধ্যাহ্ন অতি প্রখরে॥
সেই সময়ত, করি বিধিমত,
ক্ষৌরাদি কৈল তখন।
আসি আয়োগণ, করাইল স্নান,
লজ্জিত রাজনন্দন॥
স্নান করাইয়া, বস্ত্র পরাইয়া,
লেপন কৈল চন্দনে।
বর কোটা দিয়া, ভূষণে ভূষিয়া,
মুকুতা দিল শ্রবণে॥
রতন-অঙ্গুরী, দিল যত্ন করি,
অঙ্গুলীত সে সময়।

উত্তরী বসন,　　অঙ্গ আচ্ছাদন,
করিল নৃপতনয় ॥
সন্ধ্যা কতক্ষণে,　　হইল তখনে,
হস্তোদকের সময় ।
হস্তোদকক্রিয়া,　　পাছে সমাপিয়া,
রহিল নৃপতনয় ॥
পর কথা শুন,　　হইয়া নিপুণ,
করহ সবে শ্রবণ ।
পাত্রীক তখন,　　আসি আয়োগণ,
করাইল স্নান মার্জ্জন ॥
উলুলু মঙ্গল,　　করি কুতুহল,
কিবা শোভা মনোহরা ।
হার মুকুতার,　　তারু পরে হার,
দিছে করি দুই ছড়া ॥
শ্রবণে শোভিত,　　করি মনোনীত,
কর্ণকুণ্ডল রত্নময় ।
নাসায়ে আশায়ে,　　যেন মধু খায়ে,
কেশব ভ্রমর প্রায় ॥
পাইয়া তিল ফুল　　মজ্যা অলিকুল,
রৈছে পানে মত্ত হৈয়া ॥ ইত্যাদি

*　*　*　*

কুলপুরোহিত,　　আসি যথোচিত,
আরম্ভিলা যজ্ঞবরে ।
পরে কতক্ষণে,　　ক্রিয়া সাঙ্গ হলে,
চলিলেন অন্তঃপুরে ॥
অন্দরে মঙ্গল,　　করি কুতুহল,
ক্রিয়াচয় সমাপিল ।
পিতার মাগিয়া,　　কন্যাক লইয়া,
আপন দেশে চলিল ॥"

ইহার পর আর একখানি কাব্যের পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেখানি মহাকবি জয়দেব গোস্বামীকৃত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক জগৎসিংহ। গ্রন্থখানি খণ্ডিত, শেষাংশ অতি অল্পই নাই। রচনা দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকারের নিবাস

কোচবিহার বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনস্থান, তিনি যে রাজা মহারাজ বা তদনুরূপ কাহার উৎসাহ-আনুকূল্যে গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। তাঁহার অনুবাদের ভাষাও কোচবিহার বা তৎসন্নিহিত রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের সেকালের ভাষা। অনুবাদক স্বয়ং একটী মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"জয় জয় নম জগজ্জীবন মুরারি।
গোবর্দ্ধনধারী গোপীজনপ্রিয়কারী॥
কংশকেশীমথন মোহন বেশ যার।
করোক কল্যাণ সেহি দেবকীকুমার॥
ত্রিভুবননাথ দেব নমো ত্রিপুরারি।
ভকত জনার ভবভয়দুখহারী॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পীত বস্ত্র অর্দ্ধ বাঘছাল।
বনমালা অর্দ্ধ অঙ্গে অর্দ্ধ মুণ্ডমাল॥
শঙ্খ চক্র ত্রিশূল ডমরু শোভা করে।
অর্দ্ধচন্দ্র মুকুটমণ্ডিত নিরন্তরে॥
অর্দ্ধ অঙ্গে কমলা ভবানী অর্দ্ধ অঙ্গে।
করোক মঙ্গল হরিহর মহারঙ্গে॥
নমো নারায়ণী গৌরী শঙ্করের জায়া।
অভীষ্টদায়িনী নমো দুর্গা মহামায়া॥
লক্ষ্মীরূপে জগতের বিভূতিদায়িনী।
সরস্বতীরূপে বাক্যপ্রকাশকারিণী॥
প্রণমহ ব্যাস সত্যবতীর নন্দন।
যার মুখকমলগলিত বেদগণ॥
ভাগবত আদি অষ্টাদশ যে পুরাণ।
নিস্তারে জগৎ অমৃতক করি পান॥
নমো শুকদেব আদি কবিঋষিগণ।
নিজগণৎ চরণক করহ বন্দন॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
জগৎসিংহ ভণে গীতগোবিন্দ পয়ার॥"

জগৎসিংহের অনুবাদ এতই সুশ্রাব্য যে, ইচ্ছা হয় সমস্তই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সকলকে উপহার দিই। অনুবাদে মূলগ্রন্থের সৌন্দর্য্যরক্ষায় জগৎসিংহ সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলা যায়। জয়দেবের কবিতাপাঠকালে শব্দের রসে মুখ ভরিয়া

যায়, মন নাচিতে থাকে, জগৎসিংহের অনুবাদেও সেইরূপ হয়। পাঠকগণ দশাবতার-স্তোত্রের অনুবাদ পাঠ করুন, পশ্চাৎ সুবিধা হয় অন্য স্থান হইতে একটুকু নমুনা দিব।

"প্রলয়পয়োধিজলে তল যায় বেদ।
মীনরূপে কেশব খণ্ডালে তার খেদ॥
নৌকার চরিত্রে ভাগবত কৈলা পার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥
কচ্ছপ স্বরূপে দেব দেবলক্ষ্মীপতি।
পৃষ্ঠত ধরিলা বিপুলতর ক্ষিতি॥
ধরণীধরণ কর চক্রের আকার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥ ২॥
পুনরপি গোবিন্দ শূকর রূপ ধরি।
ইঙ্গিতে ধরণী লৈল দশনত করি॥
কলঙ্ক লইয়া যেন শোভা চন্দ্রমার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥ ৩॥
নরহরি রূপে কৈলা হিরণ্য বিদার।
করপদ্মনখোদ্ভূত শৃঙ্গের আকার॥
ভৃঙ্গে কমলক যেন করিয়া বিদার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥ ৪॥
বামন স্বরূপে বলী করিলা ছলন।
পদনখনীরে গঙ্গা হৈলা উৎপাতন॥
সেই গঙ্গা জগতক করেন নিস্তার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥ ৫॥
ভৃগুপতি রূপে ক্ষত্রি করিলা সংহার।
ক্ষত্রির শোণিতে হ্রদ বহাল্য অপার॥
তাত স্নানি নরে পাবে সংসারে নিস্তার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥ ৬॥
হলধর রূপে নীল চক্রনে শোভিত।
মিলিছে যমুনা যেন পায়্যা হল ভীত॥
শ্বেত অঙ্গে নীলবস্ত্র জলদ সুন্দর।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার॥ ৭॥
নিন্দা করি যজ্ঞ বিধি শ্রুতি আদি করি।
সদয় হৃদয় হৈল বুদ্ধরূপ ধরি॥

পশুবধ দেখি কৃপা জন্মিল অপার।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৮ ॥
কল্কীরূপে অদ্ভুত করে ধরি বাণ।
ম্লেচ্ছ রাজগণক করিয়া বিনাশন ॥
ধূমকেতু সদৃশ রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৯ ॥
মীনরূপ ধরি তুমি বেদ উদ্ধারিলা।
কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠেত ধরিলা ॥
বরাহরূপেত পৃথ্বী দন্তে লৈলা তুলি।
নরহরি রূপে হিরণ্যাক নখে পেলি ॥
বামন স্বরূপে বলী করিলা ছলন।
ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রি কৈলা বিনাশন ॥
রামরূপে রাবণক বধিলা সমরে।
হলধর রূপে সে লাঙ্গল লৈলা করে ॥
বৌদ্ধরূপ ধরি হৈলা পরম উদার।
কল্কীরূপে ম্লেচ্ছগণে করিলা সংহার ॥
দশবিধ রূপ কৃষ্ণ করি নমস্কার।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জগৎ উদ্ধার ॥" ইত্যাদি

বঙ্গদেশের রাজগণ চিরদিনই কাব্যামোদী। তাঁহারা কবিদিগের আদর যত্ন করিতেন, তাঁহাদের অশন, বসন ও পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ করিয়া রাখিতেন, আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাই। কিন্তু কোচবিহার-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজগণের পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি সাধারণের অগোচর রহিয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কোচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ মহাশয়কে অনুরোধ করি তাঁহার কৃপাদৃষ্টিমাত্র বাঙ্গালাসাহিত্যের এই মহৎ অভাব সহজেই দূরীভূত হইতে পারিবে। আলোচিত কাব্যগুলি বাঙ্গালাসাহিত্যে কোচবিহার-রাজবংশের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

জীবগণের রোম ও কেশের একটী নূতন ব্যবহার

রোম ও কেশ থাকায় পশুগুলি মোটামুটি যে যে উপকার লাভ করে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেগুলি এই :—

(১) লোমগুলি তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহা পশুশরীরকে শীত ও আতপ হইতে রক্ষা করে।

(২) লোমগুলি পশুদেহে এরূপ ভাবে অবস্থিত যে বৃষ্টির জল সহজে পশুর দেহকে আর্দ্র করিতে পারে না। জল গা বহিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়। উপরে রোমগুলি ভিজিয়া গেলেও ভিতরের চর্ম্ম আর্দ্র হইতে পারে না।

(৩) রোমগুলি পশুদেহকে বিবিধ আঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা করে।

উপরি উক্ত তিনটী উপকার ব্যতীত রোম থাকায় পশুগণের আর একটী পরম উপকার হয় বলিয়া আমার মনে হইতেছে। সেটী এই :—

রোম থাকায় পশুদেহ হইতে আঘাতজনিত রক্তস্রাব হইলে সে রক্ত জমিয়া গিয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক।

যুদ্ধ করিবার সময় পরস্পরের নখ শৃঙ্গ ও দন্ত প্রভৃতির আঘাতে বা প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার সময় বিবিধ কঠিন পদার্থে প্রতিঘাতনিবন্ধন পশুদেহ সহজেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে। ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে রক্তক্ষয় জন্য পশুটীর ক্রমশঃ বলহীনতা ও পরিণামে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কিন্তু জীবদেহ হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব উপায় আছে। রক্ত যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ উহা জলের ন্যায় তরল থাকে। কিন্তু শরীর হইতে বাহির হইবার অল্পক্ষণ মধ্যেই রক্ত জমিয়া যায়। আঘাত অল্প হইলে আহত স্থানের উপর একবিন্দু রক্ত আসিয়া জমে। অল্পক্ষণ মধ্যে রক্তবিন্দুটী জমাট বাঁধিয়া আহত স্থানের শিরা বা ধমনীগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। শরীর এইরূপে নিজেই নিজেকে রক্ষা না করিলে কোনও কৃত্রিম উপায়েই রক্তস্রাব নিবারণ করা যাইত না। কারণ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি খুলিয়া দিবার পর হইতেই পুনরায় সে স্থান হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে। অথচ কোন স্থান খুব বেশী ক্ষণ জোরে বাঁধিয়া রাখা হিতকর নহে, কারণ রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া সে স্থানটীও ক্রমশঃ রুগ্ন হইয়া পড়িবে।

কিন্তু লোমের দ্বারা রক্ত জমাট বাঁধিবার পক্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে সুবিধা হয় বলিয়া আমি অনুমান করি :—

আঘাতটী যখন অল্প হয় তখন প্রথম রক্ত-ফোঁটাটীর পর দ্বিতীয় আর একটী ফোঁটা আসিতে অনেকটা বিলম্ব হয়। তাহার মধ্যেই প্রথম ফোঁটাটী জমিয়া রক্ত-স্রাব বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় ফোঁটাটীকে আর বাহির হইতে দেয় না। কিন্তু আঘাতটা যদি কিছু গুরুতর হয় তাহা হইলে প্রথম ফোঁটাটী জমিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় ফোঁটাটী উহাকে স্থানচ্যুত করিবে এবং এইরূপে দ্বিতীয়টীকে তৃতীয়টী ও তৃতীয়টীকে চতুর্থটী স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। এরূপস্থলে রক্তরোধ করা যে শক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশুদেহে লোমের অস্তিত্ব-নিবন্ধন রক্তবিন্দু সকলের গতি ব্যাহত হয়; উহারা সহজে ভূপতিত হয় না; আঘাতস্থানকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকের কেশগুলিকে ভিজাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। রক্তার্দ্র কেশগুলির পরিধিদেশের রক্ত প্রথম জমিয়া যায়। জমাট-রক্তের সংস্পর্শে যে নূতন রক্ত আসে তাহাও সত্বর জমিয়া যায়। এইরূপে রক্ত পরিধি হইতে কেন্দ্রাভিমুখে জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। রক্তের চাপ ও কেশগুলি প্রথমতঃ আহত স্থান হইতে আগত রক্তস্রোতের বেগ কমাইয়া দেয়। এবং বেগ যখন কমিয়া আসে তখন আহত স্থানের রক্তবাহী নলগুলির মুখও বন্ধ করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কেশের অস্তিত্ব আহত স্থানে রক্তরোধের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনুষ্য-দেহে রোমের বিরলতাবশতঃ আহত স্থানে এক টুকরা শুষ্ক নেকড়া জড়াইয়া লইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সত্বর রক্তরোধ হইয়া থাকে।

তবে আঘাত যখন খুব গুরুতর হয় তখন মূর্চ্ছা আসিয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু করিয়া দিয়া প্রকৃতি-মাতা পশুকে রক্তরোধ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ *

অতি প্রাচীনকালে আমাদিগের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণ যখন বেদগান করিতেন, তখন তাঁহারা যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেইরূপই বর্ণযোজনা করিতেন। তাহার পর বৈদিক-ভাষা যখন সংস্কৃতে পরিণত হয়, তখনও বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য। প্রাকৃতেও এই সামঞ্জস্য পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রাকৃত বিবর্ত্ত-বশে ক্রমশঃ যে সকল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষা তাহার মধ্যে একটী। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের পরিণাম হইলেও, এবং সংস্কৃত ইহার মূল হইলেও, ইহার বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ অনেক স্থলেই পরস্পর-বিসংবাদী।

এই বিসংবাদের কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, বৌদ্ধ-যুগে বুদ্ধ-দেবের ইচ্ছানুসারে, শাস্ত্রাদি-লিখন ও কথোপকথন—উভয় কার্য্যের জন্যই, পল্লীর প্রাকৃতেরই অত্যধিক ব্যবহার হইত, এবং সংস্কৃতের প্রতি অতি অল্প লোকেরই পূর্ব্বের মত আস্থা দৃষ্ট হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়। যুগপৎ, সর্ব্বত্র, একদিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধীত বিষয়ের সংস্কৃতে আলোচনা, এবং অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা—এতদুভয়ের ফলে পুরাতন পল্লী-প্রাকৃত সহসা জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং এক নূতন প্রাকৃত জন্ম-পরিগ্রহ করে। অশিক্ষিত ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায় সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অনুরক্ত; শিশুর অঙ্গ-পুষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন—তাঁহাদিগের এমন ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ও তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রথম যৌবনে যাহাতে সে বিপথগামী না হয়, সংস্কৃতের কুল-গৌরবে যাহাতে সে গৌরবান্বিত হয়, সংস্কৃত-সেবিগণ অভিভাবক হইয়া অনবরত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অভি-ভাবকের আদেশে ও যত্নে বালকের বেশ-ভূষা ও আকৃতির অনেকটা "সংস্কার" হইল বটে; কিন্তু তাহার "অন্তঃপ্রকৃতি" সেই "বহিঃ-সংস্কারের" অনুমোদন ও অনুসরণ না করায় উভয়ের মধ্যে বৈষম্য রহিয়া গেল।

ভাষা-বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ, ঠিক ততগুলি বর্ণ সংস্কৃত-বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ। অতএব সংস্কৃতভাষায় অক্ষর-যোজনা ও উচ্চারণের মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রাকৃত সংস্কৃতের মত শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে,—সাধারণের ভাষা। ইহার বর্ণ-মালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু সংস্কৃত সকল বর্ণই ইহাতে স্থান পায় নাই। সকল স্থলে এক রূপ বর্ণ-মালা-ব্যবহারেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শব্দবিশেষের

---

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

দ্যোতনার্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার প্রচলন হইয়াছে, এবং অনেক সময় বিভিন্ন প্রাকৃতে বিভিন্ন বর্ণ-কর্তৃক একই সংস্কৃত বর্ণের স্থান অধিকৃত হইয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত 'শ', 'ষ' ও 'স' এই তিনটী বর্ণের পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীতে কেবল 'স' এবং মাগধীতে 'শ' ব্যবহৃত হয়; 'ন' ও 'ণ' উভয়ের পরিবর্ত্তে শৌরসেনীতে 'ণ' ও পৈশাচীতে 'ন' ব্যবহৃত হয়। শৌরসেনীতে 'য'-এর পরিবর্ত্তে 'জ', এবং মাগধীতে 'জ'এর পরিবর্ত্তে 'য' হয়; শৌরসেনীতে অসংযুক্তশব্দ-মধ্যস্থ 'ত' ও 'থ'র পরিবর্ত্তে 'দ' ও 'ধ' এবং পৈশাচীতে অসংযুক্তশব্দমধ্যস্থ 'দ' ও 'ধ'র পরিবর্ত্তে 'ত' ও 'থ' হয়। একদিকে বিভিন্ন প্রাকৃতগুলির মধ্যে, এবং অপর দিকে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মধ্যে, এইরূপ অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতেই সংস্কৃত ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঐ, ঔ এই কয়েকটী স্বরের, অনুস্বার ব্যতীত পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনের, এবং ঙ, ঞ, ও বিসর্গের অসদ্ভাব লক্ষিত হয়। ঐ সকল এবং অপর বর্ণ, সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত অবস্থায়, বিভিন্ন প্রাকৃতে কোন্ সময় কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহার অধিক আলোচনা না করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাকৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতি কোনও কোনও অংশে সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন হইলেও, তাহার বর্ণমালাকে উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনও বৈষম্য ঘটে নাই।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত প্রাকৃতের এইরূপ বিকাশ ও পরিণতি হইতেছিল। এক প্রাকৃত হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃত উদ্ভূত হইতেছিল। উচ্চারণের বিপর্য্যয় হইতেছিল, কিন্তু প্রতিনিয়ত বর্ণমালাকে উচ্চারণের সমঞ্জস করিয়া লওয়া হইতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাবের তিরোধান হইতে না হইতে সংস্কৃত মেঘান্তরিত সূর্য্যের মত সহসা স্বীয় দীপ্তপ্রভাব বিস্তৃত করিল। সে প্রভাবে প্রাকৃত নিতান্তই অভিভূত হইয়া পড়িল। যে পারিল সে-ই সংস্কৃত আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। কেবল যাহারা কোনও কালে প্রাকৃত ভিন্ন অন্য কিছু জানিত না তাহারাই দুঃসময়েও প্রাকৃতকে পরিত্যাগ করিল না। তাহারা গ্রন্থাদি-রচনাকালে যে বাঙ্গালার ব্যবহার করিত তাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রভাব অতি অল্পই লক্ষিত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে ব্যাকরণ-ঘটিত বিভক্ত্যাদিতে প্রাকৃতের যেরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়; সূর্য্য, যে, সে, যায়, আমি, তুমি, প্রভৃতির স্থলে শুজ, জে, শে, জাএ, আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতিতেও সেইরূপ প্রাকৃতের চিহ্ন বর্ত্তমান। অনেক আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী ভাষার ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-পরিণতি, এবং ভাষার উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব, লক্ষ্য না করিয়া, প্রাচীন পুঁথির এই বর্ণযোজনা-প্রণালীকে 'লিপিকর-প্রমাদ' নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদিগের মত যদি সত্য হইত, লিপিকরগণের 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং, লেখকের দোষ নাস্তি', ইত্যাদি উক্তি যদি সর্ব্বত্রই মিথ্যামাত্র হইত, তাহা হইলেও আমরা বলিতাম যে, লিপিকরগণ কথোপকথন-কালে যেরূপ উচ্চারণ করিত, লিপিকরণ-কালে তদনুরূপ অক্ষরবিন্যাস করিত। ক্রমশঃ সেই প্রথার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল; সংস্কৃত-সেবিগণ 'মূর্খ বুঝিবার কৈল

পরাক্বত ছন্দ।' তাঁহারা সাধারণের জন্ত সংস্কৃতশাস্ত্রাদির 'পুণ্যকথা' 'প্রাকৃত-কথনে' লিখিলেন্ বটে; কিন্তু সংস্কৃত মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ-বিন্তাস-প্রণালীর সংস্করণে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু লিখিত রচনায় সংস্কৃতপরায়ণ হইলেও, কথোপকথনের সময় তাঁহারা প্রাকৃত বাঙ্গালাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। সুদীর্ঘকাল সংস্কৃতের আলোচনা এবং প্রাকৃতের বহুবিস্তার হেতু, অন্তবিধ প্রাকৃতের মত বঙ্গদেশের প্রাকৃতেও কতকগুলি সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ না হওয়ায়, তাহাদের উচ্চারণ-প্রণালী সকলেরই অবিদিত ছিল। সংস্কৃতসেবিগণও সাধারণের মত প্রাকৃতভাষী ছিলেন—বাঙ্গালাতেই কথা কহিতেন। সংস্কৃতের মত উচ্চারণ করিতে হইলে তাঁহাদিগেরও নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষায় এবং অভ্যাসে কেহই অধিক সময়াতিপাত করিতে চাহিলেন না। অতএব যে যে সংস্কৃত-বর্ণের উচ্চারণ অনায়াসসাধ্য, বাঙ্গালায় কেবল তাহাই প্রবর্ত্তিত হইল; যথা, র-ফলা—বক্র, চক্র, প্রভৃতি; পদের অন্তস্থিত বিসর্গ আঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি। কিন্তু যে যে স্থলে উচ্চারণ আয়াসসাধ্য, তথায় বর্ণযোজনা-প্রণালীর সংস্কার হইলেও, উচ্চারণ পূর্ব্বের প্রাকৃতের মত রহিয়া গেল; যথা—'ম'-যোগ—আত্মা, রুক্মিণী; 'য'-ফলা—বাক্য, সভ্য।

বাঙ্গালায় যে সকল বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে অভিন্ন, তাহাদিগের মধ্যে স্বর একটীও নাই; সব ব্যঞ্জন। যথা—

অসংযুক্ত—ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ (শৌরসেনী) ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন (পৈশাচী), প, ফ, ব, ভ, ম, য় (মাগধী), র, ল, শ (মাগধী), হ, ং।

সংযুক্ত—ক্ক, ক্‌খ, গ্‌গ, গ্‌ঘ, চ্চ, চ্ছ, জ্জ, ঞ্ঝ, ট্ট, ট্‌ঠ, ড্ড, ড্‌ঢ, ত্ত, ত্থ, দ্দ, দ্ধ, ন্দ, ন্ধ, ন্ন, (পৈ), প্প, প্‌ফ, ব্ব, ব্ভ, ম্ব, ম্ভ, ম্ম, ল্ল, ল্‌হ, শ্‌শ, (মা), ংশ, ংহ।

[বাঙ্গালায় অনেকস্থলে অ-কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হ্রস্ব ওকারের মত। যথা—অতুল, অদ্য, অগ্নি, অসি, প্রভৃতি। কেবল অ-সংযুক্ত অবস্থায় বা শব্দের আদিতেই যে এরূপ হয় তাহা নহে। যথা—ক্ষতি, পক্ষী, লক্ষণ, মত, সভ্য। 'অদস্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন বাঙ্গালা 'অ-রা' (ওরা), 'ও' (অ, অসমীয়া সম্বোধনসূচক 'অ'), 'অই' (ওই, ঐ) প্রভৃতি পদগুলির আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। (১) পদের মধ্যে (কথোপ-কথনের সময়) এবং পদের অন্তে (লিখিত ভাষায়ও), অনেক স্থলে 'অ'-কারের উচ্চারণ হয় না। যথা—(১) ভাবনা, কলসী, সয়তান; (২) আলাপ, উচিত, ভীষণ, মরণ, সুখ প্রভৃতি। রাজনারায়ণ, রামমোহন, হেমচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি নামের মধ্যে এবং পাঠশালা, যুগলরূপ, ফলমূল প্রভৃতি 'সমস্ত' শব্দের মধ্যে যে অনুচ্চারিত 'অ'-কার দৃষ্ট হয় তাহা রূপান্তরিত পদান্তস্থিত 'স্ন'-কার। এতদ্ভিন্ন ব্যথা, ব্যক্তি, ত্যক্ত, ব্যতীত প্রভৃতি শব্দে 'অ'-কারের অপর দুইটী উচ্চারণ লক্ষিত হয়।

'আ'-কারের উচ্চারণ সকল স্থলে দীর্ঘ (ইংরাজী fatherএর মত) নহে। দৃঢ় সম্মতি-সূচক হাঁ (যথা হাঁ আমি যাবই) এবং কনিষ্ঠের প্রতি অনুজ্ঞাসূচক 'যা' (যথা—

যা, বল্‌ছি) যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, সন্দেহসূচক 'হ্যাঁ' (যথা—হ্যাঁ, তুমি আমার আমার কথা শুনবে ?) এবং অবজ্ঞাসূচক 'যা, যা' সেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয় না ; ইংরাজীতে and, at প্রভৃতি শব্দে 'a'র যেরূপ উচ্চারণ ইহাদিগেরও সেইরূপ উচ্চারণ হয়। খ্যাতি, কল্যাণ, উপাখ্যান, ব্যাস, বন্ধ্যা, হত্যা প্রভৃতি 'য'-ফলাসংক্রান্ত শব্দেই এই আকার অধিক লক্ষিত হয়। 'য'ফলা-যোগের জন্যই এরূপ উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হয় না। কারণ 'সন্ধ্যা', 'মিথ্যা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বিন্ধ্য', 'অগস্ত্য', 'মৎস্য', প্রভৃতি শব্দের আমরা 'য'-ফলা-বর্জ্জিতের মতও উচ্চারণ করি।

বাঙ্গালায় 'ই'-কার, 'উ'-কার ও 'ও'-কারের উচ্চারণ অনেকস্থলে অপর স্বরের উচ্চারণ-সাপেক্ষ—ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় যুক্তস্বরের Diphthong পরবর্ত্তী অঙ্গের মত। 'ই' যথা—অই, মই, সই ; তাই, ভাই ; উই, শুইল ; ভুঁই ; এই, নেই ; 'উ' যথা—নাউ ; কেউ, ফেউ ; 'ও' যথা—হও, নাও, শোও, প্রভৃতি।

ভীষণ, ঊর্দ্ধে, ততোঽধিক প্রভৃতি শব্দে 'ঈ', 'ঊ', 'এ', 'ও'র উচ্চারণ দীর্ঘ হইলেও, ঈষৎ, ঊরু, একটু, ওসার প্রভৃতি শব্দে বাঙ্গালায় আমরা যদৃচ্ছাক্রমে হ্রস্বোচ্চারণই অধিক করি। এক, খেলা, যেন, বেলা প্রভৃতি শব্দের 'এ'কারের উচ্চারণ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আকারের (and, at প্রভৃতির 'a' র) উচ্চারণের মত।

বাঙ্গালায়, সংস্কৃতের প্রভাবে প্রাকৃতে অব্যবহৃত কতকগুলি বর্ণ তাহাদিগের প্রাকৃত-বিকৃতির স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ (১) মূল সংস্কৃতের ও কতকগুলির (২) মূলের প্রাকৃত বিকৃতির মত।

(১) 'ঐ' ও 'ঔ' এই দুই স্বরের উচ্চারণ, সংস্কৃতে যেরূপ, বাঙ্গালায়ও সেইরূপ। কিন্তু কথোপকথনে, প্রাকৃতে তাহাদিগের যে বিকৃতি হইত, তাহার পরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। যথা—গেরি (গৈরিক), তেল (তৈল), ওরশ (ঔরস), ওখুদ (ঔষধ), ওক্ক (ঐক্য), বেহাই (বৈবাহিক) প্রভৃতি।

প্রাকৃতের মত, আধুনিক সাহিত্যের বাঙ্গালায়, 'ঙ' এবং 'ঞ' অক্ষরদ্বয় ও ইহাদের উচ্চারণ, অতি-বিরল হইলেও, প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষতঃ চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতিতে ইহাদের অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়, পদান্তস্থ বিসর্গ এবং পদমধ্যস্থ ও পদান্তস্থ 'য়' (অনেক স্থলে) সংস্কৃতের মত উচ্চারিত হয়।

চ্ছ্র (কখনও কখনও, 'স্র'), (অন্তঃস্থ) 'ব্র' 'ক্র' 'ষ্ট্র' 'শ্র' ও 'হ্র' ব্যতীত যাবতীয় 'র'ফলা সংযুক্ত বর্ণ ; 'ক্ল' 'গ্ল' 'প্ল' 'ম্ল' এই কয়েকটী 'ল'কারসংযুক্ত বর্ণ ; 'দ্গ' 'দ্ব' 'ম্ম' ; রেফ-সংযুক্ত বর্ণ (কথোপকথনে অনেক স্থলে প্রাকৃতবৎ), 'হ্ব' 'হ্ন' 'ল্ভ' 'হ্ম' 'স্ত' 'স্থ' 'ক্ষ' 'ঞ্চ' 'ঙ্খ' প্রভৃতি বর্ণ ও তাহাদিগের উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

(২) এক্ষণে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত যে সকল বর্ণের উচ্চারণ তাহাদের প্রাকৃত-বিকৃতির মত, তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণের প্রয়োজন।

আমরা বাঙ্গালায় কেবল 'ঋ'-বর্ণ নহে 'ঌ'-কারেরও অস্তিত্ব স্বীকার করি। কেহ কেহ আবার তন্ত্র ও অন্নদামঙ্গলের 'ৡ'-কাররূপিণী পড়িয়া 'ৡ'-কারেরও গ্রহণ করেন এবং বোধ হয় তাহার 'লী' 'ল্রী' বা এইরূপ আর একটা উচ্চারণ করেন। 'ঌ'-কার সাধারণতঃ 'লি' এইরূপ উচ্চারিত হয়। প্রাকৃতেও ঌ'-কারের ঐরূপ পরিণতি হয়। 'কঌপ্ত' প্রাকৃতে 'কিলিত্ত' আকার ধারণ করে। 'ঋ'-কার ও 'ৠ'-কারের প্রাকৃতে নানারূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয়। ঋণ, তৃষ্ণা প্রভৃতি শব্দে 'ঋ'কারের যে উচ্চারণ তাহা প্রাকৃতের। গব্য-'ঘৃত' কথাটীর পরিবর্ত্তে যে গব্য-'ঘ্রত' শুনা যায় তাহা, এখন হাসির কথা হইলেও, এক সময়ে মাগধীতে প্রচলিত ছিল। 'ঘিঅ' (ঘি) কথাটীও শৌরসেনী, শকারি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইত। 'কৃষ্ণ' 'কৃত্রিম' 'তৃপ্তি' প্রভৃতি শব্দের সাধারণে 'কেষ্ট' 'কিত্তিম' 'তিরিত্তি' প্রভৃতি যে সকল উচ্চারণ করে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃত-সঙ্গত। 'ৠ'-কারের উচ্চারণও 'রী' এইরূপ। যথা—পিতৄণ (পিত্রীন্)

'ণ' ও 'ষ' র পৃথক্ উচ্চারণ বাঙ্গালায় আদৌ নাই—যুক্তাক্ষরেও নহে। পৈশাচী ভাষার প্রভাবে 'ণ' ও মাগধী ভাষার প্রভাবে 'ষ', সর্ব্বত্রই, যথাক্রমে 'ন' ও 'শ'র মত উচ্চারিত হয়। অসংযুক্ত অবস্থায়, এবং অনেক সময় যুক্তবর্ণেও, 'স', মাগধীর প্রভাবে 'শ'র মত উচ্চারিত হয়। 'শ'-কারও শৌরসেনীর প্রভাবে অনেকগুলি যুক্তাক্ষরে 'স'-কারের মত উচ্চারিত হয়। 'মাণিক-চাঁদের গান' প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় শৌরসেনীর এই প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'শীতল', 'পুরুষের', ''দর্শন' প্রভৃতির ('সিতল' =) 'সীতল', 'পুরুসর', 'দরিসন' প্রভৃতি রূপান্তর শৌরসেনী-প্রভাবাক্রান্ত। 'য'-কারের উপর বাঙ্গালায় সংস্কৃত ব্যতীত মাগধী ও শৌরসেনী ভাষা-দ্বয়েরও প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানে শৌরসেনীর প্রভাব সেখানে, আমরা লিখি 'য' ও উচ্চারণ করি 'জ'। যথা—যে, যদি। আর যেখানে মাগধীর প্রভাব সেখানে আমরা 'য়' লিখি ও উচ্চারণ করি। যথ—রায় (রাজন্)। 'শয়ন', 'বায়ু' প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃতের প্রভাব-লক্ষিত হয়। কথোপকথনে অনেক সময় (প্রাকৃতের মত) 'য়'-কারের উচ্চারণ হয় না; তৎসংশ্লিষ্ট স্বরেরই কেবল উচ্চারণ হয়। যথা, ময়ুর (মউর), নেয়ে (নেএ=নাবিক), যাইয়া (যাইআ) প্রভৃতি। বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ 'ব'-কারের অনেক সময়েই ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু বর্গ্য 'ব' হইতে তাহার আকৃতি বা উচ্চারণ গত কোন ও ভেদ বাঙ্গালায় লক্ষিত হয় না। আমরা 'হওয়ার', 'খাওয়ার' প্রভৃতি উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু যখন 'হবার', 'খাবার' প্রভৃতি লিখি তখন নহে। এইরূপ, 'কৈবর্ত্ত' ও 'আবর্ত্তন' হইতে 'কেওট্' ও 'আওটান' (বা 'আওড়ান') বলি বটে; কিন্তু 'কেবট', 'আবটান' প্রভৃতি লিখি না। 'ভ'র, উচ্চারণ 'ং'-এর মত।

'য'-ফলা-সংযুক্ত বর্ণে 'য'-কারের উচ্চারণ হয় না। যথা—বৎস্য, অগত্যা, বিন্ধ্য প্রভৃতি। কেবল একাধিক বর্ণের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে, যাহার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার দ্বিরুক্তির মত উচ্চারণ হয়। বাচ্য, অব্যয়, সভ্য প্রভৃতি শব্দে ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'হ্য'-র উচ্চারণ

কখনও কখনও 'দজ', ও 'জ্জ'ও হয়; যথা—'উদ্‌জোগ' (উদ্যোগ) বা 'উজ্জোগ', এবং 'হ্য'র উচ্চারণ 'জ্ঝ'র মত হয়; যথা—বাহ্য, সহ্য।

শব্দের আদিতে, কেবল 'য'-ফলা-সংক্রান্ত বর্ণের নহে, দ্বিরুক্তবৎ উচ্চার্য্যমাণ যুক্ত-বর্ণ-মাত্রেরই, উচ্চারণ অসংযুক্ত-বর্ণের মত হয়। যথা—'য' ফলা,—ব্যক্তি; 'ব'-ফলা-ক্বাথ; 'ক্ষ'—ক্ষীর।

রেফ-সংযুক্ত-বর্ণেও চলিত-ভাষায় প্রাকৃতের প্রভাব বর্ত্তমান। তর্ক, মূর্খ, স্বর্গ, অর্ঘ্য প্রভৃতি শব্দের তক্ক, মুক্‌খু, শগ্‌গ, অগ্‌ঘি প্রভৃতি উচ্চারণ নিত্যই আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয়।

'ম্ব' ও 'হ্ব'-ব্যতীত 'ব'-কার-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ 'য'-ফলা-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণের মত। যথা—পৃথ্বী, অম্বয়, বিল্ব, অশ্ব প্রভৃতি। আদিতে অসংযুক্ত-বর্ণবৎ; যথা—ত্বক্‌, স্বর্গ; একাধিক-বর্ণ-যোগে 'ব'-কার অনুচ্চারিত; যথা—সান্ত্বনা, দ্বন্দ্ব।

অননুনাসিক-বর্ণে 'ম'-কার-সংযোগ হইলে তাহার উচ্চারণেও 'য' ও 'ব'-যুক্ত বর্ণের মত, প্রাকৃতপ্রভাব দৃষ্ট হয়। যে বর্ণের সহিত 'ম' যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিরুক্তির সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। যথা—রুক্মিণী (রুক্কিঁনী); বিস্ময় (বিশ্‌শঁয়)।

'শ্র' (ও 'শৃ' = 'শ্রি'), 'শ্ন' (কথনও কথনও) ও 'শ্ল'-র 'শ'-কারের ('স্‌') উচ্চারণে শৌরসেনীর প্রভাব লক্ষিত হয়। যথা—শৃগাল (স্রিগাল্‌), শ্রুত (স্রুত), প্রশ্ন (প্রস্ন), শ্লথ (স্লথ)।

'ৎস', 'প্স', 'স্ক', 'স্প', 'স্ম', 'স্ত' ও 'স্ব'-র 'স'-কারের ('শ') উচ্চারণে মাগধীর প্রভাব লক্ষিত হয়। যথা—উৎসাহ (উৎশাহ), বীপ্সা (বীপ্‌শা), তিরস্কার (তিরশ্‌কার), পরস্পর (পরশ্‌পর), বিস্মিত (বিশ্‌শিঁত), হাস্য (হাশ্‌শ), স্বচ্ছ (শচ্ছ)।

অন্য বর্ণের যোগে 'হ'-কার যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, প্রাকৃতে তাহার বিকৃতি সেইরূপ। হ্য (= জ্ঝ)—বাহ্য; হ্র—হ্রদ (হ্‌দ, রদ্‌); হ্ল—আহ্লাদ (আল্‌হাদ্‌); হ্ব—বিহ্বল (বিব্‌ভল্‌), জিহ্বা (জিব্‌ভা; জিব্‌হা—অন্তঃস্থ 'ব'); হ্ন—চিহ্ন (চিন্‌হ), হ্ন—আহ্নিক (আন্‌হিক); হ্ম—ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হন্‌)।

'ঃখ' ও শব্দ-মধ্যস্থ 'ক্ষ' র উচ্চারণ প্রাকৃতের মত (ক্‌খ)। শব্দের আদিতে ও অন্য-বর্ণ-যোগে 'ক্ষ' 'খ'-র মত উচ্চারিত হয়। যথা—দুঃখ (দুক্‌খ), অক্ষয় (অক্‌খয়); ক্ষীণ (খীন্‌,) তীক্ষ্ণ (তীখ্‌ন)।

নিম্নে প্রাকৃত-বিকৃতির মত উচ্চারণ এবং সংস্কৃত-প্রকৃতির মত বর্ণ-সংযোগ দেখাইবার জন্য একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। লিখিত সাধু-ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা রচিত হইল। বিভিন্ন গ্রাম্য বা প্রাদেশিক কথিত ভাষার উচ্চারণগুলির সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এ স্থলে ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, স্বভাবতঃ লিখিত ভাষার সহিত তুলনায়, কথিত ভাষার উপর 'সাক্ষাৎসম্বন্ধে' সংস্কৃতের প্রভাব অতি অল্প; প্রাকৃতের ও বাহিরের অন্যান্য প্রভাবই অধিক।

তালিকার তারকা (*)-চিহ্নিত বর্ণগুলির উচ্চারণ সানুনাসিক হইবে।

উচ্চারণ	অক্ষর	উদাহরণ	উচ্চারণ
ক্ক	ক্ম*	রুক্মিণী	রুক্কিঁনী
	ক্য	বাক্য	বাক্ক
	ক্ব	পক্ব	পক্ক
ক্খ	ক্ষ	ক্ষতি	খতি
	ক্ষ্ম*	সূক্ষ্ম	শূক্খঁ
	ক্ষ্য	লক্ষ্য	লক্খ
	ক্ষ্ব	ইক্ষ্বাকু	ইক্খাকু
	খ্য	সখ্য	শক্খ
	ঃখ	দুঃখ	দুক্খ
গ্গ	গ্ম*	বাগ্মী	বাগ্গীঁ
	গ্য	ভাগ্য	ভাগ্গ
	জ্ঞ*	বিজ্ঞ	বিগ্গঁ
গ্ঘ	ঘ্য	শ্লাঘ্য	স্লাগ্ঘ
চ্চ	চ্য	বাচ্য	বাচ্চ
জ্জ	জ্য	রাজ্য	রাজ্জ
	জ্ব	জ্বলিত	জ্জলিত
	জ্জ্ব	উজ্জ্বল	উজ্জল্
	য্য	শয্যা	শজ্জা
	য্ব	বায্বাদি	বাজ্জাদি
জ্ঝ	হ্য	বাহ্য	বাজ্ঝ
ট্ট	ট্ম*	কুট্মল	কুট্টঁল্
	ট্য	নাট্য	নাট্ট
	ট্ব	খট্বা	খট্টা
ট্ঠ	ঠ্য	শাঠ্য	শাট্ঠ
ড্ড	ড্য	জাড্য	জাড্ড
	ড্ব	অনড্বান্	অনড্ডান্
ড্ঢ	ঢ্য	আঢ্য	আড্ঢ
ত্ত	ত্ম*	আত্মা	আত্তাঁ
	ত্য	নিত্য	নিত্ত
	ত্ব	স্বত্ব	শত্ত

উচ্চারণ	অক্ষর	উদাহরণ	উচ্চারণ
	ত্ব	সত্ত্ব	শত্ত
	ত্ম্য*	মাহাত্ম্য	মাহাত্তঁ
ত্থ	থ্য	অকথ্য	অকত্থ
	থ্	পৃথ্বী	প্রিথী
দ্দ	দ্ম*	পদ্ম	পদ্দঁ
	দ্য	বাদ্য	বাদ্দ
	দ্ব	দ্বন্দ	দন্দ
দ্ধ	ধ্ম*	ধ্মাত	দ্ধাঁত
	ধ্য	সাধ্য	শাদ্ধ
ন্	ঞ্ +(চ, ছ, জ, ঝ,)	সঞ্চয়, বাঞ্ছা, সঞ্জাত, ঝঞ্ঝা,	শন্চয়, বান্ছা, শন্জাত, ঝন্ঝা
	ণ্ +(ট, ঠ, ড, ঢ.)	কণ্টক, কণ্ঠ. ভাণ্ডার	কন্টক. কন্ঠ, ভান্ডার্
স্ত	স্ত্য	অস্ত্য	অস্ত
	স্ত্ব	সান্ত্বনা	শান্তনা
ন্দ	ন্দ্য	বন্দ্য	বন্দ
	ন্দ্ব	দ্বন্দ্ব	দন্দ
ন্ধ	ন্ধ্য	বিন্ধ্য	বিন্ধ
ন্ন	ণ্ণ	বিষণ্ণ	বিশন্ন
	ণ্য	হিরণ্য	হিরন্ন
	ণ্ব	কণ্ব	কন্ন
	ন্য	অন্য	অন্ন
	ন্ব	অন্বয়	অন্নয়
ন্ম	ণ্ম	ষণ্মাত্র	শন্মাত্র
ন্হ	হ্ন	চিহ্ন	চিন্হ
	হ্ণ	আহ্নিক	আন্হিক্
প্প	প্য	আপ্যায়িত	আপ্পায়িত
	ঃপ	অন্তঃপুর	অন্তপ্পুর
ব্	(অন্তস্থ) ব্ + (••)		
ব্ব	ব্য	অব্যয়	অব্বয়
ত্ত	ভ্য	সভ্য	শত্ত
	হ্ব	আহ্বয়	আত্তয়

উচ্চারণ	অক্ষর	উদাহরণ	উচ্চারণ
ম্ব	ম্ব (অন্তঃস্থ)	সম্বৎসর	শম্বৎশর
ল্ল	ল্য	বাল্য	বাল্ল
	ল্ব	বিল্ব	বিল্ল
ল্‌হ	হ্ল	আহ্লাদ	আল্‌হাদ
ব্‌হ	হ্ব	আহ্বান	আব্‌হান
শ্‌	ষ্‌(+ক্, ট, ঠ, প,···)	শুষ্ক, পুষ্ট, ষষ্ঠ, পুষ্প	শুশ্‌ক, পুশ্‌ট, শশ্‌ঠ, পুশ্‌প
	স্‌(+ক, প, ···)	তিরস্কার, পরস্পর	তিরশ্‌কার, পরশ্‌পর্
	(ৎ, ৎ+···+ষ, প্‌) +স্‌	বীভৎস, মৎস্য, ঈপ্সিত	বীভৎশ, মৎশ, ঈপ্‌শিত
শ্ন	ষ্ণ	কৃষ্ণ	ক্রিশ্ন
শ্‌শ	শ্ম*, ষ্ম,*, স্ম*,	শ্মশান, গ্রীষ্ম, বিস্ময়	শঁশান, গ্রীশ্‌শঁ, বিশ্‌শঁয়
	শ্য, ষ্য, স্য	বশ্য, পোষ্য, হাস্য	বশ্‌শ, পোশ্‌শ, হাশ্‌শ
	শ্ব, ষ্ব, স্ব	বিশ্ব, বিষ্বক্, স্ব	বিশ্‌শ, বিশ্‌শক্, শ্‌শ
শ্‌	শ্‌ (+ঋ, ন, র, ল)	শৃগাল, প্রশ্ন	স্রিগাল্, প্রস্ন,
		শ্রবণ, শ্লাঘা	স্রবন, স্লাঘা
	ঙ্‌ (+ক, খ, গ, ঘ,···ম)	শঙ্কা, শঙ্খ. বঙ্গ, বাঙ্ময়	শংকা, শংখ, বংগ, বাংময়
	ঙ্গ্‌, ঙ্গা, ঙ্গি প্রভৃতিতে ঙ্গ্‌	বাঙ্গালী; রঙ্গিন্	বাংআলী, রংইন্
ংক	ঙ্ক্য	অঙ্ক্য	অংক
ংখ	ঙ্ক্ষ, ঙ্ক্ষ্য	আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষ্য	আকাংখা, আকাংখ্য

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ

বিগত শারদীয়পূজার বন্ধে অধিকাংশ সময় গয়ায় ছিলাম। ঐ সময় আমি বিহারের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করি। বলা বাহুল্য সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বিবরণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, ঘটনাক্রমে আমি প্রথমেই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমি ঐ বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। সকলেই জানেন আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আনয়নের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তন্মধ্যে সপ্তশতীরাই সংখ্যায় অধিক ছিলেন। যদিও তৎকালে নিতান্ত সদাচারবর্জ্জিত অনার্য্যসঙ্কুল বঙ্গভূমিতে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চাবিরহিত ও আচারহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ তাঁহাদেরই দ্বারা সম্পন্ন হইত। এখন দেখা যাউক, এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের মূল কোথায়, এবং কোথা হইতে কি সূত্রে উঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করেন, আর সপ্তশতীদের আগমনকালে বঙ্গদেশের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল?

বিহারের বিজ্ঞ এবং কুলশাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ বলেন,—"প্রথম কীকট প্রদেশে ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। গয়াসুরের তপস্যায় ভীত হইয়া দেবতারা কৌশলে অসুরকে বাধ্য করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সময় তিনি চতুর্দ্দশটি মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞান্ত স্নান করিলে দেখা গেল গয়াসুর যেন কিছু বিচলিত হইতেছে। তাহার পর ব্রহ্মার আদেশে ধর্ম্মরাজ যম নিজ গৃহ হইতে একখানি বৃহৎ পাষাণখণ্ড আনিয়া অসুরের মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। শেষে অনেক প্রক্রিয়ার পর, দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু গদাধর মূর্ত্তিতে অসুরের মস্তকে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। এইবার অসুর স্থির হইল, আর নড়িতে পারিল না। তাহার পর, ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটি ব্রাহ্মণকে ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র, পঞ্চান্নখানি গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "তোমরা কখনো কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিও না"। ব্রাহ্মণেরা তাহাতেই সম্মত হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে গয়ার সন্নিহিত ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মরাজ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কীকটদেশে তখন পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর ব্রাহ্মণ ছিল না, সুতরাং ধর্ম্মরাজ উঁহাদিগেরই শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন "আমরা যজ্ঞ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মার আদেশ আছে, দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারিব না"। ধর্ম্মরাজ কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু তাম্বুলের মধ্যে পাঁচটি বহুমূল্য রত্ন রাখিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাম্বুল গ্রহণ

করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে প্রতিগ্রহদোষে দূষিত হইলেন। ওদিকে ধর্ম্মারণ্যের যজ্ঞের ধূম ব্রহ্মলোকে পৌছিলেই ব্রহ্মার কিছু অবিদিত রহিল না। তিনি তখনি গয়ায় আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলেন,—বলিলেন, "তোমাদের স্বর্ব্বস্বান্ত হউক।"

ব্রাহ্মণেরা অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে কাতরোক্তিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন "তোমরা আচন্দ্রার্ক তীর্থোপজীবী হইয়া বাস কর। পুণ্যবান্ লোকেরা পিতৃলোকের স্বর্গকামনায় এখানে পিণ্ডদান করিবেন। সেই সময়ে তোমাদিগকে পূজা করিলেই আমার পূজা করা হইবে।"

যে চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং পরে অভিশপ্ত হন, তাঁহাদের নাম যথা ;—(১) গৌতম (২) কশ্যপ (৩) কৌৎস (৪) কৌশিক (৫) কাণ্ব (৬) ভরদ্বাজ (৭) বৃদ্ধ পরাশর (৮) হরিৎকুমার (৯) মাণ্ডব্য (১০) লৌগাক্ষি (১১) গোকর্ণ (১২) শিখণ্ডী (১৩) সুহোত্রও (১৪) আত্রেয়। এই চতুর্দ্দশ মুনিই গয়াপাল বা গাওয়াল ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। ইঁহাদের সন্তানগণই মগধের আদিম ব্রাহ্মণ। গয়াপালগণের কুলোপাধি যথা ;—(১) সিজুয়ার (২) নক্‌ফোফা ৩) টৈয়া (৪) সেন (৫) হণ্ট (৬) মহাথা (৭) পাহারী (৮) শীতলপাণি (৯) রৈ (১০) টেণ্টী (১১) ডাইয়া (১২) মনোয়াশী (১৩) ঝঙ্গর্ (১৪) গোলীবার ইত্যাদি।

গয়াপালগণ গয়াক্ষেত্রে তীর্থোপজীবী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সন্তানসন্ততিতে গয়াক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। গয়াপালগণের জীবিকা অনায়াসলভ্য- চরণপূজা করিয়া তীর্থযাত্রীরা যে অর্থ প্রদান করে, তাহাতেই তাঁহাদের উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্য হইতে বিদ্যাচর্চ্চা তিরোহিত হইল। কোন সময়ে কাশ্মীরপ্রদেশ হইতে (মতান্তরে কুরুক্ষেত্র হইতে) এক রাজা গয়াতীর্থে আগমন করেন, রাজা সসৈন্যে সপরিবারে অমাত্য, পুরোহিত, যান, বাহনসহ গয়ায় উপস্থিত হইয়া মহা আড়ম্বরে পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তখন গয়াপালগণই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করিতেন এবং মন্ত্রও পড়াইতেন। রাজার সঙ্গে দুইটি পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতদ্বয় ক্রিয়াবান্, তাঁহারা বেদ এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র উভয়ই উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহাদের গুণবত্তা দেখিয়া গয়াপালেরা অন্য দক্ষিণার পরিবর্ত্তে ঐ ব্রাহ্মণ দুইটিকে রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

রাজা রাজধানীতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই ব্রাহ্মণসহ আর দশটি ব্রাহ্মণকে সপরিবারে গয়ায় প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পঞ্জিকাগণনা, জন্মপত্রিকানির্ম্মাণ প্রভৃতি করিতেন বলিয়া সাধারণতঃ জ্যোষী নামে আখ্যাত হন। জ্যোষী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ যজুর্ব্বেদী, কিয়দংশ সামবেদী। জ্যোষীরা বলেন,—তাঁহারা গৌতমী শাখা ও মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, কাত্যায়নগৃহ্যসূত্র, বশিষ্ঠগৃহ্যসূত্র ও আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র অনুসারে জ্যোষীদের

বেদোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহাদের গোত্র যথা ;—গৌতম, পরাশর, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, গর্গ, বৎস প্রভৃতি। কুলোপাধি—পাণ্ডে, পাঠক, তেওয়ারী, চৌবে, উপাধ্যায়, বৈদ্য, পণ্ডিত, মিশ্র ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অধিকাংশই নিঃস্ব, অল্পসংখ্যকেরই স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত জ্যোষী ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চ্চা ব্যতীত অন্য কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। গয়াসহরে যে সকল জ্যোষী বাস করেন, তাঁহাদের সকলেই প্রায় পিণ্ডা করাইয়া (গয়াশ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইয়া) জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। মফস্বলে যে সকল জ্যোষী বাস করেন, তাঁহারা "গৌঞা-পাণ্ডে" অর্থাৎ গ্রাম্য পুরোহিত। এই গৌঞা-পাণ্ডেদিগের কাহারও একখানি কাহারও দুই খানি কাহারও তিন চারিখানি গ্রাম আছে। গৌঞা-পাণ্ডেরা পুরুষানুক্রমে বহুকাল হইতে ঐ সকল গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ, বাভন, ছত্রি, কায়স্থ, বেণে প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বর্ণেরা উঁহাদের যজমান। ঐ সকল গ্রামের নিম্নশ্রেণীর জাতিদের পুরোহিত ধামী ব্রাহ্মণ। ধামীরা বাঙ্গালাদেশের বর্ণযাজক ব্রাহ্মণদের তুল্যব্যবসায়ী। গৌঞা-পাণ্ডেদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে দক্ষিণার পরিমাণও অধিক নহে। গৌঞা-পাণ্ডেদের অধিকৃত গ্রামে যে সকল ধনী জমিদার বাস করেন, বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহারা শাকদ্বীপী, সরযূপারী, সারস্বত, সনাঢ্য, গৌড়, মৈথিল প্রভৃতি শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া ক্রিয়া সমাধা করেন। ঐ সকল স্থলে গৌঞা পাণ্ডেরা দক্ষিণাদির সিকি ভাগ পান। জ্যোষীব্রাহ্মণের ধনহীনতার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে একজন জ্যোষী পণ্ডিত বলিলেন ;—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা 'কুম্ভীধান্য' ছিলেন। ছয় মাসের আহারযোগ্য ধান্য সঞ্চিত হইলেই আর তাঁহারা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন না।* উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইলে পুনঃ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতেন। জ্যোষীব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

জ্যোষী ব্রাহ্মণের আগমনের পরই মগধপ্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বসতি হয়। গয়া-সহরের শাকদ্বীপীয় পণ্ডিত বাণীদত্ত পাঠক প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ কুলশাস্ত্রবিদের নিকট আমি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। তাঁহারা বলেন, এখানে দুইবার শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। প্রথম যখন রাবণবধের পর অযোধ্যাধিপ মহারাজ রামচন্দ্র সরযূতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ আহূত হন এবং যজ্ঞে দান গ্রহণ করিয়া মহারাজের ক্রিয়া সমাপ্তি করেন। দ্বিতীয়বার দ্বারকাধিপ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বকর্তৃক আহূত হইয়া শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। সকলই জানেন নারদের

* মনুসংহিতা চতুর্থ অধ্যায় কুল্লুকভট্টের টীকা পাঠ করুন।

চন্দ্রাস্তে শাম্ব দারুণ রোগাক্রান্ত হন এবং শেষে সূর্য্যের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া চন্দ্রভাগাতীরস্থ পবিত্র তীর্থ মিত্রবনে সূর্য্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ আরোগ্যদাতা সূর্য্যের অর্চ্চনার নিমিত্ত শাম্ব রাজা প্রিয়ব্রতের শাসিত পুণ্যভূমি শাকদ্বীপ হইতে চারিবেদে অভিজ্ঞ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগের অষ্টাদশকুলকে আহ্বান করিয়া আনিয়া উক্ত সূর্য্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন (১), সেই অবধি পঞ্চনদ প্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস হয়। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণসমাজ অতি বিরাট। ভারতের সকল প্রদেশেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের বসতি আছে। গান্ধার, গৌড়দেশ, (প্রয়াগ অঞ্চল) মগধ ও ভারতের অন্যান্য নানাপ্রদেশ এক সময় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণভারতের অনেক উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আদিম ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উহার মূলে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ চিরকালই জ্ঞানী এবং বিদ্বান্।

প্রসঙ্গক্রমে এতক্ষণ আমরা মগধের আদিম ব্রাহ্মণগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম, এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। আমি গয়ার বাণীদত্ত পাঠক প্রভৃতি কতিপয় কুলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন করি—"বাঙ্গালাদেশে কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণের আগমনের পূর্ব্বে সপ্তশতী নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় গমন করেন। (২) রাজা শশাঙ্ক যে সময়ে গৌড়দেশের অধিপতি সেই সময়ে তিনি গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য সরযূতীর হইতে কতকগুলি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। (৩) তাহার পর কতকগুলি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ মধ্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় গমন করেন। (৪) ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত? ঐ সকল প্রবীণ পণ্ডিতগণ বলিলেন, "তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। কারণ সাত আটশত বৎসর পূর্ব্বে এক ত্রিহুত ব্যতীত সমস্ত বিহারে গয়াপাল জ্যোষী এবং শাকদ্বীপী ব্যতীত অন্য কোন ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। অবশ্য ধামী এবং মহাব্রাহ্মণ ছিল। কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড় ও শ্রোত্রী প্রভৃতি ছয় শত বৎসরের মধ্যে সমাগত হইয়াছেন। আমি বলিলাম, "বাঙ্গালাদেশের কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে ;—'বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর ৯৯৯ শকে (মতান্তরে ৯৯৯ সংবতে) কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন (৫)। তাঁহাদেরই বংশধরগণ

(১) শাম্বপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের শাম্বের অভিশাপ বৃত্তান্ত ও সূর্য্যের কৃপায় মুক্তিলাভের বিবরণ পাঠ করুন। তদ্ভিন্ন মহাভারত, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ নারদপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ যজ্ঞখণ্ড ও অভিভবখণ্ডে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের বিবরণ আছে।

(২) রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাসমূহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বিবরণ পাঠ করুন।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ পাঠ করুন।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ পাঠ করুন।

(৫) "আদিশূরো নবনবত্যধিকশতশতাব্দে ব্রাহ্মণান্ আনয়ামাস।" ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া বাস করিতেছেন। বিহার প্রদেশ বাঙ্গালা অপেক্ষা কান্যকুব্জের অধিক সমীপবর্ত্তী। অতএব কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণের বিহার প্রদেশে, আগমনই অগ্রে সম্ভব।" তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ;—"বাঙ্গালাদেশের রাজার প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণ আহূত হইয়া অগ্রে গিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বিহারে তাঁহাদিগকে কেহ আহ্বান করে নাই, আপন গরজে আসিয়াছেন, কাজেই এখানে তাঁহাদের পরে বসতি হইয়াছে।" তাহার পর তাঁহারা বলিলেন ; "কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণ যদি শুধু দক্ষিণালোলুপ হইতেন, তাহা হইলে অনেক অগ্রে তাঁহাদিগকে বিহার প্রদেশে দেখা যাইত, কিন্তু প্রকৃত কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য এবং দানগ্রহণ তত পছন্দ করেন না। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই পুরুষকারের পক্ষপাতী।"

তাহার পর, উল্লিখিত পণ্ডিতগণ আমাকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্র-সংক্রান্ত দুখানি পুস্তক প্রদান করিলেন এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের 'পুরের" সহিত সপ্তশতী ব্রাহ্মণের 'গাঁই" মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আরও তাঁহারা বলিলেন—"পুরাকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি জলময় এবং নদনদী বিলখালে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথমে বিহার প্রদেশ হইতে ধীবরেরা ঐ প্রদেশে গিয়া বাস করে। তাহাদের সহিত সম্ভবতঃ ধামী ব্রাহ্মণেরাও গিয়াছিলেন। ক্রমে বাঙ্গালার উর্ব্বরাশক্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে দলে দলে বিহারী লোক বাঙ্গালায় গিয়া বাস করে এবং তাহাদের পুরোহিতদিগকেও লইয়া যায়। ঐ সকল পুরোহিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। তাঁহারাই কোন কারণে বাঙ্গালাদেশে সপ্তশতী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। কারণ তখন মগধে জ্যোষী এবং শাকদ্বীপী ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। সুতরাং বঙ্গের প্রধান উপনিবেশী ব্রাহ্মণেরা যে শাকদ্বীপী কিংবা জ্যোষী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুমান করেন জ্যোষী এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধগণের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষার্থ এবং পুরাণব্যাখ্যা দ্বারা গ্রামে গ্রামে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ হিন্দুনরপতিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই গ্রাম্য-পুরোহিতেরা গৌঞা-পাণ্ডে আখ্যায় অভিহিত হন।" "গৌঞা-পাণ্ডে" শব্দটি রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত "চাকলাযাজী" শব্দের সমানার্থক। এই গৌঞা-পাণ্ডে বা চাকলাযাজী পুরোহিতগণ প্রাণপাত করিয়া বিহারে ও বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও রক্ষা করেন এবং ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

গ্রহবিপ্রগণও যাহা, সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণও তাহাই। অতএব প্রথম স্তরের সপ্তশতী দ্বিতীয় স্তরের সরযূপারী গ্রহবিপ্র এবং তৃতীয়স্তরের শাকদ্বীপী সকলেই তাহার পর হইতে অর্দ্ধ পৌরোহিত্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিহারে গৌঞা-পাণ্ডেরা যতদিন যাজনকার্য্য করেন, ততদিন তাঁহাদিগকে "আচার্য্য" বলে; উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিলেই আর সে পদবী থাকে না। কিন্তু বাঙ্গালায় তাঁহাদের আচার্য্যপদবী প্রায়ই বিলুপ্ত হয় নাই। কুলোপাধি—মিশ্র, পাঠক, উপাধ্যায় প্রভৃতি কেহ কেহ ব্যবহার করেন, কাহার কাহারও উহা কুলপঞ্জিকাগত হইয়া আছে।

প্রসঙ্গক্রমে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের এবং বঙ্গদেশের গ্রহবিপ্রগণের অবস্থা বর্ণিত হইল। এইবার তাঁহাদের পুর ও গাঁইর সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রথম কথা, মগধের শাকদ্বীপী সমাজে যে সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সাতশতী সমাজে ও গ্রহবিপ্রসমাজে অবিকল সেই সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল গোত্রীয় বংশের নাম লিখিত হইল না।

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের "পুর"।	সাতশতী ব্রাহ্মণের "গাঁই"।
১। উল্লার্ক।	১। উল্লুক।
২। কুরৈআরি।	২। কোঁয়ারি
৩। পিতিআরক।	৩। পিতারি।
৪। বাড়আরি।	৪। বেড়ু।
৫। বাড়বাড়ী	৫। বেলাড়ী।
৬। খংটবার।	৬। কাংটানি (কামটি)।
৭। ভলুনী আরি।	৭। ভাদারী।
৮। সিকৌরি আর।	৮। সাগাই।
৯। যার্ক।	৯। যাগাই।
১০ কুণ্ডার্ক।	১০। কুড়্যাল।
১১ সরৈআর।	১১। সুরাই।
১২ ছত্রবার।	১২। চেরচের
১৩ মলৌরিআর। মুল্লুক।	১৩। মুল্লুকজুড়ি।
১৪। বালার্ক।	১৪। বাগুড়ি।
১৫। ডিহিক।	১৫। দহড়ি।

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যে কয়টি পুর ও গাঁই উদ্ধৃত হইল, উহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই কালক্রমে বাঙ্গালায় সাতশতী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যজমানগণের সহিত আগমন করেন, সুতরাং এখানে কোন গ্রাম প্রাপ্ত হন নাই। দেশের পুরুষপরম্পরাগত পুর (গাঁই) ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাই কুলপঞ্জিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল পুর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রামাণিক কুলগ্রন্থ "দিব্যানন্দচন্দ্রোদয়" হইতে উদ্ধৃত। "শাকদ্বীপীয় কুলভাস্কর" নামক কুলগ্রন্থেও পুরগুলি অবিকল এইরূপই আছে।

উপসংহারে বক্তব্য, সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্র ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়, আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্তরকুরু বা প্রত্নোকস্ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত বৈদিক আচার ও বেদোক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একই বৈদিকধর্ম্ম দেশকালপাত্র অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিনিবন্ধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সকলেরই মূল বেদ। পূর্ব্বে সকলেরই বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং সকল ব্রাহ্মণই এক ছিলেন। পরে দেশকালপাত্র অনুসারে বহু ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

* বঙ্গের সপ্তসতীগণ কখন আপনাদিগকে শাকদ্বীপী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতামত পরে প্রকাশ করা যাইবে। সা-প-প-স।